কুমারী-সংসদ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আড়াই টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

সমর্পণ

পরমাত্মীয় ও পরম স্নেহাস্পদ

সুপ্রশংসিত সরকারী ইঞ্জিনীয়ার

শ্রীমান্ ক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় বি-ই

করকমলেষু

পরিচয়

'কুমারী-সংসদ' নামটির সহিত সাহিত্য-রসিক পাঠক-সমাজ সম্ভবত পরিচিত আছেন। লেখকের পরিকল্পনা যখন বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই সংসদটিকে উপলক্ষ করিয়া নারী-প্রগতির নূতন পথটির নির্দ্দেশ দেয়, পাঠক-মহলে তখনই একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়াছিল। কোন কোন ছাত্রী-সংস্থা কুমারী-সংসদের আদর্শে 'ঝাণ্ডা' তুলিয়াছিলেন, এমন সংবাদও পাইয়াছি। বড় দুঃখেই মহাত্মা বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন— 'চুপ করে বসে থাকার চেয়ে ডাকাতি করাও ভালো।' বর্ত্তমান নারী-প্রগতির উদ্দাম গতি কতিপয় সত্যকার শিক্ষিতা ছাত্রীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে এবং স্বামীজীর উক্ত মর্ম্মস্পর্শী উক্তিটির অনুকরণে স্থির করে— 'সহ-শিক্ষার সুযোগ নিয়ে প্রগতির পথে ছেলেদের সাথে হুল্লোড় করে লোক হাসানোর চেয়ে অবাঞ্ছিত বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তোলাই শ্রেয় এবং তাতেই নারী প্রগতির পরম সার্থকতা।' এই সূত্রে, সমাজ-প্রচলিত কতিপয় অশোভন ও অসঙ্গত প্রথার উচ্ছেদ-কল্পে সংসদের দুঃসাহসিক সংগ্রাম—এই উপন্যাসখানির বিষয়-বস্তু। নীতিবিদ্‌গণ হয়ত ইহাদের আচরণে দুর্নীতির আভাসই পাইবেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে—ইহারা মহাত্মা বিবেকানন্দের সমীচীন বাণীর সহিত নীতি-শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিক যে নির্দ্দেশটি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছে, তাহার গুরুত্বও প্রচুর। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত বিচার করিয়া সংসদকে 'বে-কসুর খালাস' না-দিয়া পারিবেন না।

গ্রন্থখানি যে জনাদৃত হইয়াছে, আশু দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

নাট্য-ভারতী
৩২, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩৫২

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমারী-সংসদ

এক

ছাত্রীদের সংস্থা। নাম তার কুমারী-সংসদ। উপস্থিত সতেরোটি মেয়ে সভ্য-তালিকায় নাম লিখাইয়াছে এবং আরও অনেকেই নাম লিখাইব লিখাইব করিতেছে, কিন্তু সাহসে কুলাইতেছে না। কেন না, সভার আইন-কানুন ভারী কড়া।

যথা—নাম লিখাইবার সময় প্রত্যেককেই এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, তাহারা চিরকুমারী থাকিবে, যতই প্রলোভন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া যে-কোনও পীড়ন বা প্রয়োজন আসুক না কেন, তাহারা থাকিবে অটল। ছেলের বিবাহের নামে ছেলের বাপেরা এতকাল ধরিয়া মেয়ের বাপেদের উপর যে সব অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে—কসাইসুলভ নৃশংস মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া মেয়েদের মুখ নীচু করিয়া রাখিয়াছে, ইহারা মুখ তুলিয়া তাহার প্রতীকার করিবে—সমস্ত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়া ছেলের বাপেদের ধারালো মুখগুলি ভোঁতা করিয়া দিবে। ইহার জন্য যে-কোনও প্রোপাগ্যাণ্ডা, ছল, চাতুরী, কৌশল বা আন্দোলন চালাইবার প্রয়োজন হইবে, তাহাতে যোগ দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিবে না বা পেছ্‌পাও হইবে না।

কাজেই যাহারা একেবারেই বে-পরোয়া, তাহারাই হুড়মুড় করিয়া সাংঘাতিক প্রতিষ্ঠানে ভিড়িয়া পড়িয়াছিল। আর যাহারা অভিভাব তোয়াক্কা রাখিত, পিছনে প্রতিবন্ধক ছিল, অর্থাৎ ভাই বা পরিজন বিবাহ-প্রসঙ্গে যাহাদের অভিভাবকগণ বরপণের ছুরি সানাইতে এখন সচেতন, সে সব মেয়ে মনের ইচ্ছা সত্ত্বেও দলে নাম লিখাইতে পারিতেছি না। তবে তাহাদিগকেও দল বাঁধিয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করিতে দেখা যাইত।

মিশন কলেজের একতলার এক নিরিবিলি অংশে ছুটির পর প্রত্যহই কুমারী-সংসদের বৈঠক বসে। প্রতিষ্ঠানের সতেরোটি মেয়েই মহোৎসাহে সভায় যোগ দেয়! সতেরোটি সভ্যার মধ্যে দশটি মিশন কলেজের ছাত্রী, সাতটি আসে অদূরবর্ত্তী বেথুন হইতে।

প্রতিষ্ঠানের অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া রাখিয়া থার্ড ইয়ারের ছাত্রীদল। ফার্স্ট ইয়ার ছাত্রীসংখ্যা—আর্টস্—পাঁচ, আর সা য়েন্স তিন, ফোর্থ ইয়ারের মাত্র এক; বাকী আটটিই থার্ড ই[illegible] [illegible]হারা প্রত্যেকেই বি-এস-সি বিভাগের।

ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী শ্রীমতী অনীতা সেনগুপ্তা [illegible]ই দলের সকলের জ্যেষ্ঠা, সুতরাং তিনি-ই নারীপ্রগতি প্রতিষ্ঠ[illegible]প্রেসিডেণ্ট এবং থার্ড ইয়ারের প্রতিভাশালিনী ছাত্রী শক্তি বোস এ[illegible] [illegible]তষ্ঠানটির উত্তরসাধিকা ও সেক্রেটারী।

ক্লাস যেদিন একটু আগে আগে ভাঙ্গে, সেদিন প্রতিষ্ঠানের সভা একটু ভালভাবেই জমে। গান, বক্তৃতা, উপদেশ কিছুরই অসদ্ভাব হয় না। বেথুনের স্কুল বিভাগের ছোট ছোট মেয়েরা সভায় আসিয়া গান গায়। গানগুলি সংসদের উদ্দেশ্যের অনুকূলেই রচিত, গান রচনায় সেক্রেটারী শক্তির অসামান্য শক্তি—প্রত্যেক গানের প্রতি ছত্রটি এমনভাবে রচিত

যে, পণপ্রয়াসী ছেলের বাপেদের বুকে যাহাতে ভীমরুলের হুলের মত ফুটিয়া জ্বালা দিতে পারে!

সাধারণত হারমোনিয়ামের সুর যেমন ঝঙ্কার দিয়া উঠে, অমনি ছাত্রী শ্রোত্রীর দল উঠি-পড়ি অবস্থায় কুমারী-সংসদের উদ্দেশে ছুটিতে থাকে। আশেপাশে দুই-চারিজন শ্রোতাও যে একান্ত ঔৎসুক্যের সহিত ঘুরাঘুরি করে না, এমন কথা বলা যায় না। ফলারের বাড়ীতে লুচির সুবাসে আকুল হইয়া অনিমন্ত্রিত পেটুকের দল যেভাবে আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহাদেরও অবস্থা অনেকটা সেইরূপ। কিন্তু এ সভায় তাহাদের প্রবেশ করিবার উপায় নাই।

বৈঠকের প্রেসিডেণ্ট প্রিন্সিপালের সহিত মোলাকাত করিয়া হুকুম জারি করাইয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বৈঠকে কলেজের কোনও ছেলে উপ[illegible]ত [illegible]কিতে পারিবে না। এবং এই ব্যাপারে প্রিন্সিপাল সাহে[illegible] এমনই তীক্ষ্ণ যে, কোন পক্ষেরই সামান্য একটু বেচাল হইব[illegible]

[illegible] মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত একটি অপ্রীতিকর ঘটনার কা[illegible] আছে। বর্ত্তমানের সাহেব-প্রিন্সিপাল তখন মিশন কলেজের [illegible] গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে দোতালার ডিবেটিং ঘরেই ছাত্র-ছাত্রী[illegible]র আলোচনার বৈঠক বসিত। কিন্তু একদা বচসাসূত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তুমুল কলহ বাধিয়া যায় এবং তাহার পরিণাম এমনই শোচনীয় হইয়া ওঠে যে, ছাত্রীদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে পুলিসের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। এই ঘটনায় প্রিন্সিপ্যালের অযোগ্যতা ও সহ-শিক্ষার অবৈধতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের তীব্র আলোচনা শহরবাসীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। তাহার ফলে, এই বহুদর্শী প্রবীণ প্রিন্সিপ্যালের আগমন এবং কার্য্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের

আচরণ সম্বন্ধে তাঁহার সেইরূপ কঠোরতা অবলম্বন। ছাত্রীদের উদ্দেশ্য শুনিয়া তিনি কলেজের নিম্নতলে একখানি ঘর ছাড়িয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারি করিলেন, সেই ঘরে ছাত্রীরা তাহাদের ডিবেটিং ক্লাব বসাইবে, তাহাদের সংসদে কোনও ছাত্র প্রবেশ করিতে পারিবে না। মিশন কলেজের ছাত্রীদের স্বতন্ত্র সংসদ প্রতিষ্ঠার ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সেই ঘটনার পর হইতেই ছাত্রীরা ডিবেটিং ক্লাবের সহিত সংস্রব ছিন্ন করিয়াছে, সহপাঠীদের সহিতও তাহারা কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলের দল অবশ্য উস্‌খুস্‌ করে তাহাদের সহিত মিশিতে, তাহাদিগকে আবার ডিবেটিং ক্লাবের বৈঠকে টানিতে। কিন্তু মেয়েদের দৃঢ়তা এ সম্বন্ধে অসাধারণ, কিছুতেই তাহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলে পুনরায় ভিড়িতে দেখা গেল না।

ডিবেটিং ক্লাবে যে আলোচনা-প্রসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়, তাহার বিষয়বস্তু ছিল—বিবাহে পণপ্রথা ও তাহার বিষময় ফল। শহরতলীর কোনও বিশিষ্ট ঘরের অবিবাহিতা কতিপয় তরুণীর একসঙ্গে বিষপানে আত্মহত্যার শোচনীয় কাহিনী তখন শহরের প্রধান আলোচ্য বিষয়, তরুণী-সমাজে উত্তেজনার অন্ত নাই। সুতরাং ডিবেটিং সভায় এই মর্ম্মস্পর্শী বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে এক তরুণী ছাত্রী এই নিষ্ঠুর প্রথাটিকে আক্রমণ করিয়া দেশের ছেলেদিগকে তজ্জন্য দায়ী করিয়া বসিল। সদ্যোবিবাহিত জনৈক ছাত্র এই সভায় যোগ দিয়াছিল। তাহার পিতা এই বিবাহ উপলক্ষে পাত্রীপক্ষের উপর রীতিমত মোচড় দিয়া হাজার কয়েক টাকা আদায় করিয়াছিলেন, সুতরাং সহপাঠিনীর খোঁচাটি তাহার গায়েই সর্ব্বপ্রথম বিঁধিল। যে চড়া সুরে মেয়েটি মন্তব্য তুলিয়াছিল, তাহার পর্দ্দা তিনগুণ অধিক চড়াইয়া ছেলেটি পাল্টা জবাব দিল। তাহার পরেই সভার আইন-কানুন ভাঙ্গিয়া কদর্য্য আবহাওয়া আত্মপ্রকাশ করে।

মেয়েরা এখনও সে কথা ভোলে নাই, সুতরাং সংসদের প্রথম বৈঠকেই সতেজে ইহারা পণপ্রথার বিরুদ্ধে যে নীতি ঘোষণা করিয়াছে,—তাহাকে ভিত্তি করিয়া উত্তেজনাপূর্ণ গান, নূতন নূতন প্রস্তাব ও নানাপ্রকার পরিকল্পনা সংসদের প্রত্যেক বৈঠকের বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, বাহিরেও তাহার রেস্ বায়ুপ্রবাহে ছুটিয়া থাকে।

আজ যেন অতিরিক্ত জাঁক-জমকের সঙ্গেই সংসদের বৈঠক বসিয়াছে। নূতন কয়েকটি প্রস্তাব সংসদে উপস্থিত করিবার কথা আছে বলিয়া সভার গুরুত্ব খুবই বেশী।

প্রথমেই মিলিত কণ্ঠের উদ্দীপনাপূর্ণ সুদীর্ঘ 'কোরাস্'গান প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ঝঙ্কার দিয়া ব্যক্ত করিয়া দিল। গানের কথায় শুধু যে কসাইসুলভ মনোবৃত্তিসম্পন্ন পণ-পিয়াসী পাষণ্ড ও তাহাদের বংশধরগণের উপর তীক্ষ্ণ আক্রমণ ছিল তাহা নয়—দেশের নেতৃগণকেও রেহাই দেওয়া হয় নাই; যেহেতু, তাঁহারা যে সকল বিষয় লইয়া আন্দোলনে উন্মত্ত, দেশের সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার তুলনায় সে সমস্তই একান্ত অকিঞ্চিৎকর!

গানের পরই বৈঠকের কাজ আরম্ভ হইল। থার্ড ইয়ারের ছাত্রী নীলিমা মুখার্জ্জী সেই তারিখের 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদকীয় মন্তব্যের চিহ্নিত অংশটুকু বৈঠকে বিবিধ আলোচ্য বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত করিয়া পড়িতে উঠিল—

> গান্ধিজী যদিও প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতানুবর্ত্তিনী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু গত ২৫শে আগষ্ট দিল্লীর কুইন্স গার্ডেনে পতাকা-অভিবাদন অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া উৎসবে সমাগত নরনারীবর্গকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বৈঠকের সেক্রেটারী শক্তি বোস তৎক্ষণাৎ উঠিয়া এই সংবাদটুকুর উপর এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিল—আমি প্রস্তাব করিতেছি, নারীপ্রগতি প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতীয় নারীসমাজের গৌরবস্বরূপ শ্রীযুক্তা নাইডু মহোদয়াকে লিখিয়া জানান হউক,—যেহেতু, পতাকার অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব এবং তাহা উড়াইবার সার্থকতা যখন দেশবাসীর সর্ব্ববিধ স্বাধীন মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তখন এই প্রতিষ্ঠানের বিবেচনায় উক্ত অনুষ্ঠানটির সঙ্গে সঙ্গে কুমারী মেয়েদের পিষাই করিবার জন্য দেশের বুকে পণপ্রথার যে জাঁতা ঘুরিতেছে, তাহা থামাইয়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে কন্যাদিগকেও নিবিড়ভাবে যোগদান করিবার ব্যবস্থায় সচেষ্ট হউন। কংগ্রেসের শ্রদ্ধেয়া নারীনেত্রীর উদ্যোগে নারীজাতীর অবমাননা-কর এই প্রথাটির অবসান হইলে এই সংসদ তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

যুগপৎ সকলেরই কণ্ঠ ঝঙ্কার দিল—'হিয়া'র, 'হিয়ার'! সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে উঠিল। প্রেসিডেণ্ট সেনগুপ্তা সহর্ষে হাত তুলিয়া কহিলেন—'থ্যাঙ্ক-য়ু!'

বলা বাহুল্য, শক্তি বোসের এই প্রস্তাবটি সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমেই সংসদে গ্রাহ্য হইয়া গেল।

বৈঠকে যখন উৎসাহ ও উত্তেজনার একটা উদ্দাম প্রবাহ বহিয়াছে, সেই সময় থার্ড ইয়ারের একটি দুঃসাহসী ছেলে বৈঠকের রুদ্ধ দরজাটি সবলে ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বয়স বড় জোর একুশ-বাইশ, চোখে চশমা, পরিচ্ছদের পরিপাট্য প্রচুর, একটি চক্ষু কিঞ্চিৎ বক্র, সোজা কথায় যাহার আখ্যা হয়—ট্যারা, দাড়ি গোঁফের নিদর্শন পাইবার উপায় নাই, অতি সন্তর্পণে তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিবার লক্ষণ বিদ্যমান। ছেলেটির হাতে একটি কপিং পেন্‌সিল, তার মাথায় সেলুলয়েডের একটা সাদা তাপ্পি।

আগন্তুক ছেলেটির আকস্মিক উপস্থিতি বৈঠক-বিহারিণীদের চক্ষুর

উপর কৌতুকবিজড়িত বিস্ময়ের রেখা ফুটাইয়া তুলিল। বিভিন্ন কোমলময় কণ্ঠ হইতে প্রবল হুমকি উঠিল—ট্রেস্‌পাস, সেমলেস-ক্রীচার, রাস্কেল, ইডিয়াট, ব্রুট্ ইত্যাদি।

প্রেসিডেণ্ট অনীতা সেন টেবিলের উপর সজোরে একটা চাপড় মারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'হোয়াট'স্ দি ম্যাটার্!'

ছেলেটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেক্রেটারীর্ দিকে চাহিয়া কহিল—ক্লাসে আপনার পেন্‌সিল্‌টা ফেলে এসেছিলেন, তাই দিতে এসেছি—এই নিন!

এই ক্লাসেরই আর একটি ডেঁপোমেয়ে দুইচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্লেষের সুরে কহিল—সর্ব্বরক্ষে!

প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করিলেন—পেন্‌সিলটায় বুঝি খোদাই করা আছে যে ওর অধিকারিণী কুমারী শক্তি বোস?

ছেলেটি উত্তর দিল—নাম না থাকলেও এটি যে ওঁরই তা আমি জানি।

অনীতার দৃষ্টি শক্তির মুখে পড়িতেই সে কহিল—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই অনীতা-দি, আমার নিজের বই, খাতা, পেন্‌সিল সম্বন্ধে অনেক সময় আমি নিজেই যা জানি না, এঁরা তাও জানেন!

ছেলেটি ইহাতেও অপ্রতিভ না হইয়া কহিল—আপনার এই পেন্‌সিলটা একটু 'স্পেসাল, রকমের কি-না—

শক্তি একটু কঠিন হইয়া কহিল—ক্লাসে কিছু ফেলে এলে তার তদারক করতে আছে মাইনে করা বেয়ারা, আপনার এতটা 'ফেভার' করবার ত কোনো দরকারই ছিল না, আপনি যদি এই ভেবে এসে থাকেন যে এর জন্যে আমার কাছ থেকে একটা 'থাঙ্কস্, পাবেন, তবে জেনে রাখুন, সেটা আপনার মস্ত ভুল!

ছেলেটি এবার মুখে একটু হাসি টানিয়া কহিল—আপনার হাতের জিনিস, ফেলে এসেছিলেন, আমি সেটা পৌছে দিলুম 'এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড—ইন্ হ্যাণ্ড এণ্ড ইন গ্লোভ উইথ'

ছেলেটির রগের উপর হাতের পেন্‌সিলটির সজোরে একটি ঘা দিয়া শক্তি কহিল—শাট্ আপ্, এণ্ড গেট আউট, প্লীজ।

ছেলেটি বোধ হয় এতটা প্রত্যাশা করে নাই। তাহার কাঁচা রগটির উপর পাকা পেন্‌সিলের আঘাতটি রূঢ় হইয়াই বাজিয়াছিল। শক্তির দিকে আর্ত্ত-দৃষ্টিতে চাহিয়া আহত স্থানটির উপর হাত রাখিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অনীতা কহিলেন—একবারে মেরে বসলি শক্তি,—বাই দি স্ট্রং হ্যাণ্ড!

শক্তি কহিল—তবুও এদের লজ্জা নেই, দেখ্‌লে না—কি রকম ক'রে চেয়ে গেল! একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।

উর্ম্মিলা রায় সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী; সে কহিল—সত্যি! ট্রাম থেকে নেমে ক্লাস পর্য্যন্ত আসাই হয়েছে মুস্কিল! অপরাধের মধ্যে হাত থেকে একখানা নোটবুক পড়ে গিয়েছিল স্টেয়ারকেসের ধারে, অমনি দশজন ভক্ত ছুটলো সেখানা কুড়িয়ে আমার হাতে দিতে; এক বেচারার চশমার একখানা কাঁচই পট্ ক'রে ভেঙ্গে গেল হুড়োহুড়িতে; একটা সীন ক্রিয়েট করে ফেললে তখনি। আমি তখন 'বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা'—হাসব, না পালাব, ভেবেই পাইনে।

শক্তি কহিল—চৌরাস্তার কোন 'ক্রাউডী' মোড়ে এই রহস্য আরো বেশীরকম উপভোগ করবার।

অনীতা প্রশ্ন করিলেন—কি রকম?

শক্তি কহিল—আস ত বাড়ীর 'কারে' কি বুঝবে বল! ইচ্ছে করে এক-একদিন মোড়ের ওপর ট্রাম থেকে নেমে পড়ি; ট্রামের ভিতরে

ত আমরাই একমাত্র হই সবারই দ্রষ্টব্য বস্তু। তারপর, যেমন রাস্তায় নামি, একবারে 'স্টর্ম অন্ দি রোড সৌ'—গাঙের ওপর দিয়ে জাহাজ একখানা 'পাস' করলে, ডিঙ্গিগুলোর যে দুর্দ্দশা হয—ঠিক তাই আর কি! সবাই টলমল! সাইকেল পড়ে রিকসার ঘাড়ে, ফুটপাথের ওপর মাথা ঠোকাঠুকি, ট্রাম, ট্যাক্সী চাপা প'ড়তে প'ড়তে কেউ হয় ত 'হেয়ার ব্রীথ্ এস্কেপ,' 'অ্যাকসিডেণ্ট' যে হয় না—তাও বলা যায় না! তাই ভাবি, মেয়েদের এমন 'সিরিয়স অ্যাট্রাক্সন্'সত্ত্বেও বিয়ের বেলাতেই একেবারে 'নট এনিথিং অফ্ ইম্পর্টেন্স!' তখন লক্ষ্য শুধু টাকা!

অনীতা কহিলেন—এটা হচ্ছে আমাদের সমাজের কাছারি পোষাক! ব্যাধিও এইখানেই। এখন তোদের দেখে যারা হোঁচট খেয়ে মরে, তাদের কারুর সঙ্গে যদি কখনও বিয়ের কথা ওঠে, তা হ'লে তখনই দেখতে পাবি তাদের 'অ্যাপিয়ারেন্স' 'কোয়াইট ডিফারেণ্ট,' এককাঁড়ি টাকার সঙ্গে সালঙ্কারা কন্যাকে গ্রহণ করে কনের বাপের চোদ্দপুরুষকে যেন উদ্ধার করছেন আর কি!

সমবেত কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠিল—সেম্! সেম্!

শক্তি কহিল—তবুও এরা শিক্ষার গর্ব্ব করে, দেশ দেশ ক'রে পেশাদার শোক প্রকাশকদের মত বুক চাপ্ড়ায়, কোথাও মিটিং হ'লে ত আর রক্ষে নেই, দেখবে সব 'সীট' এরাই ভরিয়ে ফেলেছে, 'হাততালির' ঠেলায় বক্তাদের মুখ বন্ধ ক'রে দেয়, অথচ সমাজের বুকের ওপর এত বড় যে অন্যায়ের পাহাড় খাড়া হয়ে রয়েছে, তার দিকে কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই, ওঁদের হাই এডুকেসন আর ইউনিভারসিটির ডিপ্লোমাগুলো জড়ো হয়ে এ অন্যায়ের পাহাড় দিন দিন আরো উঁচু ক'রে তুলেছে।

অনীতা দৃঢ়স্বরে কহিলেন—এখন এই পাহাড় ভেঙ্গে চুরমার করবার ভার পড়েছে আমাদের হাতে।

শক্তি কহিল—রবি ঠাকুরের সেই গানখানা এদের উদ্দেশে যদি আমরা গাই, অপ্রাসঙ্গিক হবে কি অনীতা-দি ?

অনীতা জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ গান ?

শক্তি কহিল—আবৃত্তি না ক'রে গেয়েই শোনাচ্ছি, বেলা, হারমোনিয়মটা বেলো করো।

পরক্ষণে শক্তির কণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে,
মোদের আঁখি ফুটবে
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।"

দুই

দিকে মিশন কলেজের ছেলেরা ভারি মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছে। ছাত্রীরা
স্বতন্ত্র সংসদ খুলিয়া তাহাদিগকে 'বয়কট' করায় তাহাদেব উৎসাহেও
ন ভাঁটা পড়িয়াছে। যদিও দোতালার কোণের দিকের ডিবেটিং
াবের সাবেক ঘরখানি প্রতি শনিবার ছুটির পর তাহাদের সমাগমে
মকাইয়া ওঠে, কিন্তু ছেলেদের কানগুলি পড়িয়া থাকে—নীচের
ানির দিকে। উৎকর্ণ হইয়া তাহারা কুমারী-সংসদের উচ্ছ্বাস
এবং সে সম্বন্ধে পরস্পর নানারূপ আলোচনাও করে। কিন্তু আ......
বষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া নিজেদের বৈঠকে তাহারা প্রতিবাদ তুলিতেও সাহস
ায় না। পূর্ব্বে যে কয়টি ছেলে গোলযোগ পাকাইয়া তুলিয়াছিল এবং
ণপ্রথার যাহারা সমর্থক, তাহারা বে-পরোয়া হইয়া ডিবেটিং ক্লাবে
য়েদের মতবাদের বিরুদ্ধে কতিপয় প্রস্তাব উপস্থিত করে, কিন্তু সেগুলি
াটে সমর্থন না পাইয়া বাতিল হইয়া যায়। অধিকাংশ ছাত্রই দৃঢ়তার
ইত মত প্রকাশ করে যে, ওঁরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন,
মাদেরই উচিত ছিল ওঁদের আগেই তাকে গ্রহণ করা। সমাজের যে
প্রথার উচ্ছেদ করতে ওঁরা বদ্ধপরিকর, আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন
াব? অসম্ভব। বরং, এক্ষেত্রে এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই আমরা
রব না।

ইহার ফলে ইদানীং ছেলেরা ছুটির পরে ডিবেটিং-এর ঘরে সমবেত
বটে, কোন সাধারণ বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা এবং বিতর্কও ওঠে,
ন্তু সভা পূর্ব্বের মত যেন জমজমাট হইবার অবকাশ পায় না।

এদিন আর ছেলেদের সঙ্ঘ ঠিক নিয়মানুযায়ী বসে নাই, সাধারণভাবেই তাহারা সঙ্ঘের এই ঘরখানিতে সমবেত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুনিয়ার বহু আলোচ্য বিষয় থাকিতেও ইহারা সে-সকল সন্তর্পণে এড়াইয়া গোড়া হইতেই সিনেমা ও থিয়েটারের অভিনেতৃদের প্রসঙ্গ লইয়া এমনই মাতিয়া উঠিয়াছে যে, কেহ ঘরখানির ভিতর হঠাৎ প্রবেশ করিলে মনে করিবে কোন গুরুতর বিষয় লইয়া রীতিমত বিতর্ক চলিয়াছে।

বিতর্ক যখন সংঘর্ষের মত সাংঘাতিক হইযা উঠিয়াছে, সেই সময় নীচের তলায় ছাত্রীদের সংসদ-গৃহে মধুর সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তুমুল তর্ক থামিয়া গেল এবং অনেকগুলি কর্ণ যুগপৎ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

সুধীর সোম কৌতূহলের সুরে বলিল—ব্র্যাভো, হারমোনিয়ম সাড়া দিয়েছে।

অনুপম হালদার হতাশের সুরে জানাইল—বেল পাকলে কাকের কি বল? আমাদের যখন ওখানে—নো অ্যাডমিট্যান্স।

নিবারণ বিশ্বাস আশ্বাসের ভঙ্গীতে কহিল—তবুও আনাচে-কানাচে ঘুরলে লাভ কিছু আছে বই-কি, কোরাস্ গানখানা ত আর মুখ বুজিয়ে গাইবে না, তা ছাড়া ফায়ারী স্পীচ্ও—

বিশ্বাসের কথায় বাধা দিয়া বংশীধারী বক্সী হাসিমুখে কহিল—অ যাইহোক, ওদের গানগুলো কিন্তু 'রিয়েলী পাউয়ারফুল', ওর 'এফে কিছু আছেই; প্রত্যেক কথাটি যেন হুলের মত ফোটে!

অখিল্ মিত্র নিবিষ্টমনেই সহপাঠিদের কথাগুলি শুনিতেছিল, কি নিজের কথাটা নিক্ষেপ করিবার অবসর পাইতেছিল না। সে-কালে যাত্রার দলের গায়কের মুখের গান অপেক্ষাকৃত সুদক্ষ গায়ক যেমন সহ কাড়িয়া লইয়া বিচিত্রভঙ্গীতে তান তুলিয়া দর্শকবৃন্দের বাহবা লই

ঠিক সেই ভাবেই মিত্তির বক্তার কথাটি যেন লুফিয়া লইয়াই কহিল—ফুটবেই ত! ফোর্থ ইযারের অনীতা সেন নাম করা ভীমরুল্, উনি হচ্ছেন প্রেসিডেণ্ট, আর থার্ড ইযারের 'শার্প' বোল্‌তা শক্তি বোস্ সেক্রেটারী, বাকি যে পনেরোটি সভ্যা, তাঁরা হচ্ছেন প্রত্যেকেই এক একটি মৌমাছি। এঁদের উচিত ছিল, সভার নাম দেওয়া—হুল-ফোটানো-সংসদ।

ছেলের দল সমস্বরে উল্লাসের সুরে কহিয়া উঠিল হিয়ার! হিয়ার!

সত্যব্রত সেন ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিয়া কহিল—মিস্টার মিত্তির দেখছি ও-দলের অনেক খবরই রাখেন!

মিত্তির কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর দিল—রাখতে হয় ঐ মিস্ শক্তি বোসের জন্যে।

সেন ব্যঙ্গের সুরে কহিল—এনগেজমেণ্ট চলেছে বুঝি! ও-পক্ষ বোস, আর এ-পক্ষ মিত্তির, তার ওপর সহপাঠিনী এবং রীতিমত বিউটি!

মিত্তির কহিল—তুমি যেমন পাগল! ওকে ত চেন না, এমন শক্ত মেয়ে খুব কম দেখেছি। দৃক্‌পাত করে না কাউকে। কত ছুতো ধ'রে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছি, সবই হয়েছে বৃথা। ও ব্রেক নট, বেণ্ড নট, য়্যাণ্ড্ কেয়ার নট্—

সেন হাসিমুখে কহিল—থ্যাঙ্ক য়ু! আশা ছেড়ো না, ভাই; আজ না হতে পারে, হতে পারে কাল!—Much rain wears the marble অতএব go on.

মিত্তির এবার উৎসাহের সহিত কহিল—এই যে খাতাখানা দেখছ, এটা মিস্ বোসের। ক্লাসে ফেলে এসেছেন, আমি বয়ে বেড়াচ্ছি আর ফুরসৎ খুঁজছি, কি ক'রে তাঁর হাতে পৌঁছে দিই!

অনুপম হালদার ব্যবস্থা দিল—তার জন্যে ভাবনা কি, চ'লে যাও

সোজা ঐ পর্দাখানা ঠেলে ওদের সভায়; খাতাখানার শোকে মিস্ বোসের প্রাণখানা হাঁপিয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই, হাতে ক'রে ঐটি পৌছে দিলেই সাদরে তাঁর পাশের চেয়ারখানাও হয় ত এই সূত্রে অফার ক'রে বসবেন!

মিত্তির হতাশের সুরে জানাইয়া দিল—সে গুড়ে বালি! ও-ঘরে মুখখানি বাড়ালেই অমনি—গেট্ আউট প্লীজ্!

সেন সহাস্যে প্রশ্ন করিল—কেস্‌টা তা হ'লে নতুন নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ এবং সম্ভবতঃ সেটা তিক্ত?

মুখখানা গম্ভীর করিয়া মিত্তির উত্তর দিল—অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার আয়োজন চলেছে। চাকে ঢিল ফেলা হয়েছে, অর্থাৎ 'মিশন' একটা ডেসপ্যারেট হয়ে সংসদে গেছে—তারই প্রতীক্ষা করছি।

বক্সী কহিল—বটে, কিন্তু ব্যাপারটা শুনিনি ত!

সেন সাগ্রহে প্রশ্ন করিল—কার ঘাড়ে দুটো মাথা গজালো হে? মিশনের মূলতত্ত্বটা কি—আর দুঃসাহসী মিশনারীটি কে শুনি?

মিত্তির উত্তর দিল—থার্ড ইয়ারের তারিণী রায়।

শ্লেষের সুরে হালদার জিজ্ঞাসা করিল—টেরু রায়? সর্ব্বনাশ, ছাগলকে পাঠালে সব্জীর বাগানে! টেরু ত মিস্ বোসের নামে পাগল, ক্লাসে বসে টেরা চোখের কসরৎ যা চালায়—

সেন কহিল—দেখ, কান ধরে প্রিন্সিপ্যালের অফিসে না চালান ক'রে দেয়! মিত্তির কিন্তু কাজটা ভাল করনি, ওই পাগলটাকে ওদের গোয়ালে পাঠিয়ে!

সোম কহিল—মিত্তিরের পেটেপেটে বুদ্ধি, টেরু কি তা জানে? মিত্তির চায় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে। মূলে রয়েছে রীতিমত জেলাসী।

হালদার জিজ্ঞাসা করিল—তার মানে?

সোম কহিল—মানে, মিত্তিরও মরেছে; মিস্ বোসের হাতের খাতা-খানাই একমাত্র একজ্যাম্পল নয়, আরও অনেক কিছু আছে। মিস্ বোস ক্লাসে ক বার কাসে, কখন হাসে আর বসে বসে কি করে—তার সমস্ত হিসেব ওর কাছে পাবে। ওদিকে টেরু রায়ও এ-ব্যাপারে পাল্লা দিয়ে চলে। তাই চালটা চেলেছে মিত্তির!

হালদার কহিল—কিন্তু ফল ত উল্টো হতেও পারে! রায়ের এই 'ডেসপ্যারেট য়্যাটেমপ্ট' দেখে মিস্ বোস যদি হাত মিলোয়? তখন মিত্তিরের এই চাল ত মাত হয়ে যাবে।

মিত্তির হাসিয়া কহিল—

রাবণ শ্বশুর মোর, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?

হালদার উত্তর দিল—

প্রেমের ভিখারী টেরু, অর্থে সে আমীর;
শুনিয়াছি, পিতা তার টাকার কুমীর।

মিত্তির কহিল—

টাকার কুমীর ব'লে, বেচিতে টেরারে
উঠিছে নিলেম-দর দশটি হাজারে।
নির্ভয়ে আমার সখা, তাই এ মিশন—
Making a cat's paw of one!

সেন দুই হাত তুলিয়া জোর গলায় কহিল—আর নয়, এবার যবনিকা পতন হোক। গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল—ভাল নয়।

ঘরখানির কোণের দিকে শেষের বেঞ্চিটির প্রান্তদেশে বসিয়া একটি

ছেলে একখানা ইংরেজী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাইতেছিল। এ পর্য্যন্ত ঘরের এতগুলি ছেলের মধ্যে শুধু এই ছেলেটিই কোন আলোচনাতেই যোগ দেয় নাই, মুখ খোলে নাই এবং মুখ চক্ষুর ভঙ্গীতেও ধরা দিবার মত কোনরূপ চিহ্নও প্রকাশ করে নাই। আলোচনার সময় এই নির্ব্বাক ছেলেটির দিকে বিশ্বাস ও বক্সীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, উভয়ের চোখে চোখে একটা ইঙ্গিতও বিদ্যুতের মত খেলিয়া যায়। এই সময় সুযোগ বুঝিয়া ছেলেটির কাছে গিয়া বক্সী প্রশ্ন করিল—আপনি বোধ হয় কারুর প্রক্সী দিচ্ছেন? আমার অনুমানটি কি ঠিক নয়?

ফিক করিয়া হাসিয়া এবং বড় বড় দুটি চক্ষুর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছেলেটি উত্তর দিল—বোধ হয়! ঠিকে ভুল ক'রে ফেলেছেন যে!

একঘর ছেলে একটি ছেলের কথার মধুর সুরে আকৃষ্ট হইয়া অবাক-বিস্ময়ে তাহার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তাহাদের মনে হইল, কুমারী-সংসদের কোমলাঙ্গীদের কণ্ঠের কোমল মিষ্ট সুর যেন এই প্রিয়দর্শন ছেলেটি হাসিমুখে তাহাদিগকে শুনাইয়া দিল।

ছেলেটিকে দেখিলেই মনে হয় যেন এখনও কৈশোরের সীমাতেই সে আটকাইয়া আছে। মেয়েদের মুখের মত সুশ্রী সুন্দর কোমল মুখ, ত্বক দিয়া যেন লাবণ্যের লালিমা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, আর এত মসৃণ যে—ক্ষৌরকর্ম্মের কোন নিদর্শনই বুঝিবার জো নাই, অথবা হয়ত কোমল ত্বকের লালিমার উপর কালিমার আবারণ টানিতে কেশকুল এখনও সাহস পায় নাই। চেহারা পাতলা ছিপছিপে, হইলেও সবল পেশীগুলি কমনীয় অঙ্গের লাবণ্যের সংযোগে এমন একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রূপশ্রী ফুটাইয়া তুলিয়াছে যাহা সত্যই অপূর্ব্ব। চক্ষু দুটি অতিশয় স্বচ্ছ, যেন ঝকঝক করিতেছে। ছেলেটির মেয়েলী-ছাঁদের মুখে পরিহাসপ্রিয় মেয়েদের মত মিষ্ট হাসিটুকু যেন লাগিয়া আছে।

বক্সীর প্রশ্নের উত্তরে হাসিমুখে ছেলেটি যেন মিছরির ছুরির খোঁচা দিল। কালো মুখখানা আরও কালো করিয়া বক্সি কহিল—'স্যরী', মাপ করবেন। আমি আর একজনকে 'মীন্' করেছিলুম। তার চেহারাও ঠিক আপনার মতই।

মুখ ও চক্ষু হাসিতে ভরাইয়া ছেলেটি কহিল—বলেন কি! আমারএই চেহারার সঙ্গে মেলে এমন ছেলে আপনাদের কলেজে তা হ'লে আছেন?

বিশ্বাস বক্সী-বন্ধুর হইয়া উত্তর দিল,—ছিলেন, তবে বর্ত্তমানে নেই।

দৃষ্টিভঙ্গীতে বন্ধুর উপস্থিত-বুদ্ধির তারিফ করিয়া বক্সী কহিল—গা ঢাকা দিয়েছেন তিনি। আপনার দিকে হঠাৎ নজর পড়তে ভেবেছিলুম বুঝি ফিরেছেন।

ছেলেটি হাসিয়া ফেলিল, তাহার বিচিত্র হাসির ভিতর দিয়াই বিচিত্র স্বরে মুখের স্বর বাহির হইল—আর, প্রক্সী দিতে এসেছেন!

দুই বন্ধুর রচা কথাটি যে ছেলেটি প্রত্যয় করে নাই, হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, মুখের হাসিটুকুই তাহা যেন প্রকাশ করিয়া দিল।

এই ছেলেটির হাসি এবং স্বর ঘরের সব কয়টি ছেলেকেই মুগ্ধ করিযাছিল, হালদার যেন সর্ব্বাপেক্ষা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে এই সময কহিল—আপনার গলাটি কিন্তু ভারি মিষ্টি, কথা বলছেন আর মনে হচ্ছে যেন বাঁশী বাজাচ্ছেন।

সোম কহিল—আর হাসছেন যেন মুক্ত ছড়াচ্ছেন।

ছেলেটি এবার খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসির গমক থামিতেই কহিল—আমি নিশ্চয়ই তা হ'লে বেনা-বনে বসে নেই!

সেন কহিল—না, কুড়িয়ে নেবার লোক আছে। আমরা আপনাকে লুফেই নেব। খাসা একটা 'আইডিয়া' আমার মাথায় ঢুকেছে আপনাকে দেখে।

ছেলেটির মুখের হাসি যেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, আইডিয়াটা শুনিবার জন্ম সকৌতুকে সে সেনের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেন কহিল—আপনি অবশ্যই জানেন যে, মেয়েদের সঙ্গে আমাদের 'টগ্ অফ ওয়ার' চলেছে, প্রিন্সিপ্যাল নিয়েছে ওদের সাইড, আমরা কাজেই পিছিয়ে পড়েছি। ওদের সংসদে আমাদের সেঁধুবার জো নেই, অথচ ওরা ইচ্ছে করলেই আমাদের সঙ্ঘে আসতে পারে, আমরা কোন দিনই দরজা বন্ধ করিনি। এখন আপনি যদি দয়া করে রাজী হন, আপনাকে মেয়ে সাজিয়ে চালিয়ে দিই ওদের ভিতরে, সাজাবার ভার আমি নিজে নেব—

সেনের কথাটা ছেলেদের বেশ উপভোগ্য হইল, সকলের মুখে হাসি ফুটিল, বহুকণ্ঠের গুঞ্জন উঠিল—খাসা আইডিয়া। সবার দৃষ্টি এই নূতন ছেলেটির মুখের দিকে।

মৃদু হাসিয়া ছেলেটি উত্তর করিল—আমরা ত সকলেই এখানে মেয়ের পার্ট প্লে ক'রে চলিছি, বিশেষ ক'রে সাজবার দরকার আছে কি?

আবার সেই মিছরির ছুরির খোঁচা! ছেলেদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় চলিল। সেন ঘাড় তুলিয়া প্রশ্ন করিল—এ কথার মানে?

হাসিমুখেই ছেলেটি কহিল—মানে বুঝতে পারেন নি? তা হবে, সবাই পার্ট নিয়ে নেমেছেন, তাই নিজেদের ঠিক হদিস পান নি। আমি এখানে বাইরের লোক, নতুন এসেছি, তাই আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। সর্ব্বত্রই একই ব্যাপার চলেছে, ছেলেরা নিয়েছে মেয়ের পার্ট—মনগুলো তাদের মেয়েলী হয়ে গেছে; আর মেয়েরা করছে পৌরুষের চর্চ্চা, শুধু কলেজে নয়—সমাজেও।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গাঙ্গুলী প্রশ্ন করিল—দু একটা একজ্যাম্পল দেখাবেন দয়া ক'রে?

ছেলেটি কহিল—প্রয়োজন আছে কি এর পরে? নিজেদের প্যানে ভালো ক'রে তাকালেই একজ্যাম্পল স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মেয়েদের কাজগুলো টেনে নিয়েছেন আপনারা—পরনিন্দা পরচর্চ্চা ঠাট্টা বিদ্রূপ আরো কত কি, আর আপনাদের কাজগুলো বেছে নিয়েছে মেয়েরা—সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দোষগুলো ধরিয়ে দিচ্ছে।

সেন কহিল—থামুন মশাই থামুন, আপনাকে ঘাঁটিয়ে দেখছি মস্ত ভুল করেছি।

বক্সী মুখখানা মচকাইয়া কহিল—ঠিকে ভুল আমিই করেছি, লোক ঠাওরাতে পারিনি, চশমার পাথরখানা দেখছি পাল্টাতে হবে।

হালদার বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া ছেলেটিকে প্রশ্ন করিল—আপনার নামটি জানতে পারি, স্যর?

ফিক করিয়া হাসিয়া মিহিস্বরে ছেলেটি উত্তর করিল—বিপুল বিশ্বাস।

বক্সী নিবারণের দিকে চাহিয়া কহিল—ওহে বিশ্বেস, তোমার জুড়ি হলেন ইনি, বিশ্বাসে বিশ্বাসে মিলে এবার নাভিশ্বাস উঠবে।

স্প্রীংয়ের চাপা দরোজাটি সশব্দে ঠেলিয়া এই সময় সবেগে ঘরে ঢুকিল আর একটি ছেলে। তাহাকে দেখিয়াই বক্সী সুর পাল্টাইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল—রায় এসেছে, তারিণী রায়।

সেন কহিল—খবর কি রায়? তোমার মুখ চেয়ে মিত্তির মিস বোসের খাতাখানা বুকে ক'রে বসে আছে, কি করে এলে? বাজিমাত?

তারিণী টেরা চোখের দারুণ দৃষ্টি করুণ করিয়া কহিল—কুপোকাত।

হালদার প্রশ্ন করিল—ব্যাপার কি? কাত হ'লে, না ক'রে এলে?

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তারিণী কহিল—ডিফিটেট এণ্ড রিট্রীটেড।

দুইচক্ষু কপালে তুলিয়া মিত্তির কহিল—তার মানে? মিস্ বোসের পেনসিলটা ত তোমার হাতে দেখছিনে!

সেন হাসিয়া কহিল—ব্যাপারটা ভালো ক'রে বলে ফেল রায়। মিত্তির অস্থির হয়ে উঠেছে।

তারিণীর মুখে বেদনার ছায়া পড়িল, স্বরেও ব্যথার আভাস পাওয়া গেল; কহিল—ওদের সঙ্গে মিটমাটের কোন আশাই নেই, ওরা যেন, একেবারে ছেঁটে ফেলে ক্লাইম্যাক্সে উঠেছে—সেইটিই জানিয়ে দিয়েছে আমাকে।

সেন জিজ্ঞাসা করিল—কিছু বলেছে?

তারিণী কণ্ঠস্বর রীতিমত গাঢ় করিয়া কহিল—হাতে মুখে এক করেছে। অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড—যেই আমি পেনসিলটা দিতে এগিয়ে গেলুম, অমনি মিস্ বোস থপ ক'রে আমার হাত থেকে সেটা টেনে নিয়ে ঠকাস করে রগের উপর একটি ঘা বসিয়ে দিয়ে ঝাঁঝিয়ে বললে—শাট্ আপ, গেট আউট প্লীজ—

মিত্তিরের মনে হইল পেনসিলের আঘাতটি তাহারও রগে পড়িয়াছে। রায়ের কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ হইতে একটা চাপা স্বর সাড়া দিল—সর্ব্বনাশ, মারলে!

সেন জিজ্ঞাসা করিল—তার পর, তুমি কি করলে?

মুখখানা বিকৃত করিয়া তারিণী কহিল—কি আর করবো! মিস্ বোসের মূর্ত্তি যদি দেখতে তখন! রগটা টিপে ধরে চলে এলুম।

বক্তা আর মিত্তির ছাড়া অপর সবার মুখেই চাপা হাসি, অস্ফুট গুঞ্জন। মুখের হাসি চাপিয়া হালদার কহিল—যাকে বলে—ইন দি ভেরী অ্যাক্ট।

কোণের বেঞ্চি হইতে এই সময় সেই নূতন ছেলেটি অর্থাৎ বিপুল বিশ্বাস মেয়েলী-কণ্ঠে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া মিত্তিরের দিকে চাহিয়া মিহি সুরে কহিল—তা হ'লে আপনার অবস্থাও দেখছি হোপলেস্, মিস্ বোসের খাতাখানা বহন করাই সার হল।

বক্সী উপরপড়া হইয়া কহিল—ইচ্ছা করলে আপনিই ঐ ভারটি বহন ক'রে মিত্তিরকে মুক্তি দিতে পারেন।

তারিণী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপুলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ কথার মানে? ইনি—

সেন কহিল—কেন দেখনি, কদিন ধরেই এই ঘরে বসছেন। আমি প্রস্তাব করেছিলুম একটু আগে—মেয়েদের মত 'মেক্ আপ' করে ওঁকে ওদের সংসদে পাঠানো হোক। আমি জোর ক'রে বলতে পারি, ভাল ক'রে সাজালে অমন যে ইনটেলিজেণ্ট শক্তি বোস্—সেও ধরতে পারবে না কিছুতেই।

বক্সী কহিল—আহা, ওটা ভেবেই ত আমি মিত্তিরকে মুক্তি দেবার কথা তুলেছি হে! এখন বিপুল বিশ্বাস মশাই যদি দয়া ক'রে মিস্ বিপুলা কিম্বা বেহুলা গোছের কিছু সাজতে রাজী হন—ছাত্রসঙ্ঘের মুখ রক্ষা হয়।

গাঙ্গুলী কহিল—রাজী না হবেনই বা কেন? সঙ্ঘের নিয়ম হচ্ছে, মেজরিটি যার উপর যে ভার দেবেন, মুখ বুজে তাই তাকে করতে হবে।

বক্সী কহিল—ঠিক কথা। তা হ'লে প্রস্তাবটি ভোটে তোলা হোক। আমাদের নবাগত বন্ধু মিস্টার বিপুল বিশ্বাস মিস্ বিপুলা কিম্বা বেহুলা রূপে মিত্তিরের হাতের খাতাখানি নিয়ে কুমারী-সংসদে অভিযান করেন—এই হচ্ছে আমার প্রস্তাব। দয়া ক'রে সকলে হাত তুলে প্রস্তাবটির সমর্থন করুন। যাঁর আপত্তি থাকবে হাত গুটিয়ে বসুন।

দেখা গেল বিপুল বিশ্বাস এবং অখিল মিত্তির ব্যতীত ঘরের সকল ছেলেই বিপুল উৎসাহে হাত তুলিয়াছে।

বক্সী চারিদিকে চাহিয়া উল্লাসের সুরে কহিল—ফতে! ভোটে আমার প্রস্তাব জিতে গেছে।

সোম কহিল—অখিল মিত্তির ভুয়ো! খাতাখানার মায়া ছাড়তে পারলে না!

বক্সী কহিল—দুর্ভাগ্য তোমার, চেহারাখানা মোটেই মেয়েলী ঢংয়ের নয়, নইলে বিপুল বিশ্বাসকে কাণ্ডারী করি!

গাঙ্গুলী কহিল—ভয় নেই মিত্তির, বেহুলা দেবী নিশ্চয়ই তোমার হয়ে দূতিয়ানী করবেন। তা হ'লে—

গৌণে আর কিবা প্রয়োজন,
আয়োজন কর সবে, কুমারী-সজ্জার!

বক্সী বিপুলের দিকে চাহিয়া মিনতির সুরে কহিল—ভোটের ফল ত দেখলেন, উঠুন; এখন আর ত 'না' বলবার জো নেই। সঙ্ঘের আদেশ!

কিন্তু এরূপ নির্দ্দেশ সত্ত্বেও ছেলেটি যেন হাসির ভারে ফাটিয়া পড়ে! একটু পরে সুন্দর মুখখানির একটি বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া কহিল—কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ ক'রে ফেলেছেন, আমি ত আপনাদের সঙ্ঘের সভ্য নই!

বক্সীর মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গেল। এক-ঘর ছেলের উৎসাহের দীপে যেন জলের ধারা পড়িল।

সোম রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—সভ্য যদি ন'ন ত, সঙ্ঘে এসেছেন কেন?

বিপুলের মুখে পরিবর্ত্তনের চিহ্নও পড়ে নাই, তেমনই হাসিয়া উত্তর দিল—বিধি-নিষেধ ত আপনারা রাখেন নি, পথ খোলা দেখেই মন খুলে সেঁধিয়েছিলুম, আপত্তি থাকে, উঠে যাচ্ছি—

বলিয়াই সে মধুর একটি ভঙ্গী করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারিণী জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোন্ ইয়ারে ঢুকেছেন বলুন ত? নিশ্চয়ই নতুন এসেছেন—

ফিক করিয়া হাসিয়া বিপুল কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, ফোর্থ-ইয়ারে

ঢুকবো বলে পিটিসান করেছি। তবে এখনো নাম ওঠেনি। কাজেই সময়টা কাটাতেই আপনাদের সঙ্ঘে এসে বসেছিলুম।

ঘরশুদ্ধ ছেলের মুখগুলি একসঙ্গে ম্লান হইয়া গেল। আলোচনাকারীদের অধিকাংশ ছেলেই থার্ড ইয়ারে পড়ে, সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলের সংখ্যা অল্প, ফার্ষ্ট ইয়ারের ছেলেরা আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, গোলযোগ বাধিলে আগাইয়া যায়, আলোচনায় বড় একটা যোগ দেয় না—যদিও হাততালি দিবার সময় ইহাদের উৎসাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। ফোর্থ ইয়ারের একটি ছেলে যদিও সঙ্ঘের সভাপতি এবং তাহার অনুরোধে কতিপয় সহপাঠী সঙ্ঘে নাম লিখাইয়াছে, কিন্তু এদিন তাহাদের কেহই উপস্থিত ছিল না। সঙ্ঘের উদ্যোক্তারা বহু সাধ্য-সাধনা করিযাও ফোর্থ-ইয়ারের বেশীসংখ্যক ছেলেকে সঙ্ঘের সংস্রবে আনিতে পারে নাই। অথচ, অল্পবয়স্ক মেয়েলী চেহারাবিশিষ্ট যে-ছেলেটিকে একান্ত অর্ব্বাচীন ভাবিয়া তাহারা যাহা-নয়-তাই বলিয়া উপহাস করিতেছিল, সে-ই কি-না মিসন কলেজের ফোর্থ-ইয়ারে ভর্ত্তি হইতে আসিয়াছে!

মাতব্বর ছেলেগুলি এক সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহাদের মুখের ভঙ্গী এখন অন্যরূপ। গাঙ্গুলী সর্ব্বাগ্রে সবিনয়ে কহিল—আমরা আপনাকে ভুল বুঝেছিলুম স্যর, মাপ করবেন।

হালদার কহিল—বসুন স্যার, যাবেন না। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনাকে সঙ্ঘে পেয়েছি।

তারিণী কহিল—আশ্চর্য্য, এঁরা এতক্ষণ অন্ধকারেই হাতড়াচ্ছিলেন। আলাপ জমে উঠেছে, অথচ জিজ্ঞাসা করেননি আপনি কোন্ ইয়ারে আছেন? আমিই ত সিচুয়েসানটা সেভ ক'রে দিলুম।

সেন কহিল—আমাদেরও দোষ নেই স্যর, এই চেহারা, আর এত কম বয়সে কোন ছেলে যে ফোর্থ-ইয়ারে এগুতে পারেন—ধারণা

করতেই পারা যায় না, আপনি কিন্তু এদিক দিয়ে রেকর্ড ব্রেক করেছেন।

বিপুল এতক্ষণে নীরবে হাসিতেছিল। সেনের কথা শেষ হইলে সহসা মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল—থাক, আর নয়। এবার ইতি করুন। এই বয়সে আই-এ পাস করে বি-এ পড়ছি বলে—এটা এমন কিছু চমকাবার মত ব্যাপার নয়। বি-এ পড়া আর বি-য়ে করা ত কলেজের ছেলেদের ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল, তবে?

অনুরোধের সুরে বক্সী কহিল—ওসব কথা ছেড়ে দিন স্যর, এখন আমাদের সৌভাগ্য এই যে আপনাকে আমরা পেয়েছি।

সোম কহিল—আমরা আপনাকে ছাড়ছিনে স্যর, সঙ্ঘে আপনার নাম লিখে তবে আমাদের অন্য কাজ।

বিপুল কহিল—নাম যদি লেখাতে হয়, কুমারী-সংসদেই লেখাবো।

মুখখানা শক্ত করিয়া বক্সী জিজ্ঞাসা করিল—তার মানে?

বিপুল উত্তর করিল—মানে, ওঁদের যা উদ্দেশ্য, আমারও তাই।

সেন কহিল—ওরা আপনাকে নেবে কেন?

বিপুল উত্তর করিল—সে আমি বুঝবো, তার জন্যে আপনাদেরই বা এত দুশ্চিন্তা কেন?

গলায় জোর দিয়া গাঙ্গুলী কহিল—বুঝতে পেরেছি, আপনি হচ্ছেন ও-পক্ষের 'স্পাই'—ভেতরের খবর সংগ্রহ করতে এসেছিলেন।

তেমনই হাসিয়া বিপুল কহিল—সংগ্রহ করবার মত বস্তু কিছু যদি আপনাদের ভিতরে পেতুম, হয় ত দলে ভিড়ে পড়তুম। কিন্তু দেখলুম, শূন্য ঘড়া—কিছু নেই। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সহসা মুখখানা শক্ত করিয়া বিপুল কহিল—কিন্তু থাকতে পারি, যদি বস্তু আপনাদের ভেতরে কিছু আছে দেখাতে পারেন।

বক্সী জিজ্ঞাসা করিল—কি দেখতে চান?

বিপুল কহিল—পৌরুষ, তেজ, সাহস, কাজের উদ্যম। আছে আপনাদের? কুমারী-সংসদের মেয়েরা মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে যে আন্দোলন শুরু করেছেন—কাগজে-কলমের ভিতরেই যেটা আটকে আছে, আপনারা সেটাকে রূপ দিতে পারেন কাজের ভিতর দিয়ে?

গাঙ্গুলী উত্তর দিল—পারি, কিন্তু দেব না।

বিপুল জিজ্ঞাসা করিল—তার কারণ?

গাঙ্গুলী কহিল—কারণ হচ্ছে, মেয়েরা যে আন্দোলন তৈরী করেছে, আমরা তাকে 'ফলো' করতে পারিনে। আমরা পুরুষ, নতুন রাস্তা ধরাই আমাদের পৌরুষ।

সেন,সোম,হালদার প্রভৃতি অনেকেই গাঙ্গুলীর উক্তির সমর্থন করিতে সমস্বরে কহিল—হিয়ার, হিয়ার!

বক্সী কহিল—তা ছাড়া, আর একটা কথা আছে, কলেজের সম্পর্কেই আমাদের এই ক্লাব। পাঠ্যের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই, সেই সব সামাজিক সমস্যাকে আমাদের আলোচনার 'য়্যাজেণ্ডা' করা কিছুতেই উচিত নয়। কাজেই বিবাহ বা পণপ্রথা নিয়ে আমরা আলোচনা চালাতে রাজী নই।

মুখে তীক্ষ্ণ হাসির ঝিলিক তুলিয়া বিদ্রূপের সুরে বিপুল কহিল—মাপ করবেন, একটা কথা তা হ'লে জিজ্ঞাসা করি, সিনেমা থিয়েটারের অ্যাক্টর-অ্যাক্ট্রেস আর কুমারী-সংসদের মেয়েদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনাগুলো কি আপনাদের পাঠ্যের অন্তর্গত? আপনারা যে উচ্চ-শিক্ষার পথে এগিয়ে এসে উৎসন্নের পথে নেমে যাচ্ছেন—সেটা লক্ষ্য করেছেন? আপনারা না জাতির ভবিষ্যৎ ভরসা, এইভাবে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবেন? ছিঃ!

. ছেলেটির সেই হাসিমাখা মেয়েলী মুখখানা এ-সময় একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে,' সারামুখে একটা দীপ্তি ফুটিয়াছে, চোখের তারা দুটি যেন জ্বলিতেছে। ঘরের এতগুলি ছেলে—সকলেই নির্ব্বাক্, কাহারও মুখে কথা নাই। তাহাদিগকে স্তব্ধ করিয়া বিপুল যেন দমকা বাতাসের মত সবেগে চলিয়া গেল।

তিন

সেদিনের অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে সভানেত্রী সংসদের শান্তিরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কক্ষটির রুদ্ধ দরজার উপর এদিন একখানি মোটা পরদা পড়িয়াছে এবং বাহিরে এক নেপালী দরোয়ানকে পাহারা দিবার জন্য মোতায়েন করা হইয়াছে। বিনানুমতিতে এখন আর কাহারও পক্ষে সংসদ-কক্ষে প্রবেশ করিবার উপায় নাই।

সকলের উপস্থিতিতে কুমারী-সংসদের পরবর্ত্তী বৈঠকটি গোড়াহইতেই জমজমাট হইয়াছে। প্রতি বৈঠকের সূচনায় নূতন গান রচিত ও গীত হইয়া থাকে। এদিনের বৈঠকেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

গানের পর সংসদের কাজ আরম্ভ হইল। সেক্রেটারী শক্তি বোস জানাইল—সংসদের যে বিজ্ঞাপন পাঠানো হয়েছিল আমাদের দেশের কাগজগুলিতে, কাগজওলারা বিনামূল্যেই ছেপেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ দেবার জন্য আমি প্রস্তাব তুলছি।

উল্লাস সহকারে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। সত্যভামা সান্যাল এই সম্পর্কে কহিলেন—সংসদের বিজ্ঞাপনটি সেক্রেটারী আমাদের পড়ে শুনিয়ে দিন।

সেক্রেটারী শক্তি বোস তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞাপনটি পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

> আমাদের সমাজের বুকের উপর পণপ্রথার যে জাঁতা চলিতেছে, তাহা বন্ধ করিতে কুমারী-সংসদ কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর্ত্ত-কুমারীদিগকে আমরা অনুরোধ করিতেছি যে কেরোসিন, অহিফেন বা পটাসিয়াম সায়েনাইডের আশ্রয় না লইয়া তাঁহারা

> যেন সংসদের সভানেত্রীকে সবিশেষ লিখেন, প্রতীকার হইবে। শুভ বিবাহের নামে যে-সকল পণ-পাহাড় কন্যাপক্ষের উপর করাত চালাইতে এখনও নিরস্ত নয়, তাহাদের নাম ঠিকানা ও বিবরণ লিখিয়া পাঠান, সংসদ তাহার প্রতিবিধান করিবে।

মহামায়া মুখার্জ্জী কহিল—বিজ্ঞাপনটিতে আর দুটি লাইন 'য়্যাড' করা হোক!

শক্তি বোস কহিল—কি য়্যাড করতে চাও, বল।

মহামায়া কহিলেন—ঘুষ লওয়া এবং ঘুষ দেওয়া যেমন সমান অপরাধ, ছেলে-মেয়ের বিবাহে পণের আদান-প্রদানও তদ্রূপ।

সভানেত্রী কহিলেন—ঠিক কথা। নয় কি?

অনেকগুলি কণ্ঠস্বর যুগপৎ নির্গত হইল—নিশ্চয়ই।

গোদাবরী গুপ্তা কহিল—আর একটা কথা য়্যাড করা হোক যে, যাঁরা চিঠি-পত্র লিখবেন, নাম ঠিকানা গোপন রাখা হবে।

শক্তি বোস কহিল—এ কথাটাও খুব দরকারী। তা হ'লে টুকে নিই?

সকলেই সম্মতি দিল। সেক্রেটারী কথাকয়টি খাতায় লিখিয়া লইয়া কহিল—কুমারী-সংসদের গান সমাজের কানে বেজেছে। প্রায় সব কাগজেই সংসদের সম্পর্কে এডিটোরিয়েল প্যারা ছাপা হয়েছে।

সভানেত্রীর আদেশে সম্পাদিকা বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্য-গুলি পাঠ করিলেন। তাহাদের মোটামুটি মর্ম্ম এইরূপ—

> বস্তুত দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাময় বিষয়টির সমাধানে দেশের নেতা ও সমাজপতিগণকে উদাসীন দেখিয়া শিক্ষিতা কুমারী ছাত্রীবৃন্দ নিদারুণ অবমাননা হইতে নারীত্বের শুভ্রতাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এই আদর্শ সংসদটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে কবির সেই বিখ্যাত গানটিই আমাদের স্মৃতিমূলে ঝঙ্কার দিতেছে—

'না জাগিলে সব ভারতললনা,

এ ভারত আর জাগে না জাগে না,

কুমারী-সংসদের বীর-কুমারীদের এই জাগরণ সার্থক হউক,

তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

বিপুল উৎসাহে সভ্যাগণ করতালি দিয়া অন্তরের উল্লাস প্রকাশ করিল। অতঃপর সংসদের কার্য্য-পদ্ধতি এবং বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব যথাক্রমে অনুমোদিত গৃহীত হইবার পর সম্পাদিকা শক্তি বোস শেষ প্রস্তাবটি তুলিলেন—আমাদের দেশের যাঁরা নেতা বলে পরিচিত এবং যে-সকল শিক্ষিতা মহিলার দেশনিষ্ঠায় নারী-সমাজ গৌরবান্বিত, তাঁদের প্রত্যেকের নিকট সাময়িকপত্রগুলির মন্তব্য ও সংসদের প্রস্তাবগুলির অনুলিপি পাঠানো হোক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাবটিও গৃহীত হইল।

দরজায় টাঙ্গানো পুরু পরদাটি ঠেলিয়া এই সময় নেপালী দরোয়ানটি ভিতরে আসিল এবং মিলিটারী কায়দায় সেলাম করিয়া সভানেত্রীর হাতে একখানি চিরকুট দিল।

চিরকুটের লেখাটি পড়িয়া সভানেত্রী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সম্পাদিকার দিকে চাহিলেন।

সন্দিগ্ধকণ্ঠে শক্তি প্রশ্ন করিল—কি ব্যাপার অনীতা-দি?

সভানেত্রী কহিলেন—ভারি মুস্কিলে ফেলেছে এই ছেলেটি।

সভানেত্রীর মুখে 'ছেলে' কথাটি শুনিয়াই সংসদের সভ্যাদের চক্ষুগুলি যুগপৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শক্তি জিজ্ঞাসা করিল—মুস্কিলটা কিসের?

সভানেত্রী কহিলেন—ছেলেটি সংসদে ঢুকতে চায়, একেবারে নাছোড়বান্দা—

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে প্রতিবাদ নানা সুরে ধ্বনিয়া উঠিল :

—সর্ব্বনাশ !

——কুমারী-সংসদে কুমার !

—নেভার, নেভার, কিছুতেই নয়।

—নিশ্চয়ই স্পাই ! ছুঁচ হয়ে ঢুকবে, ফাল হয়ে বেরুবে।

—বিশ্বাস ক'র না অনীতা-দি, ঢুকিও না।

বিরক্ত হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে সভানেত্রী কহিলেন—চেঁচাচ্ছ কেন মিছিমিছি থামো। কথাটা আগে বলতে দাও—

প্রতিবাদকারিণীদের দিকে চাহিয়া শক্তি কহিল—বড়ই দুঃখের কথা, ছেলেদের মত তোমরাও অশিষ্ট হয়ে উঠছ; সভার শৃঙ্খলা যে এতে নষ্ট হয় সে কথা মনে রাখতে চাও না! আপনি বলুন অনীতা-দি, ব্যাপারটা কি ?

সভানেত্রী কহিলেন—ছেলেটি আমার বাড়ীতে গিয়ে দেখা করে। এমন-ভাবে আলাপ-পরিচয় জমিয়ে তার কথাটা পাড়ল যে, আমি কিছুতেই তাকে অস্বীকার করতে পারলুম না।

শক্তি জিজ্ঞাসা করিল—কথাটা কি ?

সভানেত্রী কহিলেন—কুমারী-সংসদের পরিকল্পনা নাকি তার অন্তরে একটা উঁচু রকমের প্রেরণা দিয়েছে। তাই সে এতে যোগ দিতে চায়—উইথ্ অল্ লিম্ব্স্। তা ছাড়া, তার একটা প্রস্তাবও আছে।

শক্তি কহিল—বেশ ত, দেখাই যাক না, তোমার ছেলেটিকে। সব ছেলেই যে খারাপ—এ-রকম একটা ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়াও ত ঠিক নয়।

ধীরভাবে সভানেত্রী কহিলেন—আমিও তাকে কোন কথা দিই নি, সংসদে আসতে বলেছি। তাকে নেওয়া না-নেওয়া সকলের মতের উপর

নির্ভর করছে। প্রেসিডেণ্ট আমাকে করেছ বলেই যে আমি ডিক্টেটর হয়ে যা-তা একটা করব—সে মেয়ে আমি নই।

শক্তি কহিল—তা হ'লে ওকে আটকে রাখলেন কেন, বলুন তাঁকে পাঠিয়ে দিতে।

তথাপি সভানেত্রী সহসা কোন আদেশ দিলেন না, সভ্যাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন—আপত্তি যদি কারুর থাকে, হাত তোল।

কিন্তু কাহাকেও হাত তুলিতে দেখা গেল না, যে কয়টি মেয়ে ইতিপূর্ব্বে আপত্তি তুলিয়াছিল, তাহাদের ভিতর হইতেই একজন বলিয়া উঠিল—কারুর আপত্তি নেই অনীতা-দি, আপনি তাঁকে আসতে হুকুম দিন।

সভানেত্রী নেপালী দরোয়ানের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—বাবুকে আসতে বলো বাহাদুর।

বাহাদুর দরোয়ানটি সভানেত্রী অনীতা দেবীর বাড়ীতেই চাকরী করে। ইদানীং সংসদের ব্যাপারেই ইনি এই বলিষ্ঠ ও প্রভুভক্ত ভৃত্যটিকে বাহাল করিয়াছেন। সংসদের ত আর দরোয়ান রাখিবার মত অবস্থা নয়; বলা বাহুল্য, সংসদের অধিকাংশ ব্যয়ই অনীতা দেবী বহন করিয়া থাকেন, দরোয়ানটিও তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

দরোয়ান বাহিরে গিয়াই যাহাকে ভিতরে যাইবার জন্য সভানেত্রীর সম্মতি জানাইল, সে অপর কেহ নহে—আমাদের সেদিনের পরিচিত শ্রীমান বিপুল বিশ্বাস।

সভ্যাগণ যদিও মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনিয়া সোজা হইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চক্ষুগুলি পড়িয়াছিল দরজায় টাঙ্গানো নীলরঙ্গের পরদাটির দিকে। সেটি নড়িয়া উঠিতেই তাহাদের ঔৎসুক্য বাড়াইয়া ঘরে ঢুকিল দিব্য সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গীতে শ্রীমান বিপুল বিশ্বাস।

অধিকাংশ মেয়ের মুখেই চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। চোখে চোখে

ইঙ্গিতও চলিল। বিপুল কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সভানেত্রীর টেবিলের সামনে গিয়া সহজ ও সপ্রতিভভাবে কহিল—নমস্কার অনীতা-দি, আপনি যে সংসদের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে আমাকে আসবার অনুমতি দিয়েছেন এজন্যে আপনাকে এবং সংসদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি!

ধন্যবাদের কথাটি মুখে বলিলেও সে যুক্ত দুটি হাত ললাটে তুলিয়া সভানেত্রী ও সমবেত সভ্যাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

সভ্যাদের ভিতর হইতে চাপা গলায় একটি মেয়ে কহিল—ভারি মিষ্টি ত গলার স্বরটি।

একখানা খালি চেয়ারের দিকে অঙ্গুলিটি হেলাইয়া সভানেত্রী কহিলেন—বসুন।

ছেলেটি বসিল না, মুখের হাসিটুকু যেন জোর করিয়া চাপিয়া সে কহিল—দয়া দেখিয়েই আবার কিন্তু কঠিন হচ্ছেন আপনি।

দুই চক্ষু বড় করিয়া সভানেত্রী ছেলেটির পানে চাহিলেন—দৃষ্টি যেন জানিতে চাহিতেছিল—তার মানে?

বিপুল কহিল—আপনাকে আমি দিদি বলেছি। তা ছাড়া, সংসদে যাঁদের উপস্থিত দেখছি, এঁদের ভিতরে অনেকেই আমার দিদির বয়সী, ছোট বোনের মতনও অনেকে আছেন। সংসদের বিধি-ব্যবস্থার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি অনুরোধ করছি—বয়সে যাঁরা বড় তাঁরা যেন আমাকে ছোট-ভাই বলেই মেনে নেন, আর যারা ছোট, আমি যেন তাঁদের দাদা হতে পারি।

এমন মিষ্ট সুরে ধীরে ধীরে বিপুল কথাগুলি কহিল যে, সংসদের বড় ছোট নানা বয়সের মেয়েগুলির প্রত্যেকের অন্তরেই বেশ একটু দোলা দিল। অবাক হইয়া তাহারা এই অদ্ভুত ছেলেটির পানে চাহিয়া রহিল।

কলেজের কোন ছেলের মুখে এ-পর্য্যন্ত ইহাদের কেহই এ ধরণের কথা শোনে নাই, এমন শান্ত নম্র ও শিষ্টভাবে কেহ তাহাদের সংস্পর্শেও বুঝি আসে নাই।

সভানেত্রী হাসিয়া কহিলেন—বুঝতে পেরেছি, বসবার জন্যে 'বসুন' বলাটা বরদাস্ত করতে পারো নি। বেশ, কথাটা এবার শুধরে নিচ্ছি,—আচ্ছা, ঐ চেয়ারখানায় ব'স।

থপ করিয়া চেয়ারখানিতে বসিয়া বিপুল মৃদু হাসিয়া কহিল—সত্যই আমাকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করা হ'ল অনীতা-দি!

শক্তি হাসিয়া কহিল—মন্দ হ'ল না। আমার কোন ভাই ছিল না, তা হ'লে ছোট ভাই একটি পেলুম। দেখে মনে হ'চ্ছে, তুমি নতুন এসেছ এখানে, নয় কি?

বিপুল কহিল—হ্যাঁ দিদি, এই কলেজে হালে ভর্ত্তি হয়েছি।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর মীনা মল্লিক নামে একটি কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ ইয়ারে ভর্ত্তি হ'লে দাদা?

থপ করিয়া এবার উত্তরটি দিতে বোধ হয় বিপুলের বাধিতেছিল। সভানেত্রী মীনার দিকে চাহিয়া সহাস্যে কথাটার উত্তর দিলেন—তোমার দাদাটি ফোর্থ ইয়ারে ভর্ত্তি হয়েছেন।

সভ্যাদের অনেকেই চমৎকৃত হইয়া ছেলেটির পানে চাহিল। এই বয়সে এতদূর এগিয়েছে ছেলেটি! আশ্চর্য্য ত!

শক্তি কহিল—তা হ'লে সম্বন্ধ ত পাল্টাতে হ'ল অনীতা-দি! আমি ভেবেছিলুম, ভাইটি আমার বড় জোর সেকেণ্ড ইয়ারে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে আছেন। এখন কি ক'রে আমি দিদি হতে পারি—যখন থার্ড ইয়ারেই পড়ে আছি। এ যে ভারি মুশকিল হয়ে পড়লো!

ফিক্ করিয়া হাসিয়া বিপুল কহিল—কেন দিদি, এতে মুশ্‌কিল, হবার কি আছে ? আপনারা এতগুলি মেয়ে ত এখানে পড়ছেন ; বাবা, মা, মাসী, পিসী, বোন অনেকেরই আছে। তাঁদের ভিতরে অনেকে হয়ত কলেজেই পড়েন নি, তাই বলে তাঁরা কি সম্মানের দিক দিয়ে উঁচুতে থাকেন না ? বাড়ীতে ছোট ভাই যদি বেশী বিদ্বান হয়, দিদি কি নীচু হয়ে থাকে ?

শক্তি হাসিয়া কহিল—তোমারই জিত হয়েছে ভাই, আমি হার মানছি। আর অনীতা-দি, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য যে, তুমি সংসদকে একটি সত্যিকার ভাই এনে দিলে।

সভানেত্রী কহিলেন—এবার কাজের কথা হোক। তোমার যা বলবার আছে সংক্ষেপে বলে ফেলো বিপুল।

সহর্ষে বিপুল কহিল—কুমারী-সংসদ আমাকে যখন ভাই বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন সংসদের সামনে কোন প্রস্তাব যদি আমি তুলি, সেটা কি গ্রাহ্য হবে না দিদি ?

সভ্যাদের ভিতর হইতেই সম্মিলিত কণ্ঠে সাড়া আসিল—নিশ্চয় হবে।

হাসিমুখে সভানেত্রী কহিলেন—শুনলে ত ? এখন তোমার প্রস্তাবটি সংসদকে শুনিয়ে দিতে পার।

বিপুল কহিল—আমার প্রস্তাবটি এই যে, ইদানীং পণপ্রথার সুযোগ নিয়ে বিবাহ-বাতিক-গ্রস্ত স্বার্থ-সর্ব্বস্ব বয়ঃবৃদ্ধেরা বয়স্থা কুমারীদের সম্বন্ধে যে অনাচার আরম্ভ করেছে, তার দিকে কুমারী-সংসদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এরা পণের দায় থেকে বিপন্ন অভিভাবককে মুক্তি দিয়ে অভাগিনী কন্যাদের পাণিগ্রহণ ক'রে কুমারী সমাজে হাহাকার তুলেছে। সংসদ যদি এই সর্ব্বনাশকর

অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, আমি তার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

প্রস্তাবটি উঠিবামাত্রই সংসদে তুমুল চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সমর্থন করিবার জন্য মেয়েদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। যাহারা সাধারণত মুখ গুঁজিয়া বসিয়া থাকে, উঠিয়া কিছু বলিতে সঙ্কুচিত হয়, এখন তাহাদের মনেও উৎসাহ জাগিয়াছে, সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রস্তাবটির সমর্থনে কিছু বলিবার জন্য তাহাদের কি আগ্রহ! সভানেত্রী প্রত্যেককেই সে সুযোগ দিলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অনেকেই অনেক কিছু বলিল। একটি মেয়ে তাহার সুন্দর মুখখানি রাঙ্গা করিয়া সরোষে এমন কথাও বলিল যে, পণপ্রথার জাঁতার চেয়ে বিয়ে-পাগলা এই বুড়োদের নোলাটা বেশী সাংঘাতিক। এমন ক'রে এই ধাড়ীগুলোকে শায়েস্তা করা উচিত যাতে শাস্তিটা আদর্শ হয়ে এদের সহধর্ম্মীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি যখন গৃহীত বলিয়া ঘোষিত হইল, তখন সভ্যাদের কলকণ্ঠের উল্লাসে সংসদ-কক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই কলরবের মধ্যে সন্তর্পণে পর্দ্দা ঠেলিয়া দরোয়ান বাহাদুর সিং কক্ষে ঢুকিল এবং তিনখানি লেফাফা-বদ্ধ ডাকঘরের ছাপ দেওয়া চিঠি সভানেত্রীর টেবিলের উপর রাখিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

সভানেত্রী চিঠিগুলি তুলিয়া সভ্যাদিগকে দেখাইয়া কহিলেন—বিজ্ঞাপনের ফল। দি ফ্রুটস্ ফার্স্ট গেদার্ড ইন্ এ সিজন্ অফ আওয়ার য়্যাডভারটাইজমেণ্ট্স্!

শক্তি কহিল—জনমতের অগ্রদূত বলেই এঁদের সম্বর্দ্ধনা করা চলে।

মায়া মুখার্জ্জী কহিল—বাণী শুনতে আমরা উৎকর্ণ। অনীতা-দি, আপনিই পড়ুন।

সভানেত্রী একে একে তিনখানি চিঠি খুলিয়া তাহাদের ভিতরের বিষয়বস্তুগুলি মনে মনে পড়িয়া লইলেন। সভ্যারা লক্ষ্য করিল, চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতেই তাঁহার মুখখানা অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

পড়ার পর একটু থামিয়া সভানেত্রী কহিলেন—তিনখানা চিঠির ব্যাপারই খুব গুরুতর। কাজেই এদের নাম ঠিকানা যতটা সম্ভব চেপে রেখে চিঠির বিষয়-বস্তুটি আমি পড়ছি।

বলিয়াই অভিনেত্রী প্রথম চিঠিখানি পড়িবার জন্য তুলিলেন এবং ইহার মুখবন্ধে কহিলেন—বারো বছর বয়সের একটি মেয়ে এই চিঠিখানি পাঠিয়েছে। সে লিখেছে—

> আমার দাদুর নাম আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তিনি ছিলেন দায়রার হাকিম। অনেককে জেলে দিয়েছেন, কত লোককে ফাঁসিও দিয়েছেন। আপনারা শুনে হয় ত অবাক্ হবেন, পেনসান নিয়েও দাদুর ফাঁসি দেবার হাত-সুড়সুড়ুনি এখনো থামেনি। তিনি সম্প্রতি ষোলবছরের একটি কুমারীর গলায় ফাঁসি লাগাবার মতলব করেছেন. অর্থাৎ দাদু তাঁর একষট্টি বছর বয়সে এই মেয়েটিকে নিয়ে শীঘ্রই ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে আবার কেঁচে গণ্ডূষ করবেন। এদিকে সংসারে তাঁর বাড়বাড়ন্ত খুবই; উপযুক্ত সাতটি ছেলে এগারোটি মেয়ে, নাতিনাতনীদের সংখ্যা একুশ, তাদেরও কেউ কেউ ছেলের মা হয়েছে। দুপক্ষের ঠিকানা দিলাম, বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা, আপনারা এই বেচারী কুমারীটিকে বাঁচাতে পারেন না কি।

চিঠিখানা পড়া হইবামাত্র মায়া কহিল—সর্ব্বনাশ! জজ বুড়োর প্রাণেও এত সখ!

সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের ধ্বনি উঠিল—হুইপ! হুইপ!

সভানেত্রী সকলকে শান্ত হইতে বলিয়া দ্বিতীয় পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ইহার প্রেরক লিখিযাছেন—

আমি শহরতলীর এক ধনী জমিদারের ছেলে। কিন্তু আমার উপজীবিকা চাকুরী। আমরা পাঁচ ভাই, বোন নাই। আমার বাবা তাঁর চারটি ছেলে, তিনটি ভাইপো এবং পাঁচটি ভাগনের বিয়ের ব্যাপারে বারোটি মধ্যবিত্ত সংসার ভেঙ্গে দিয়েছেন। অর্থাৎ ধনী জমিদারের ঘরে কন্যাদানের মোহে ঐ বারোটি সংসারের কন্যাকর্ত্তারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। বাবার এই অনাচারের প্রায়শ্চিত্ত করবার উদ্দেশ্যে আমি চিরকুমার-ব্রত নিয়েছি। বাবা আমাকে অবশ্য ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, কিন্তু আমি সরকারী চাকরি আশ্রয় ক'রে পণপ্রথার উচ্ছেদকল্পে আত্মোৎসর্গ করেছি। অর্থে, সামর্থ্যে, পরামর্শে সর্ব্বতোভাবে আমি কুমারী-সংসদের সহায়তায প্রস্তুত।

এই পত্রখানি সভায় সংশয় তুলিল। কেহ কহিল—মন্দ কি! কেহ কেহ সন্দেহের সুরে কহিল—বিশ্বাস কি?

শক্তি কহিল—অবিশ্বাস করবারই বা কি আছে? সংসদের ক্ষেত্র যদি প্রসার করতে হয়, কর্ম্মীরও তাতে দরকার। আজ যেমন আমরা নতুন ভাই পেয়েছি, এমনও হতে পারে—এই পত্রের লেখক যিনি চিরকুমার-ব্রত নিয়েছেন—আমাদের এই বিপুল ভাইটির পাশে এসেই দাঁড়াবেন।

সম্পাদিকার কথাটি সভ্যাদের অন্তর স্পর্শ করিল। যাহারা এই মাত্র সন্দেহের সুরে আপত্তি তুলিয়াছিল, তাহারাও কথাটির সমর্থন করিল।

সভানেত্রী কহিলেন—আমরা ত আর এখনি তাঁকে নিচ্ছি নে, আর নিলেও তাঁর সম্বন্ধে 'অল্ এবাউট্স্' জেনে তবে ত কথা। এই যে বিপুল বিশ্বাসকে আমরা বিশ্বাস ক'রে সংসদে নিয়েছি, কিন্তু এঁর নিজের মুখের

কথা ছাড়া আমরা বিশেষ কিছু জানি নে। তবে কথাগুলো এঁর এমন জোরালো যে, নিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তাই ব'লে আমরা এঁর হাড়হদ্দ জানবার জন্যে অবহেলা করব না নিশ্চয়ই, সেটা আমাদের কর্ত্তব্য।

উৎসাহের সুরে বিপুল কহিল—নিশ্চয়ই। শুধু এই সংসদের কেন, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই এটা উচিত।

মায়া কহিল—ঐ ভারি চিঠিখানার গতিমুক্তি এবার হোক অনীতা-দি!

চাঁপা কহিল—ও কি চিঠি না দলিল?

সভানেত্রী কহিলেন—চিঠিও নয়, দলিলও নয়, রীতিমত একটা গল্প।

তিলোত্তমা কহিল—মন্দ কি, গল্পটাই পড় অনীতা-দি শুনি, নিশ্চয়ই 'রোমান্স' কিছু আছে!

সভানেত্রী কহিলেন—যেটুকু লিখেছে তাতে পণপ্রথার জাঁতা ঘুরানোর আওয়াজ শুধু পেয়েছি। রোমান্সটা সাজিয়ে নিতে হবে। ভাবছি—আজ পড়ব, না মুলতবী রাখবো? কেন না, একটু লম্বা। তা ছাড়া এমন ক'রে লেখা যে, নামগুলো বাদ দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে না।

শক্তি কহিল—থাকলেই বা নাম, কি হয়েছে। পড়েই ফেল অনীতা-দি, দেখছ না—শোনবার জন্যে সকলেই উস্‌খুস্‌ করছে।

সভানেত্রী অতঃপর শেষের চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেন:

পাশকরা ছেলের বিয়ের কথায় বাঙ্গলায় অনেক রকমেরই কথা চালাচালি হইয়াছে এবং সেই সূত্রে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উঠিয়া অনেক পাকাপাকি সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু নদার ধনী অধিবাসী হরিদাস গাঙ্গুলী টালার বনেদী বাসিন্দা চাটুয্যে বাড়ীতে তাঁহার ডবল-অনারে বি, এ, পাশ ছেলের জন্য পাত্রী দেখিতে আসিয়া যে কাণ্ড বাধাইয়া গেলেন, তেমনটি বুঝি আর কখনও দেখা যায় নাই।

শহরের এক ঘটকের মধ্যস্থতায় এই সম্বন্ধের সূচনা হয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশ-গৌরব, নাম-ডাক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় পাত্রী দেখিতে সম্মত হন এবং তাঁহার ভবনে পদার্পণপূর্ব্বক কৃতার্থ করিবার দিনটিও বাতলাইয়া দেন।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে গৃহস্বামী শশধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে কৃতার্থ করিতে আসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় যখন শুনিলেন পাত্রী তাঁহার কন্যা নহে—ভাগিনেয়ী, তখনই তিনি বাহ্য ভদ্রতার আবরণটি জোর করিয়া খুলিয়া ফেলিয়া একটা অস্বাভাবিক কদর্য্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করিলেন। ঘটক বেচারী অদূরে বসিয়াছিল, তাহার দিকে দুই চক্ষু পাকাইয়া চাহিয়া রুক্ষস্বরে চীৎকার তুলিলেন—জোচ্চুরি করবার জায়গা বুঝি আর খুঁজে পাও নি, খামকা এই হায়রানি ; এর খেসারত দেবে কে শুনি ? পাজী, নচ্ছার, ইতর কোথাকার !

ঘরশুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ, কাহারও মুখে কথা নাই। প্রত্যেকেরই মনে সংশয় বিস্ময় তুলিল, কথার একটু হেরফেরে ভদ্রলোকের মুখে এ কি কথা ! ঘটক না হয় কথায় একটু গলদ করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই ত্রুটির জন্য সর্ব্বসমক্ষে এ ভাবে তাহাকে লাঞ্ছনা ! গৃহস্বামীর সুন্দর মুখখানি কালো হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই দেখা গেল, ভাবী বৈবাহিক রোষভরে ফরাসের উপর হইতে রূপা-বাঁধানো বেতের মোটা লাঠিটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছেন। এ দৃশ্যে ঘরের সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া বাধা দিবার ভঙ্গিতে কহিলেন—সে কি গাঙ্গুলী মশাই, উঠছেন যে আপনি ! না না, তা কি হয়, বসুন, বসুন, কথার একটু হেরফেরে—

হাতের লাঠিটি ফরাসের উপর সজোরে ঠুকিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় উত্তর দিলেন—একটু নয়, বিলক্ষণ মশাই! কোথায় মেয়ে, আর কোথায় ভাগিনী!

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—বুড়ো মানুষ না-হয় একটু ভুলই করেছে, কিন্তু ওতে কি-এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে বলুন ত!

অসহিষ্ণুভাবে গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন—যেখানে গোড়াতেই গলদ, তার আখের কখনো ভাল হতে পারে না।

কি ভেবে কথাটা আপনি বলছেন?

আপনার কথা ভেবেই বলেছি! এখন আপনিই বলুন ত যে পাত্রীকে আমি দেখতে এসেছি, আপনার মেয়ে হ'লে যে ব্যয়-ভূষণ করতেন, এ ক্ষেত্রেও তাই করবেন?

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে এই অদ্ভুত মানুষটির দিকে চহিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্ন তুলিলেন—ব্যয়-ভূষণ-সম্বন্ধে কোনও কথাই ত এখনও হয় নি গাঙ্গুলী মশাই! আমার মেয়ের বিয়েতে কি রকম ব্যয় করেছি, আর এই ভাগিনীর বিয়েতেই বা কতটা ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি, এ সমস্ত না জেনেই হঠাৎ এ প্রশ্ন করার অর্থ?

মুখখানা বিকৃত করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন—জানা আছে বলেই কথাটা বলা হয়েছে মশাই! এমন পঞ্চাশটা নজীর আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি, যেখানেই মামা দিয়েছে বিয়ে, বরের বাবাকে শেষ পর্য্যন্ত পস্তাতেই হয়েছে।

কিন্তু আমিও, পঞ্চাশটা না হোক, এমন দু'-চারটে নজীর দেখাতে পারি, যেখানে নিজের মেয়ে আর বোনের মেয়ের বিয়েতে কোনও তারতম্যই হয় নি!

হতে পারে, কিন্তু আমি ত এ পর্য্যন্ত এমন কোন মামাকে দেখিনি, যিনি ভাগনীর বিয়ে দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কুটুম্বিতা বজায়

রাখতে পেরেছেন ! বিয়ের দেনা-পাওনাটা যদিই বা যা-তা ক'রে সারলেন, কিন্তু তত্ত্বতালাসের বেলায় একেবারে ঢুঢু, যাকে বলে—বিল্বিপত্তর শুঁকিয়ে সম্বন্ধ শেষ করা ; যেন কালীপুজোর কাণ্ড, এক রাত্তিরেই সব পাট শেষ !

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এমন কথা শুনিয়াও অসীম ধৈর্য্যের সহিত আপোষের প্রস্তাব তুলিলেন—বেশ ত, ধীরে সুস্থে আপনি আমার সম্বন্ধে সমস্ত সন্ধান নিয়েই না হয় কাজে নামবেন ; আজই ত আর সব পাকা হয়ে যাচ্ছে না ! যখন দয়া ক'রে গরীবের কুটীরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, সমস্ত জানুন শুনুন, মেয়ে দেখুন, মিষ্টমুখ করুন—

কর্কশ কণ্ঠে গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন—দেখুন, আমি এক কথার মানুষ ; আমার বিশ্বাস কি জানেন, যে পাত্রীর বাপ নেই, সেখানে ভবিষ্যতের কোনও আশাই নেই, সেখানে যদি কাজ করতে হয়, আটঘাট বেঁধেই নামতে হবে। মেয়ে দেখবার আগে আমি জানতে চাই, কি খরচ আপনি করবেন ভাগনীর বিয়েতে ?

সবিনয়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন—দেখুন গাঙ্গুলী মশাই যেটা দস্তুর, আর বরাবর চ'লে আসছে সেইমত ব্যবস্থাই কি ঠিক নয় ? মেয়েটিকে আগে দেখে—

কথাটায় বাধা দিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন—ধ'রে নিন, মেয়ে আমি দেখেছি ; তিনি অপ্সরীর মত সুন্দরী, সাবিত্রীর মত গুণবতী কিন্তু দেনা-পাওনায় মিল হ'ল না ; তা হ'লে ঐখানেই পাট চুকে গেল ! বরং রূপে গুণে কিঞ্চিৎ খুঁৎ থাকলেও টাকার ব্যাপারে যদি গোল না হয়, কিছুই আটকায় না, বুঝেছেন ?

মুখখানি ম্লান করিয়া মৃদুস্বরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন—এর উপর আর কি বলি বলুন ? বেশ, ফর্দ্দই আগে করুন। তা হ'লে এবার বসতে আজ্ঞা হোক।

হাত দুইখানি প্রসারিত করিয়া ধৈর্য্যশীল গৃহস্বামী দণ্ডায়মান ভাবী বৈবাহিককে বসিবার অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু এই দাম্ভিক মানুষটি সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পুনরায় এক সর্ত্ত তুলিলেন—হাঁ দেখুন, গোলের কথা খোলসা করেই কাজে বসা উচিত, আমি যা ফর্দ্দ দেব, তার একটি পাই-পয়সা ভাঙ্গা চলবে না, আর—বিয়ের ফর্দ্দের দেনা-পাওনা ছাড়া পাঁচটি হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ছেলের নামে ডিপজিট রাখতে হবে আপনাকে।

কেন ?

বুঝলেন না ?—বিয়ের পর তত্ত্বতালাস নিয়ে ঝঞ্ঝাট কাটাবার জন্যে।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ এই বিচিত্র ব্যাপারীর মুখের দিকে চাহিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইবার দৃঢ়স্বরে কহিলেন—দেখুন, এই বয়সে অনেকগুলো মেয়ে পার করেছি, কাজেই বরের বাজারে সওদা-সূত্রে রকম রকম ব্যাপারীর সঙ্গে চেনাশুনা হয়েছে। কোথাও জিতেছি, কোথাও বা ঠকেছি, অনেক রকম আঘাতও অনেক স্থানে পেয়েছি; কিন্তু আজ জোর গলায় বলছি—আপনার মত জবরদস্ত বর-ব্যাপারী আমি আর একটি দেখি নি, এবং আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে যে আঘাত আপনি আজ দিয়ে গেলেন, এমন আঘাতও আর কেউ আমাকে দিতে সাহস পায় নি।

মুখখানি গম্ভীর করিয়া ভগ্নস্বরে গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন, স্পষ্ট কথা বললেই মনে কষ্ট ত পাবেনই, তবে, এটা মনে রাখবেন, ছেলের বাপ বরাবর ছেলের বাপই থাকবেন।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তরুণ পুত্র জলধর সমবেত আর দশজনের সহিত এই অপ্রীতিকর কথোপকথন অসহিষ্ণুভাবেই শুনিতেছিল।

এতক্ষণ পরে সুযোগ পাইয়া সে সবেগে গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রায় সম্মুখে গিয়া যুক্তকরে কহিল—আমার একটা কথা আছে স্যর!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় জলধরের সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিলেন।

জলধর কহিল—আপনার কাছে আমার একটুকু অনুরোধ, যে কথাগুলো আপনি বলে গেলেন, বাড়ী গিয়ে সেগুলো আপনার ছেলেকে শুনিয়ে দেবেন।

মুখখানা অতিশয় গম্ভীর করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—একথা বলবার মানে?

জলধর বেশ গম্ভীর হইয়া উত্তরকরিল—আপনার এই দম্ভের প্রায়শ্চিত্ত একদিন তাকেই করতে হবে কি-না, সেই জন্যই আপনার ব্যবহারটা তাকে জানিয়ে রাখা দরকার।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বিকৃত স্বরে গাঙ্গুলী মহাশয় কহিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, আমার ছেলের ফয়সালা তোমাকে করতে হবে না আমার সামনে—ফাজিল ছোকরা কোথাকার!

রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে তিনি সোজা বাহির হইয়া গেলেন। ঘরের মানুষগুলির মনে হইল, খোঁচা খাইয়া একটা বিষধর সাপ যেন বাধা পাইয়া রুদ্ধ রোষে বিবরের সন্ধানে ছুটিয়াছে। সকলের মুখগুলি তখন বিস্ময়-বেদনায় বিবর্ণ, বাক্‌শক্তি রুদ্ধ। শুধু তরুণ যুবা জলধর মুখখানি কঠিন করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—ভীষণ রকমের একটা পণ-পাহাড়! একে ভাঙ্গবার দাওয়াও তৈরি হয়েছে।

•

ব্যাপারটি পুরানো নয়, টাটকা। মাতুলালয়ে প্রতিপালিতা কুমারীটি ইহার উপলক্ষ, অশ্রুমিশ্রিত কালিতে এই কাহিনীটি লিখিয়া সে কুমারী-সংসদে পাঠাইতেছে এই আশায় যে, তার দাদা জলধরের মুখরক্ষা হয়।

আবৃত্তির সুরে এমন ভঙ্গিতে সভানেত্রী চিঠিখানি পড়িলেন, সকলেরই মনে হইল যেন তাঁহারা একটি বাস্তব কাহিনী গল্পের আকারে শুনিল।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শক্তি কহিল—পণ-পাহাড়দের এই উদ্ধত অত্যাচার আর কত দিন আমরা এভাবে সহ্য করবো!

চাঁপা কহিল—এই কাহিনীটার ভিতরেও আমাদের রচিত 'পণ-পাহাড়' শব্দটা কোট করেছে। সংসদের ব্যাপারে ঐ জলধর ছেলেটি নিশ্চয়ই ইণ্টারেস্টেড!

সভানেত্রী কহিলেন—তা না হ'লে কুমারী-সংসদকে কাহিনীটা উপহার দেবে কেন! এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এ কেস্‌টাও টেক্‌-আপ করা আমাদের উচিত কি না?

সকল সভ্যই সমবেতকণ্ঠে দৃঢ়স্বরে জানাইল—নিশ্চয়ই।

মায়া মুখার্জ্জী কহিলেন—সংসদ ইচ্ছা করলে শেষের কেসটার এন্‌কোয়ারীর ভার আমার উপরে দিতে পারেন।

সভানেত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—তার মানে?

মায়া উত্তর করিল—টালার যে শশধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম এই কাহিনীতে রয়েছে, তিনি হচ্ছেন আমার মামা। আর যে-মেয়েটিকে উপলক্ষ ক'রে ঐ হাঙ্গামা, সে আমার মাসতুতো বোন, আমারই বয়সী, নাম নিভা; খাসা মেয়ে। তাই কেসটা হাতে নিতে চাইছি।

মায়ার মন্তব্যে সভ্যাদের মুখে প্রীতির আভা ফুটিল। সভানেত্রীও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—তা হ'লে আমাদের এই চিঠি-সংক্রান্ত তিনটি কেসের তদন্তের জন্য আমরা উপস্থিত সংসদের ছয়জনকে মনোনীত করছি—শক্তি বোস, মায়া মুখার্জ্জী, সত্যভামা সান্যাল, গোদাবরী গুপ্তা, চাঁপা চ্যাটার্জ্জী, তিলোত্তমা তালুকদার। এই সঙ্গে বিপুল বিশ্বাসকে কো-আপ্ট ক'রে নেওয়া হ'ল, ইনি এদের তদন্তব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবেন।

আর তদন্ত-সূত্রে যদি কোন জরুরী বৈঠক বসাবার প্রয়োজন হয়, আমার বাড়ীতেই তার ব্যবস্থা হবে।

প্রেসিডেণ্টের এই নির্দ্দেশ সংসদের মেয়েরা এবং নবজাত কো-আপ্ট্ সভ্য বিপুল বিশ্বাস শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার করিয়া লইল। অবশেষে সেক্রেটারী শক্তি বোস আদর্শ তরুণ বিপুল বিশ্বাসের উচ্চ মনোবৃত্তির প্রশংসা এবং সংসদের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট অনীতা সেনগুপ্তার প্রচুর সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সংসদের কাজ এ দিনের মত শেষ হইল।

চার

ছাত্রসঙ্ঘের ছেলে এবং কুমারী-সংসদের মেয়েদের অন্তরে বিপুল নামে যে ছেলেটি বিস্ময়ের এরূপ শিহরণ তুলিল, তাহার পশ্চাতে যে কৌতুকাবহ কাহিনীটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ছেলের দল সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নাই, কিন্তু কুমারী-সংসদের প্রেসিডেণ্ট অনীতা সেনগুপ্তা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই।

বিপুলও বুঝিতে পারে, তাহার অতীত সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানিতে সংসদের পরিচালিকা-রূপে অনীতাদি বিশেষ আগ্রহশীল। তাই সে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট এক লিখিত প্রতিশ্রুতি দাখিল করে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ:

> প্রগতিপন্থীরা প্রত্যেকেই বর্ত্তমানের পূজারী। তাই পিছনের পটভূমিকার উপর আবরণ টেনে বর্ত্তমানকেই সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছি। সংসদে সেদিন সবার সমক্ষে নিজের প্রকৃতির যে পরিচয় দিয়েছি তার ব্যতিক্রম কোন দিন হবে না। পৃথিবীর নারী-জাতি আমার কাছে চিরদিন বয়সের তারতম্য অনুসারে—শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্রী হয়েই আছেন ও থাকবেন জননী এবং ভগিনীর মঙ্গলময়ী মূর্ত্তিতে। নারীর অন্য রূপের কল্পনা আমার অন্তর যাতে স্বীকার না করে, সেজন্য আমাকে কঠোর সাধনার ব্রত নিতে হয়। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছি বলেই আমার বিশ্বাস, এই সাফল্যই আমাকে কুমারী-সংসদের সংস্রবে নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দেবার প্রেরণা দিয়েছে। আপনারাও এ অপরিচিতের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তার কোন অমর্য্যাদা হবে না—এটা স্থির জানবেন।

বিপুলের এই প্রতিশ্রুতি অনীতা দেবীর অন্তর স্পর্শ করিলেও তিনি একেবারে এই অপরিচিত ছেলেটির সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সম্বন্ধে অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করিলেও তাহার অতীত জীবনের পটভূমিকাটি সে যবনিকার অন্তরালে রাখিতে এতটা আগ্রহশীল কেন? পিছনের পদচিহ্ন সকল সময় কি নিশ্চিহ্ন হইয়া থাকে? কোন কোন ক্ষেত্রে ত সেইগুলিই নিদারুণ হইয়া কত জটিল অবস্থা পাকাইয়া তোলে! বুদ্ধিমতী অনীতা দেবী ছেলেটিকে এ সম্বন্ধে আর পীড়াপীড়ি করেন নাই। ছেলেটির বর্ত্তমান জীবন-মৃত্যুর চোখে-দেখা খেইটি ধরিয়া তাহার অতীত জীবন-রহস্যের জটপাকানো সুতাগুলি নিজের হাতেই খুলিবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হয়। এ-ব্যাপারেও অনীতা দেবীর কূটবুদ্ধি এমন সন্তর্পণে সন্দেহভাজনদের অনুসরণে অভ্যস্ত যে, তাঁহার সেক্রেটারী শক্তি ভিন্ন সংসদের অন্য কোন মেয়েই এই গোপন তথ্যটি সম্বন্ধে কিছুই অবগত নয়। অনীতা দেবীর ধারণা, কোন দলের নেত্রীর দায়িত্ব লইতে হইলে দলভুক্ত প্রত্যেকের পরিচয় নখ-দর্পণে দেখিবার মত দৃষ্টিশক্তি তাহার থাকা চাই; এমন কি, যাহার বিরুদ্ধে দল যুদ্ধে অবতীর্ণ, তাহারও হাড়-হদ্দ সমস্তই জানিতে হইবে। সুতরাং বিপুল ছেলেটির সম্বন্ধে সবিশেষ আগ্রহ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

বিপুল কিন্তু নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইয়াছে। নিরুদ্বেগেই অনীতা দেবীর বাড়ীতে সংসদের অধিবেশনে যোগ দেয়; অধিবেশন না হইলেও তাহাকে অনীতা দেবীর পাঠাগারে হাজিরা দিতে দেখা যায়। সহপাঠিনী হইলেও বিপুল এই মেয়েটিকে সভানেত্রীর শ্রদ্ধা এবং শিক্ষয়িত্রীর অনুরূপ ভক্তি প্রদর্শন করে। অনীতা দেবীও তাঁহার অটল গাম্ভীর্য্য দৃঢ়তার সহিতই এই ছেলেটির সমক্ষে বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

পটলডাঙ্গার প্রান্তভাগে পাশাপাশি দুইটি গলি ব্যাপিয়া সুবৃহৎ

অট্টালিকাখানি অনীতা দেবীর পিতার সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। র বাহাদুর শশধর সেনগুপ্ত মহাশয় এ অঞ্চলের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাঙ্ক, কলিয়ারী, মাইকা-মাইন, আয়রন ওয়ার্কস, শেয়ার বিজনেস, প্রেস প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংস্পৃষ্ট ও সর্ব্বেসর্ব্বা। পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের প্রাচুর্য্যে তাঁহার বৃহৎ বসতবাটি সর্ব্বদাই যেন গিস্ গিস্ করে। পাঁচ পুত্র—প্রত্যেকেই কৃতী। ছয় কন্যার মধ্যে পাঁচটির সুপাত্রে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কনিষ্ঠা কন্যা অনীতাই শুধু পড়াশুনা করিতেছে এবং এ-পর্য্যন্ত অবিবাহিতা। এই কন্যাটিই পিতার সর্ব্বাধিক স্নেহের পাত্রী।

আই-এ পাস করিবার পরই অনীতার বিবাহের কথা ওঠে। এগারটি পুত্র-কন্যার মধ্যে অনীতাই শুধু অবিবাহিতা, তাহাকে কোন সুপাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেই পিতার কর্ত্তব্য শেষ হয়। অনীতা কিন্তু সে সময় পিতাকে জানায়—পাঁচ ছেলে আর পাঁচ মেয়ের বিয়ে ত ঘটা করেই দিয়েছ বাবা, এদের ছেলে-পুলে হোক, নাতী-নাতিনী নিয়ে আমোদ-আহ্লাদে কর, মনের যা-কিছু সাধ-আহ্লাদ আছে, সব মিটিয়ে ফেলো। কিন্তু দোহাই, আমাকে আর ও ঝঞ্ঝাটে ফেল না বাবা! একটা মেয়েকে রেহাই দাও, তার কর্ত্তব্য হোক জ্ঞানের চর্চ্চা আর তোমার সেবা। বিয়ে আমি করব না বাবা, কিছুতেই না।

সেনগুপ্ত মহাশয় এই মেয়েটিকে ভাল করিয়াই জানিতেন; যাহা জেদ করিয়া ধরে, কিছুতেই ছাড়াইবার উপায় থাকে না। প্রতিবাদ বৃথা ভাবিয়া তিনি কন্যার প্রস্তাবেই সম্মতি দিয়াছেন। ফলে, অনীতা দেবীর জ্ঞানচর্চ্চার জন্য বহির্ব্বাটীর একটা নিভৃত অংশ তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাহার ব্যবস্থা সমস্তই স্বতন্ত্র। প্রধান ফটকের পাশেই আলাদা দরজা, ভিতরে ছোট একটু প্রাঙ্গণ, সুবৃহৎ হলটি এমনভাবে

সজ্জিত যাহাতে অনায়াসে একটা গোল টেবিলের বৈঠক বসিতে পারে। মধ্যে গোলাকার এক অতিকায় টেবিল, তাহার চারিধারে বহুসংখ্যক সুশ্রী চেয়ার। আলমারিগুলি বিবিধ পুস্তকে পূর্ণ। আরও দুইখানি ঘর সুন্দরভাবে সজ্জিত। বৃহৎ অট্টালিকার এই অংশটির তত্ত্বাবধানের জন্য দুইজন গুর্খা দারোয়ান, দুইটি বালক-ভৃত্য এবং দুইটি পরিচারিকা সদাসর্ব্বদা মোতায়েন থাকে। অনীতা তাহার অধীনস্থ এই দলটিকে বিশেষ যত্নে তালিম দিয়া তাহার ইচ্ছামত তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। অনীতার প্রতি এই ছয়টি অনুচরের অসীম শ্রদ্ধা। এখানেই অনীতার পড়াশুনা চলে এবং মধ্যে মধ্যে সংসদের বৈঠক বসে। উপরের তালায় পাশাপাশি দুইখানি সুসজ্জিত ঘর পিতা-পুত্রীর জন্যই সুরক্ষিত। উপরের অংশের সহিত ভিতর-বাড়ীর সংযোগ থাকিলেও সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিলে নীচের তালাটি একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। বিপত্নীক সেনগুপ্ত মহাশয় বৃহৎ অট্টালিকার এই নিভৃত অংশেই রাত্রিবাস করেন। ঘড়ির কাঁটার মত তাঁহার দৈনিক কার্য্যধারা গতিশীল, এতটুকু এদিক ওদিক হইবার জো নাই। ঠিক সাড়েদশটা বাজিতেই তিনি মোটরে উঠিয়া বসেন এবং রাত্রি আটটায় সময় মোটর হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করেন। মূল বাটীর বৈঠকখানায় তাঁহার বেশভূষা ছাড়িবার ও পরিবার ব্যবস্থা থাকে। আফিসের কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া ঠিক একটি ঘণ্টা তিনি ভিতর-বাড়ীতে অতিবাহিত করেন। নয়টা বাজিলেই সুসজ্জিত ভোজনালয়ে বাড়ীর পরিজনবর্গকে সমবেত হইতে হয়। পুত্র, কন্যা, বধূ, পৌত্র, দৌহিত্রাদি পরিবৃত হইয়া সাড়ম্বরে সেনগুপ্ত মহাশয়ের নৈশ-ভোজন-পর্ব্ব চলিতে থাকে। নানারূপ গল্পগুজবে ভোজনকক্ষটি এই সময় মুখরিত হইয়া ওঠে। ভোজনান্তে পিতা-পুত্রী এ-বাড়ীতে চলিয়া আসেন। সকাল সাড়ে নয়টার সময় পুনরায় সকলকে

ভোজনকক্ষে সমবেত হইতে হয়। পিতা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন, অনীতার সতর্ক ও সযত্ন তত্ত্বাবধান তাঁহার কোন প্রকার অসুবিধা উদ্রেকের সুযোগ দেয় না। সংসদের সহিত কন্যার ঘনিষ্ঠতার কথাও পিতার অবিদিত নাই। সংসদের সম্পর্কে তিনি হাসিয়া বলেন—উদ্দেশ্য ত খুব ভালই, কিন্তু পারবে কি মা? লোভ যে ওখানে লজ্জার মুখোস খুলে জেঁকে বসেছে জোঁকের মত। লোভকে ঠেকানো ত সোজা নয়।

অনীতা উত্তর দেন—সোজা নয় বলেই ত আমরা শক্ত হয়েছি বাবা! ঐ লোভটার নীচে মানুষের যে দরদী মনটা চাপা পড়ে আছে, তাকে চাঙ্গা করে তোলাই হচ্ছে আমাদের কাজ। মন যদি র'সে ওঠে, লোভ তখন পালাবার পথ পাবে না। তোমার কিন্তু সহানুভূতি চাই।

সেনগুপ্ত মহাশয় বলেন—আমি ত বরাবরই বিয়ের ব্যাপারে সহানুভূতি দেখিয়ে এসেছি। তোমার দাদাদের বিয়েতে কোথাও ফর্দ্দ দিই নি, পণও নিই নি। কিন্তু তোমার পাঁচ দিদির বিয়েতে মোটমাট পঞ্চাশ হাজার বার ক'রে দিতে হয়েছে, সে ত জানো।

অনীতা মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলেন—এটা কিন্তু ভারি অন্যায় হয়েছে বাবা! ঘুষ নেওয়া যেমন দোষ, দেওয়াও ঠিক তাই। আমাদের সংসদের মতে পণটাও ঠিক এই ঘুষের মতই।

হাসিমুখে সেনগুপ্ত মহাশয় বলেন—বেশ, তোমার বিয়েতে এর প্রায়শ্চিত্ত না হয় করা যাবে। যত বড় ভাল ছেলে পাই না কেন, জোর গলায় জানিয়ে দেব—মেয়ে চাও দিচ্ছি, কিন্তু তার সঙ্গে ঘুষ বলে একটি পয়সাও দিচ্ছিনে বাপু!

মুখখানা শক্ত করিয়া অনীতা বলে—প্রায়শ্চিত্ত ত এ রকম ক'রে হবে না, বাংলার মেয়েগুলোর গতিমুক্তির ব্যবস্থাই হচ্ছে সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত।

যে ব্রত আমি নিয়েছি, তার উপযাপন করতে অনেক কাঠখড় লাগবে; সে সব যোগান দেবে তুমি।

সেনগুপ্ত মহাশয় হাসিয়া জানান—তোমার হাতে ব্ল্যাঙ্ক চেক সই ক'রে ছেড়ে দিতেও আমার আপত্তি নেই মা!

সংসদ সম্বন্ধে পিতা-পুত্রীর মধ্যে যে সংলাপ একদিন হইয়াছিল, তাহা কালস্রোতে ভাসিয়া যায় নাই, পাকা হইয়া সংসদের ভিত্তিটা দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে। বাড়ী, গাড়ী, দরোয়ান, লোকজন, টাকা—যখন যাহা প্রয়োজন হয়, অনীতাই সানন্দে সরবরাহ করেন, সংসদের কুমারীদিগকে এ-সম্বন্ধে কোনরূপ চাপ দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন না। অনীতা দেবীর ধারণা, তিনি যখন দলনেত্রী এবং একটা দল চালাইবার মত অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্য তাঁহার যতক্ষণ আছে, দলের গায়ে কোনরূপ দুশ্চিন্তার আঁচ লাগিতে দিবেন না।

বিপুলের সম্বন্ধেও তিনি সংসদকে সন্দিগ্ধ বা সচকিত না করিয়া নিজেই তাহার অতীত জীবনের পটভূমিকাটির সহিত পরিচিত হইবার আয়োজন এমন সন্তর্পণে শুরু করিয়া দেন যে, বিপুলের মত হিসাবী ছেলেও সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই।

সেনগুপ্ত মহাশয়ের বৃহৎপরিবারভুক্ত ভৃত্যদের সংখ্যা অঙ্গুলির পর্ব্বগুলি অতিক্রম করিয়া যায়। পাঞ্জাবী, নেপালী, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বয়সের কর্ম্মঠ বহু লোক এই বিশিষ্ট পরিবারটির পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ইহাদের ভিতর হইতেই বাছিয়া বাছিয়া অনীতা যে কয়জনকে তাহার কাজের জন্য লইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই কর্ত্রীর ভ্রূভঙ্গীর অর্থটুকুও উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য রাখে। কাহাকেও কোন কথা ভণিতা করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। এ সম্বন্ধে সমবয়স্ক উড়িয়া বালক দুইটির তৎপরতা ও শিক্ষাপটুতা অতুলনীয়।

এই প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী সুচতুর বালকদুটি যেন মানিকজোড়ের মত অনীতার মহলটি আলো করিয়া রাখে। সংসদ-সম্পর্কে বা অন্য কোন প্রসঙ্গে যাহারাই অনীতার সহিত আলাপ করিতে আসে, ছেলে দুটি অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার চেহারাখানি এমন তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখে এবং কথাগুলি শুনিতে থাকে যে, সে লোকটির পক্ষে ইহাদের চক্ষুতে ধূলি দিবার কোন সম্ভাবনাই ভবিষ্যতে ঘটিয়া উঠে না। পক্ষান্তরে, এই মানিকজোড়টি পরদানসীন মেয়েদের মতই অন্তরালে সন্তর্পণে দেহরক্ষা করে, কর্ত্রীর বিনানুমতিতে কোন নবাগতের সমক্ষেই ইহাদের আত্মপ্রকাশের উপায় নাই।

এই মানিকজোড়টির কোন সন্ধানই এ পর্য্যন্ত বিপুল পায় নাই,—বিপুল ও নবাগত কুমারী-সংসদের সভ্যগণের চর্ম্ম-চক্ষুতে এই দুটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে দেখিবার সুযোগ এখনও আসে নাই। কিন্তু উহারাই যে অনীতার নির্দ্দেশে কয়দিন ধরিয়া পিছু পিছু ফিরিতেছে, সুচতুর ও অতিমাত্রায় সতর্ক বিপুলের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে তাহার কোন ছায়া পড়িয়াছে কি?

চাঁপাতলা অঞ্চলে রামহরি ঘোষের গলিটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত ও জনবিরল। বর্দ্ধমান শহরের কোন প্রসিদ্ধ জমিদারের মাঝারি রকমের একখানি বাড়ী বৎসরের অধিকাংশ কালই তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। বাড়ীর মালিকদের কেহ কখন কালেভদ্রে কলিকাতায় আসিলে বাড়ীখানি কিছুদিনের জন্য গুলজার হইয়া উঠিত। সম্প্রতি জমিদারবাবুদের কলিকাতাবাসী কোন আত্মীয়ের উদ্যোগে এই বাড়ীতে সখের অপেরার এক আখড়া বসিয়াছে। সুতরাং দুই বেলা বাড়ীতে এখন ঝাঁট পড়ে, সন্ধ্যায় আলো জ্বলে এবং বহু কণ্ঠের আলাপে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বাড়ীখানি সরগরম থাকে। তাহার পর আখড়া ভাঙ্গিয়া যায়, আখড়া-ধারীদের

প্রায় সকলেই সরিয়া পড়ে; এখানে রাত্রিবাস করে, কেবল শিক্ষক বিপুল বিশ্বাস এবং আখড়ার রক্ষক দাস ভগবান।

আখ্যাধারীদের সহিত বিপুল বিশ্বাসের যোগাযোগের কাহিনীটিও কৌতুকাবহ। পছন্দসই একটি বাসার সন্ধানে বিপুল যখন নানাস্থানে ঘোরাঘুরি করিতেছিল, সেই সময় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ল্যাম্প-পোষ্টের গায়ে লাগানো হাতে লেখা একখানা নোটিসে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চোখ দুটি বড় করিয়া সে নোটিসের লেখাগুলি এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলে। তাহার বয়ান এইরূপ:

> চাঁপাতলার সুবিখ্যাত 'সুহৃদ সমিতি' মহাসমারোহে, 'মহামানব' নামে বিখ্যাত নাটকখানি অপেরায় রূপান্তরিত করিয়া মহলা দিতেছেন। সুষ্ঠুভাবে মহলা পরিচালনা এবং শিক্ষাদানের জন্য এমন একজন দক্ষ অপেরা মাষ্টার প্রয়োজন, যিনি অভিনয়ে, গানে ও নৃত্য বিশেষ অভিজ্ঞ। কার্য্যকাল সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এবং ছুটির দিন বেলা দুইটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত। সমিতি তাঁহাকে বাসা দিবেন এবং দুইবেলা তিনি মাননীয় অতিথির মর্য্যাদায় আহার পাইবেন। সন্ধ্যার পর নিম্ন ঠিকানায় সমিতি-ভবনে স্বয়ং অনুসন্ধান করুন।...

ঠিকানাটি টুকিয়া লইয়া সেইদিনই নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিপুল রামহরি ঘোষের গলিতে সমিতি-ভবনে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করে। ছেলেটির আকৃতি ও প্রকৃতি অপেরার নারী-চরিত্র গ্রহণের পক্ষে একান্ত উপযোগী হইলেও অপেরা মাষ্টারের গুণরাজিতে সে যে বঞ্চিত—আপাত-দৃষ্টিতে এই ধারণাটাই কর্ত্তৃপক্ষের মনে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু বিপুল যখন হাসিতে হাসিতে একটি একটি করিয়া তাহার তিনটি 'এলেম' হাতেকলমে দেখাইয়া দেয়, তখন আখড়া-শুদ্ধ সকলেই একেবারে অবাক!

বিপুল যে সময় আখড়ায় প্রবেশ করে, ‘মহামানব’ নাটকের মায়াবিনী ‘আতাপি’ তখন রূপবিলাসী বিদ্যাভূষণ রাজক শর্ম্মার মাথা ঘুরাইয়া দিতে নৃত্যছন্দে গান ধরিয়াছে—

বঁধুহে, তোমায় করব রাজা তরুতলে।

অপেরা মাস্টারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কর্ম্মকর্ত্তাদের মুখগুলি ভারাক্রান্ত হইতেছে দেখিয়াই বিপুল ঝাঁ করিয়া বলে—আপনাদের রিহার্সেলটা আগাগোড়াই ভুলের রাস্তা ধরে চলেছে। একটা একটা ক’রে ভুলগুলোই আমি আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি,তা হ’লেই আপনারা বুঝতে পারবেন—আমার ‘এলেম’ এ-ব্যাপারে কতটুকু।

বলিতে বলিতেই ঝাঁ করিয়া পরনের কাপড়খানিকে এমন পরিপাটিরূপে দেহের সঙ্গে মানাইয়া লইল যেন সত্যই তাহাতে নূতন একটা রূপশ্রী ফুটিয়াছে বুঝা গেল। পরক্ষণেই ভূমিকার উপযোগী সময়োচিত নৃত্যলীলার প্রাণস্পর্শী আবেদন এবং গানের মধ্যে সুরের সাবলীলতা বড়-ছোট সকলকেই মুগ্ধ করিয়া দিল। নৃত্য শেষ হইতেই কর্ত্তাদের মুখে আর প্রশংসা ধরে না। নৃত্যের পরেই সে অভিনয় লইয়া পড়িল। যে দুটি ছেলে সাগরিকা ও লোপামুদ্রার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের আবৃত্তি শুনিয়া, পরক্ষণে নিজে আবৃত্তি করিয়া তাহাদের ভুলগুলি দেখাইয়া দিল, সেই সঙ্গে বিভিন্নমুখী দুইটি নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিল কাহার কিরূপ মনোবৃত্তি এবং কি ভাবে তাহার অভিব্যক্তি প্রকাশ করিতে হইবে। হাল্কা গানে নৃত্যছন্দে প্রথমেই সে রসসৃষ্টি করিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিয়াছিল, সর্ব্বশেষে ভাবোদ্দীপক গানেও তাহার রসবোধের নমুনা দেখাইল এই নাটকেরই আর একটি চরিত্রকে উপলক্ষ করিয়া। লাঞ্ছিতা নারীজাতির বেদনা এবং নিরুপায় অক্ষমতার দোহাই

দিয়া পুরুষ জাতির উপেক্ষা—ছায়া নাম্নী এক নারীকে বিচলিত করে। ইহার প্রতিক্রিয়ায় ছায়ায় সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ স্নায়ুপুঞ্জে বেদনার সুরে ধ্বনিত হইতে থাকে :

নির্য্যাতনে পিষ্টনারী করছে দানব অত্যাচার
পুরুষ কোথায় ক্লীব যত সব করবে কে তার প্রতিকার।
কুলের লক্ষ্মী ধর্ষিতা হায়, দেখিস্ এ সব কাণ্ডকে
শ্মশানভূমে দানব আজি নৃত্য করে তাণ্ডবে।

* * *

লক্ষ্মীহারা লক্ষ্মীছাড়া তবুও তোরা মুখ দেখাস্!
জ্বলত যেথা প্রেমের শিখা সেথায় অতল অন্ধকার।
নিজেই নারী ধরুক, কৃপাণ, দেবীর কৃপায় লভুক বল,
দেখিস্ তোরা পুরুষ হয়ে, দেখিস্ ওরা—মেষের দল;
পরিত্রাহী ডাকবে দানব, উঠবে জেগে হাহাকার।

বিপুল যখন তাহার সাধা গলায় ছায়ার এই মর্ম্মবাণী উপযুক্ত সুরে ঝঙ্কার তুলিল, তখন তাহার সুন্দর মূর্ত্তিখানি যেন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, সমঝদারদের মনে হইল যেন দেশের লাঞ্ছিতা নারী জাতির বেদনা-পীড়িত ক্রন্দসী মুখগুলির ছায়া গায়কের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের আর্ত্তস্বর গানের সুরের ভিতর দিয়া বাহির হইতেছে।

সেই রাত্রিতেই বিপুলের প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়া যায়। স্থির হয় যে, বিপুল আখড়া-বাড়ীতেই থাকিবে। ছাদের ধারে আলো বাতাসযুক্ত ঘরখানি সে ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আহারাদিরও সুব্যবস্থা হইয়া যায়। ভগবান দাস পাণ্ডা তাহার কতিপয় পরিচিত দেশ-বাসীর সহিত এই বাড়ীর নিচের তলায় বসবাস করে। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় ভগবান পাণ্ডাই দুইবেলা উপরের ঘরে বিপুল মাস্টারের আহার্য্য সরবরাহ করিয়া থাকে।

ভগবানের সহিত আলাপ জমাইয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতে বিপুলের মত ছেলের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ভগবানকে সে আশ্বাস দিয়াছে, তাহাকে বাছা বাছা কতকগুলি বাংলা গান শিখাইয়া ওস্তাদ করিয়া দিবে। এক একদিন তাহাকে গানের তালিমও দিয়া থাকে। ভগবানের মনে আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই ভগবান দেখে, মাস্টারবাবুর ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া যে মূর্ত্তি দরজায় তালা লাগাইতেছে, সে ত মাস্টার নয়, দিব্য খুবসুরৎ এক ছুকরী। অথচ সে নিজের চোখেই স্পষ্ট দেখিয়াছে—তাহাকে গানের এলেম দিয়া মাস্টার তাহার ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আর সে তখন উপরের পাটঝাট সারিয়া সবেমাত্র পুঁথীখানি খুলিয়া পাঠ ধরিয়াছে—

ছিরা হই জগমোহন গোড়ুর পছারে অনাড়ে।
ধড়াহড় করি বাঁধিয়া চরণ দেখি দণ্ড করি তুহারে।

এমন সময় হঠাৎ এই দৃশ্য-বিভ্রাট! মাস্টারের ঘরের দরজায় কুলুপ আঁটিয়া চাবির রিঙটি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে ছুকরীটি হাসিমুখে তাহার অভিমুখেই আসিতেছে।

ঘরের কাজ সারিয়া পুঁথীখানি খুলিয়া ভগবান ছাদেই বসিয়াছিল। ছাদের অপর প্রান্তে মাস্টারের ঘর। খাওয়া-দাওয়া সারিয়াই সে মাস্টারের ঘরখানি নিজের হাতে সাফ করিয়া গিয়াছে, মাস্টার ছাড়া ঘরের ভিতরে তখন ত জনপ্রাণীও ছিল না। তবে? মাস্টার কোথায় গেল, আর এই ছুকরীই বা কোথা হইতে আসিল? ভয়ে ভগবানের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, ভগবানের ভূত-ভয়-হারী 'রাম' নামটিও তাহার মুখ দিয়া ফুটিল না।

ছুকরী বুঝিল, ভগবান ভয় পাইয়াছে। তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া দিতে সে হঠাৎ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এই হাসি উল্টা বুঝিয়া

ভগবান আঁতকাইয়া উঠিল, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সে তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ছুকরী বুঝিল, এ অবস্থায় তাহার নিকটে গেলেই আতঙ্কে ভগবান সংজ্ঞা হারাইয়া একটা বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব করিবে। সে তখন তফাতে থাকিয়াই খপ করিয়া মাথার এলো খোপাটা তুলিয়া কহিল—সত্যিই আমি পেতনী নই ভগবান, আমি মাস্টার ; এখন বুঝলে ত মেয়ে সেজেছি।

ভগবান তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গিও বদলাইয়াছে। কণ্ঠ হইতে জড়িত স্বরে প্রশ্ন ফুটিল—কঁড় ?

বিপুল সহাস্যে জানাইল—যাত্রায় আমাকে ছুকরী সেজে নাচতে হবে জান ত? মায়াবী 'বাতাপী'র বউ 'আতাপী' সাজব আমি। নাচ ত আমার দেখেছ ? আজ সেজে-গুজে ফটো তোলাতে চলেছি আমার এক বন্ধুর দোকানে।

ভগবান এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিল। কিন্তু ফটোর কথা শুনিয়া নিজের চেহারাটির একখানি ফটো তোলাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাকেও আকুল করিয়া তুলিল। এখন মাস্টারের অনুগ্রহে তাহার অনেক-দিনের আশাটি যদি পূর্ণ হয় !

মাস্টার তাহাকে ভরসা দিল, বিনা খরচেই তাহার চেহারা সে তোলাইয়া দিবে, কিন্তু সে যে মেয়ে সাজিয়া ফটো তোলাইতে যায় —এ কথাটা গোপন রাখিতে হইবে। কেন না, অভিনয়ের আগে ছবিটা সে কাহাকেও দেখাইতে ইচ্ছুক নয়।

মাস্টারের প্রস্তাবে ভগবান সানন্দে সম্মতি দেয়, সুতরাং তাহার জ্ঞাতসারেই বিপুলকে আধুনিক তরুণীর সজ্জায় প্রায়ই রামহরি ঘোষের গলি হইতে বাহির হইয়া রিক্সাযোগে দূরবর্ত্তী পল্লীতে পাড়ি দিতে দেখা যায়।

অনীতা তাহার মানিক জোড়টির নামকরণ করিয়াছেন—দল-মাদল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, ইহারা দুটিতে আখড়া-বাড়ীর নীচের তলায় ভগবানের ঘরে বসিয়া দিব্য আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছে। ভগবানের বাড়ী খাস পুরী শহরে। ছেলে দুটি জানাইয়াছে, তাহারা পিপলি অঞ্চলে বাস করে। চাকরির জন্য কলিকাতায় আসিয়াছে। চাকরিও একটা জুটিয়া গিয়াছে, কিন্তু বাসা সুবিধামত পাইতেছে না। এখন ভগবান যদি সদয় হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহার আশ্রয়ে মাথা রাখিবার একটু স্থান পায়। অবশ্য, তার জন্য মাস মাস মাথা-পিছু অষ্টগণ্ডা করিয়া পয়সাও দিবে। ভগবান প্রস্তাবটি হাসিমুখে লুফিয়া লইয়াছে এবং স্বদেশবাসী ভাই দুটিকে সিঁড়ির নীচের ঘুলঘুলিটির ভিতরে থাকিবার স্থাননির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। ভগবানের বাসায় দল-মাদল ভিখু ও সুখু নামে পরিচিত হইয়াছে।

বিপুল মাস্টারের মেয়ের সাজে বাহিরে যাইবার কাহিনী ভগবান আখড়ার বাবুদের নিকট কোন দিন ব্যক্ত করে নাই বটে, কিন্তু দেশওয়ালী ভাই ভিখু ও সুখুর নিকট এই তুচ্ছ কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। কথায় কথায় একদা মাস্টারের প্রথম দিনের নারীসজ্জার রহস্যময় ব্যাপারটি ভিখু ও সুখুকে শুনাইয়া দেয় এবং তিনজনেই হাসিয়া লুটাপুটি খায়।

ভিখু ও সুখু ভগবানের আশ্রয়ে ত্রিরাত্রি মাত্র অতিবাহিত করিয়া চতুর্থদিন হইতে সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রিবাসের জন্য পুরা টাকাটি তাহারা অবশ্য ভগবানের হাতে অগ্রিম দিয়াছিল। ভগবান স্থির করিতে পারিল না, তাহাদের এভাবে গা-ঢাকা দিবার কারণ কি! ছেলে দুটি যে আফিসের নাম করিয়াছিল, পঞ্চমদিনে ভগবান সেখানে তাহাদের খোঁজ লইতে গিয়া দেখিল—সব ভূয়া। উক্ত ঠিকানায় ঐ নামের কোন আফিসই নাই।

এই দিন বিপুলও প্রথম বুঝিতে পারিল যে, তাহার গতিবিধি এবং

বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে নিরঙ্কুশ নহে, কুমারী-সংসদের দূরদর্শিনী নেত্রীর দৃষ্টিতে তাহার সকল কৌশল ফাঁসিয়া গিয়াছে।

বাগবাজার অঞ্চলে মহেন্দ্র বোসের গলিটি সুপরিচিত। একখানি রিক্সা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ভাঙ্গিয়া মহেন্দ্র বোসের গলিতে ঢুকিল। গলিটি যেখানে ডান দিকে বাঁকিয়াছে, সেই বাঁকের মোড়েই ছোট একখানি দ্বিতল বাড়ী। উপরে একটু বারান্দা, নীচে ক্ষুদ্র রোয়াকযুক্ত দেউড়ি,পাশে তার দিয়া ঘেরা একফালি খোলা জমি, কতকগুলি মরশুমি ফুলের গাছ বাড়ীখানির শ্রী ফুটাইয়া তুলিয়াছে, গৃহ-স্বামীর রুচিরও পরিচয় দিতেছে।

রিক্সা এখানে আসিবামাত্রই আরোহী হাঁকিল—রোখো। কিন্তু রুখিবার পূর্ব্বেই এমন কৌশলে টুক করিয়া গতিশীল রিক্সা হইতে সে নামিয়া পড়িল, পথচারিণী একটি মেয়ে তদ্দৃষ্টে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তাহার হাসিবার কারণটুকু বোধ হয় ইহাই যে, কোন মেয়ের পক্ষে এভাবে রিক্সা হইতে লাফাইয়া নামাটা কি অশোভন নয়?

রিক্সার আরোহীর কিন্তু এদিকে লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না, দরদস্তুরি সারিয়াই সে যখন রিক্সার উঠে তখনই ভাড়ার পাট চুকাইয়া রাখিয়াছিল। নামিয়াই সে দরজার কড়া দুটি এমন জোরে নাড়িয়া দিল যে, পাড়াটাই বুঝি কাঁপিয়া উঠিল।

এই আরোহীই বিপুল বিশ্বাস। রামহরি ঘোষের গলির মোড় হইতে রিক্সায় উঠিয়া এই বাড়ীর উদ্দেশে আসিয়াছে।

খুট করিয়া ভিতর হইতে একটা শব্দ উঠিল, পরক্ষণে দরজাটি খুলিয়া গেল। ভিতরে ঢুকিয়াই বিপুল সজোরে দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল, ফুলের মত ফুটফুটে একটি মেয়ে রূপের ঝলকে দ্বারদেশ আলো করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হাস্যমুখী তরুণীটির মুখের দিকে চাহিয়া বিপুল জিজ্ঞাসা করিল—হাসছ যে অমন করে ?

মেয়েটি উত্তর করিল—তোমার কাণ্ড দেখে। যে রকম জোরে কড়া নাড়লে, লোকের নজরে পড়লে কি ভাববে ?

বিপুলের গাম্ভীর্য্য এবার শিথিল হইয়া গেল, ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল—ভাববে, মেয়ে-বোম্বেটে কেউ এসেছে।

মেয়েটি কহিল—মেয়ে বোম্বেটের কথা কেতাবেই পড়ি, চোখে ত আজ পর্য্যন্ত কেউ পড়ে নি। অথচ পুরুষ-বোম্বেটেদের জ্বালায় ত পথে বেরুবার জো নেই। তুমি যে কি ক'রে রিক্সায় চ'ড়ে চাঁপাতলা থেকে বাগবাজারে নিত্যি নিরাপদে যাওয়া-আসা কর, সে ত ভেবেই পাই নে। গুণ্ডারা নিশ্চয়ই লোক চেনে।

বিপুল কহিল—আমাকে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ চিনতে পারে নি, সন্দেহ পর্য্যন্ত করে নি। কোন দিন কোন গুণ্ডার হাতেও পড়ি নি, 'ফলো'-ও কেউ করে নি। যাক্, মা কোথায় ? ঘুমুচ্ছেন বোধ হয় ?

মেয়েটি কহিল—না, বড়ি দিচ্ছেন ছাদে বসে। মা-ই ত ডেকে দিলেন আমাকে। বলিলেন—তোর মাস্টারণী আসছে রিক্সায় চেপে, দরজা খুলে দিয়ে আয়।

বিপুল কহিল—তা হ'লে আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করা ঠিক নয়, পড়ার ঘরে চল।

দরজার সামনেই গলির মত অপরিসর একটু জায়গা, সেইখানে ইহাদের সংলাপ চলিযাছিল। ইহার পরেই একটু উঠান, তাহার অপর প্রান্তে কোণের দিকে ছোট একখানি ঘর। এই ঘরখানিই মেয়েটির পাঠাগার। জানালার দিকে ছোট একখানি টেবিল, দুইপাশে দুইখানি মামুলী চেয়ার। অপর প্রান্তে ঘরের দেওয়াল ঘেঁষিয়া তক্তাপোষটি

পাতা,তাহার উপর মলিন সতরঞ্চি বিছানো। একধারে একটি আলমারি, তাকগুলি পুস্তকে পূর্ণ। টেবিলের উপর একখানি খাতা, কয়েকখানি বই,একখানা ডিক্সনারী,একটা দোয়াত, গোটা কয়েক পেনসিল ও কলম।

মেয়েটিই আগে ঘরে ঢুকিল, তাহার পিছু পিছু আসিল বিপুল। টেবিলখানির দুই প্রান্তে দুইখানি চেয়ারে দুজনে মুখোমুখী হইয়া বসিল।

মেয়েটির নাম সবিতা, গৃহস্বামী অবনী রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। রায় মহাশয় ছাঁপোষা মানুষ, তাহার উপর ঋণগ্রস্ত এবং সর্ব্বাস্বান্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সবিতার কোলে আরও ছয়টি ভাই-বোন। তাহাদের কতক স্কুলে গিয়াছে, কতক উপরে ঘুমাইতেছে বা খেলিতেছে। গৃহিণীর নাম যশোদা, সাদা-সিধা প্রকৃতির মানুষ। এক সময় অবনী রায়ের অবস্থা মোটের উপর ভালই ছিল। শ্যামপুকুরে পৈতৃক নিজস্ব বসতবাড়ী এবং সঞ্চিত কিছু টাকাও ছিল। কিন্তু এক প্রতারকের প্ররোচনায় কারবার করিতে গিয়া সে সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলিযাছেন। দেনার দায়ে বাড়ী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সঞ্চিত টাকার ত কোন চিহ্নই নাই, উপরন্তু প্রায় হাজার তিনেক টাকার দেনা ঘাড়ে ঝুলিতেছে। রেলের আফিসে যে বেতন পান, তাহাতে বাড়ী ভাড়া, দেনার সুদ, ট্রামের টিকিট, ছেলে মেয়েদের স্কুলের বেতন প্রভৃতির ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, স্বচ্ছলভাবে তাহাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, প্রতি মাসেই বজেটে ঘাটতি পড়ে এবং আফিসের কো-অপারেটিভ স্টোরের দ্বারস্থ হইয়া ইজ্জত রক্ষা করিতে হয়। ইঁহাদের উপর সর্ব্বাধিক সমস্যা কন্যা সবিতাকে পাত্রস্থ করিবার দুশ্চিন্তা। বর্ত্তমানে বয়স তাহার সপ্তদশবর্ষ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। আর ত তাহাকে রাখিতে পারা যায় না।

সবিতার তুলনায় রায় মহাশয়ের অন্যান্য পুত্রকন্যারা খর্ব্বাকৃতি, দেহের বাড়-বাড়ন্তের একান্ত অভাব দেখা যায়। সবিতার, দৈহিক শ্রীবৃদ্ধি ও

পরিপুষ্টির হেতুও আছে। আশৈশব সে মাতামহের আশ্রয়েই লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহার মাতামহ মীরাটে মিলিটারী আফিসে চাকরি করিতেন। পেনসন লইয়া তিনি সস্ত্রীক কাশীবাস করেন। সবিতার সমগ্র শৈশব ও কৈশোরকাল মীরাট ও কাশীতে অতিবাহিত হওয়ায় পশ্চিম প্রদেশের স্বাস্থ্যকর জল বায়ু এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল পরিবেশ এই স্বভাব-সুন্দরী কিশোরীর তনুলতাটি পরিপুষ্ট ও সর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। কলিকাতার আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সবিতার দেহ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই—কারণ তাহার কলিকাতা-বাস এখনও তুই মাস পূর্ণ হয় নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার মত পাঠস্পৃহাও সবিতার অতি মাত্রায় সচেতন, কাশীতে সে পড়াশুনায় এবং কলা-বিদ্যায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কলিকাতায় আসিয়াই সে পিতার নিকট আবদার ধরে—'বাড়ীতে আমি পড়বো বাবা, আমার একজন মাস্টার চাই—মেয়ে মাস্টার।' পিতা ঢোঁক গিলিয়া বলেন —'আচ্ছা, সন্ধান করবো।' কিন্তু সন্ধান করার মানেই মাসিক আরও দশটি টাকার ব্যবস্থা। ছেলেগুলোর স্কুলের মাহিনাই নিয়মিতভাবে দাখিল করিতে তাঁহাকে হিমসিম খাইতে হইতেছে, ইহার উপর ধেড়ে মেয়েকে পড়াইবার জন্য মাষ্টার রাখিতে হইবে—তুদিন পরেই যে পরের বাড়ী চলিয়া যাইবে!

পিতার আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাব দেখিয়া সবিতা বলে—'ভাই বোনদের পড়ার ভার আমি নিলুম বাবা, 'আমি এদের সকাল-সন্ধ্যায় পড়াবো। কিন্তু আমার জন্য মাস্টার চাইই।'

ইহার পরেই সহসা একদা এ বাড়ীতে এই ছদ্মবেশী মাষ্টারটির আবির্ভাব হয়। 'গৃহস্বামিনী যশোদা দেবী সে সময় দিবানিদ্রায় মগ্ন, ছেলেরা স্কুলে গিয়াছে। ছোট ছোট ভাই-বোনগুলিকে সযত্নে ঘুম পাড়াইয়া সবিতা

যেন প্রস্তুত হইয়াই কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিল। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে সচকিতা হইয়া সে দ্বার খুলিয়া দেয় এবং হাসির ভারে লুটোপুটি খাইবার মত হইয়া বলে—'খাসা সেজে এসেছ ত, উপরের বারান্দা থেকে প্রায়ই দেখি এই রাস্তা দিয়েই এক মাস্টারণী বেথুনে পড়াতে যায়,বাপরে, কি ধুমসী ; তবে তার সাজ-পোষাকও ঠিক এমনি। যাক্, এখন আমার মাস্টারণীর কি পরিচয় দেওয়া হবে শুনি? মা ত এখুনি উঠে সব শুনবেন, জানতে চাইবেন। আফিস থেকে বাবা ফিরলে তাঁকেও জানাতে হবে ত!'

ছদ্মবেশী মাস্টারণী উত্তর দেয়—বলবে, চাঁপাতলায় থাকে ; কলেজে পড়ে। 'লিজার আওয়ারে' সুবিধেমত এসে আমাকে ঘণ্টা খানেক পড়িয়ে যাবে। নাম হচ্ছে—বিপুলা দেবী।

হাসিতে হাসিতে সবিতা বলে—কিন্তু নামটি ত চেহারার সঙ্গে মিলছে না, বিপুলা নামটি বরং সেই মুটকি মাস্টারণীকে মানাত ভালো। নামটি বরং মুকুলমালা হোক, মিছেও হবে না আর চেহারার সঙ্গেও মিলবে।

মাস্টার মাথা নাড়িয়া জানায়—তার আর উপায় নেই। মিশন কলেজে নাম পত্তন হয়ে গেছে। ফোর্থ-ইয়ার-ক্লাসে কোন দিন যদি যাও, অবিশ্যি—ছুটোর ভিতরে, দেখবে বিপুল বিশ্বাস মশাই সেখানে হংস মধ্যে বকের মত বিরাজ করছেন।

বিস্ময়ের ভঙ্গিতে সবিতা বলিয়া ওঠে—বল কি ফোর্থ-ইয়ারে নাম লিখিয়েছ তুমি? সত্যি? বি-এ পাশ করে ফের্ কেঁচে গণ্ডূষ করা হ'ল কি দুঃখে শুনি?

স্নিগ্ধদৃষ্টিতে সবিতার দিকে চাহিয়া মুকুল বলে—তোমার দুঃখেই সবিতা, নইলে সাধ ক'রে কি শিঙ্ ভেঙ্গে বাছুরের দলে ঢুকি?

• সবিতা উত্তর করে—কথাটা কিন্তু উল্টো হ'ল, বলা বরং উচিত ছিল, শিঙ্ এঁটে গোরুর দলে ঢুকেছ। বাছুর তুমি নিজেই। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি নে,—বি-এ পাস করে ফের তুমি বি-এ ক্লাসে ঢুকলে কেন! এম-এ পড়া কি তা হ'লে ছেড়ে দিলে?

মাস্টার এবার একটু গম্ভীর হইয়াই কথাটার উত্তর দেয়—তোমার প্রথম কথাটার উত্তর হচ্ছে—প্রয়োজনের খাতিরে। বি-এর সার্টিফিকেট-খানা ত আর মিশন কলেজে বিশ্বাস মশাই দাখিল করেন নি, তদ্বিরের জোরে আর জাল-জোচ্চুরির ফলে কোন রকমে এটা সম্ভব হয়েছে, শেষ পর্য্যন্ত ধোপে টেঁকবে না জানি, কিন্তু সে দুর্দ্দিন আসবার আগেই কাজটা হাসিল ক'রে ফেলবই। হ্যাঁ, এবার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে—ইউনিভারসিটি কলেজের ফিফ্‌থ ইয়ারে আসল নামটাই পত্তন করা হয়েছে।

মুখে চক্ষুতে বিস্ময়ের রেখাগুলি সুস্পষ্ট করিয়া সবিতা বলিয়া উঠে—কি সর্ব্বনাশ, করছ কি তুমি! মিশন কলেজ, ইউনিভারসিটি কলেজ আর মহেন্দ্র বোসের গলিতে প্রাইভেট টুইশানী—এক সঙ্গে তিনটে আলাদা আলাদা রাস্তায় পাড়ি! কি ক'রে শেষ রক্ষা করবে?

মুখখানা শক্ত করিয়া মাস্টার উত্তর দেয়—

শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।
শনৈঃ কর্ম্ম চ ধর্ম্মশ্চ এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥

অতঃপর ছদ্মবেশী শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীর সংযোগে ব্যবস্থাটা পাকা হইয়া যায়। সবিতার মাতা মাস্টারণীকে দেখিয়া অবাক আর কি! মুখখানা হুবহু সবির মত! সবিতার মাতাকে শিক্ষয়িত্রী হাসিমুখে জানায় যে, নিজের মুখের আদল মেয়েটির মুখে দেখিয়াই ত তার মনে কেমন মায়া বসিয়াছে! সবিতাকে সে উপস্থিত বিনা পারিশ্রমিকেই পড়াইয়া যাইবে। বিবাহের

পর তাহার স্বামীর নিকট হইতেই সে পারিশ্রমিক আদায় করিয়া লইবে। সেই দিন হইতে এই বাড়ীতে ঠিক এই সময় শিক্ষায়ত্রীর শুভাগমন হইয়া থাকে।

এ-দিন চেয়ারে বসিয়াই বিপুল কি একটা কথা বলিবার জন্য যেমন মুখখানা তুলিয়া সবিতার পানে চাহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহার সতর্ক দুটি চক্ষুর ইঙ্গিতে বাধা পাইয়া বিপুলের মনের কথা কণ্ঠেই আবদ্ধ রহিল। বিপুলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কক্ষের বাহিরে তৃতীয় ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে এবং তিনি স্বয়ং গৃহিণী যশোদা দেবী। কয়দিন হইতেই বিপুল লক্ষ্য করিতেছে, তাহার অধ্যাপনা সম্বন্ধে গৃহস্বামিনীর মনে কেমন যেন একটা সন্দেহের ভাব সূচিত হইয়াছে, পড়িবার ঘরে বিপুল প্রবেশ করিলেই তিনি চুপি চুপি পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরের জানালাটির পাশে আসিয়া দাঁড়ান, কান দুটি পড়িয়া থাকে ঘরের ভিতরে শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীর সংলাপের উপরে। কিন্তু সবিতাও এ সম্পর্কে মাতার অপেক্ষা অধিক সতর্ক। চেয়ারখানিকে সে এমন ভাবে পাতিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার উপরে বসিয়া দৃষ্টিটা একটু বক্রপথে নিক্ষেপ করিলেই উপরের সোপান-শ্রেণীর এমন একটা অংশে নিবদ্ধ হয়, বাড়ীর পোষা বিড়ালটিও উপর হইতে নামিয়া আসিলে দৃষ্টি এড়াইবার উপায় থাকে না। অমনই তাহার দৃষ্টিভঙ্গি চঞ্চল হইয়া বিপুলকে জানাইয়া দেয়—সাবধান!

সতর্কভাবে নিজেকে সামলাইয়া বিপুল তাড়াতাড়ি সবিতার পাঠগ্রন্থ সমালোচনা সংগ্রহের পাতাখানি খুলিয়া প্রশ্নের ভঙ্গীতে কহিল—Describe briefly the qualities which constitute, according to Sir Asutosh Mukherjee, the greatness of Michael Modhusudan Dutta as a poet.

সবিতা উত্তর করিল—স্যর আশুতোষের মতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কেবল মাত্র বঙ্গের নহেন, সমগ্র ভারতবর্ষের বরণীয় ও কবিশ্রেষ্ঠগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর মত মহাকবির আবির্ভাবে বঙ্গদেশ চিরদিনের মত ভারতবাসীর পূজনীয় হইয়া রহিয়াছে।—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সবিতা স্বর পাল্টাইয়া চাপা গলায় সহাস্যে কহিল: ওদিকে ছাত্রীর জননীও প্রসন্ন হইয়া সরিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্য করিতেছি—উঠানটি পার হইয়া রান্না ঘরের দরজার শিকল খুলিতেছেন, কিছুক্ষণ ঐ কক্ষেই রহিবেন। অতএব—মাভৈ!

মৃদুস্বরে বিপুল জিজ্ঞাসা করিল—নতুন খবর কিছু আছে?

ডান চক্ষুটির দৃষ্টি বাহিরে এবং বাম চক্ষুটির দৃষ্টি বিপুলের মুখে নিবদ্ধ করিয়া সবিতা উত্তর দিল—অনেক।

বিপুল কহিল—শুনি।

সবিতা তাহার সংগৃহীত খবরগুলি শুনাইতে লাগিল—বাবার সব দেনা এবার শোধ হয়ে যাবে। তিন মাসের সুদ পড়েছিল, সেটা শোধ ক'রে দিয়েছে কাল। বলেছে—বিয়ের পরেই দেনাগুলো শোধ ক'রে দেবে। তারপর, এ বাড়ীতে আর কষ্ট করে থাকতে হবে না, শ্যামপুকুরে বাবার পৈতৃক যে বাড়ীখানা জেলেপাড়ার পাতিরাম পাকড়ে দেনার দায়ে কিনে রেখেছে, সেটা উদ্ধার করে আমার নামে লেখা-পড়া করে দেবে। সে বাড়ীতে আমার পুরো অধিকার থাকবে, দান-বিক্রী করতেও বাধবে না। অর্থাৎ আমার বিয়ের পর আমার বাবা তাঁর ফ্যামিলী নিয়ে ঐ বাড়ীতেই উঠে গিয়ে বরাবর বসবাস করবেন। মাকেও একটা 'অফার' করেছে বুড়ো,—হাজার টাকার একখানা গভর্নমেণ্ট পেপার তাঁর নামে 'এনডোস' ক'রে দেবে; সেটা হবে আমার মায়ের স্ত্রী-ধন। আমার ভাই-বোন্‌দের লেখা-পড়ার ভাল রকম ব্যবস্থাও করে দেবে। আর ঈ, আই, রেলের

কনট্রোলার সাহেব নাকি বুড়োর প্রাণের বন্ধু, তাকে ধরে বাবাকে তিনশো টাকার গ্রেডে তুলে দেবে।

দুই চক্ষু কপালের দিকে তুলিযা বিপুল কহিল—বাবারে! বুড়ো যে দেখছি আলাউদ্দীনের আশ্চর্য্য পিদ্দিমকেও হার মানিয়ে ছেড়েছে। কারুর কাছ থেকে আপত্তি যে উঠবে, তার কোন রাস্তাই রাখে নি। বাবার দেনা শোধ, বাড়ীভাড়ার পাট উৎপাটন, চাকরীর দিকে উঁচু গ্রেডে প্রমোশ্যান—আর কি চাই? এর উপরে মা'র নামে কোম্পানীর কাগজ, ছেলেদের এডুকেশন, আর তোমার নামে একখানা আলাদা বাড়া! বুড়ো দেখছি সত্যিই বাহাদুর পুরুষ।

মুখের হাসি চাপিয়া সবিতা কহিল—বাড়ীখানা ত ফাউ, এর কথাটা কালই উঠেছে, আহ্লাদে বাবা বোধ হয ঘুমোতে পারেন নি। তবে মা'র মনের ভাবটা আলাদা, যেন দু-নৌকোয পা দিয়ে আছেন। মন খুলে 'হ্যাঁ'-ও বলতে পারছেন না, 'না'-বলতেও বাধছে। হ্যাঁ, যা বলছিলুম, গয়না দেবে আমাকে তিন সুট! এক সুট খালি জড়োয়ার, এক সুট দিশি স্যাকরার—বি, সরকারকে অর্ডার দিযেছে, আর এক সুট হ্যামিল্টনের বাড়ীর—বিলিতি প্যাটার্নের একবারে। লাট সাহেবের দরবারেও আমাকে যেতে হবে কি না বুড়োর সঙ্গে।

বিপুল কহিল—অবিশ্যি, বাবা আর মা'র কথা বলতে পারি নে, তাঁদের সাধ এ-যাত্রা হয় ত মেটানো বুড়োর পক্ষে সম্ভব হবে না, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে অর্থাৎ তোমাকে তার দেওযাটা সার্থক করা সম্বন্ধে সাধটুকু—পুরোপুরি পূর্ণ হবেই, তিন সুট গযনা আর ঐ বাড়ীখানা—

স্থির দৃষ্টিতে বিপুলের দিকে চাহিযা সবিতা কহিল—এর মানে?

বিপুল কহিল—কুমারী-সংসদের রেজোলিউসনের কথা তোমাকে বলি নি—এ-ব্যাপারে প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা, ছল, কৌশল, চাতুরী নির্দ্দয়ভাবে

এবং নিষ্ঠার সঙ্গে চালানো হবে। সংসদের মতে বর-পণের—ছুরি যারা সানায় তারা হচ্ছে পাথর, আর বুড়ো বয়সে তরুণী বিবাহে যারা মত্ত হয়, তারা বর্ব্বর। শাস্ত্রকাররা বলেছেন—যেন-তেন প্রকারেণ বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ম্। সুতরাং মানে এর মধ্যেই নিহিত আছে; আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চাই নে।

ঠিক এই সময় বাহিরের দরজার কড়া সশব্দে বাজিয়া উঠিল। রন্ধনাগার হইতে যশোদা দেবী সবিতার উদ্দেশে কহিলেন—কে কড়া নাড়ছে দেখ্‌ত মা সবি, ঝি বুঝি এল !

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, বিপুলের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যে কহিল—বস একটু, বোধ হয় পিয়ন—চিঠি আছে।

বিপুল জিজ্ঞাসা করিল—মা বললেন, ঝি ডাকছে, তুমি বলছ—পিয়ন? কিসে বুঝলে? কোন্‌টা ঠিক?

ফিক করিয়া হাসিয়া সবিতা কহিল—তুমিও বুঝবে। কড়ার শব্দ যে আমার চেনা।

বলিয়াই সে দ্রুত বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট দুই পরে মুখখানা ভার করিয়া পাঠগৃহে ঢুকিল, হাতে একখানি খোলা চিঠি, পোষ্ট আফিসের মোহর-লাঞ্ছিত রঙ্গীন সুদৃশ্য লেফাফাটি খোলা চিঠিখানার পিছনে উঁচু হইয়া আছে।

যশোদা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—কে এল রে সবি?

সবিতা উত্তর দিল—চিঠি; পিয়ন দিয়ে গেল।

পুনরায় প্রশ্ন হইল—কার চিঠি? কে দিলে?

উত্তর দিল সবিতা—আমার; কাশী থেকে এক বন্ধু লিখেছে।

কিন্তু চিঠিখানি যে সত্যকার কোন বন্ধুর নয় এবং চিঠির বিষয়বস্তু সবিতার প্রীতিপ্রদ হয় নাই, তাহার মুখ দেখিয়াই বিপুল তাহা বুঝিতে

পারিল। কাছে আসিতেই খপ করিয়া চিঠিখানা সবিতার হাত হইতে টানিয়া লইয়া বিপুল জিজ্ঞাসা করিল—কার, দেখি?

মুখখানা ভার করিয়া সবিতা চেয়ারটির উপর বসিয়া পড়িল, চাপা গলায় কহিল—দেখে আর হবে কি, আস্পর্দ্ধা ধাপে ধাপে উঠছে। এখানা হচ্ছে—থার্ড লেটার। প্রথমটার পাঠ ছিল—কল্যাণীয়াসু, তার পরের খানায়—স্নেহের সবিতা। এখানায় একেবারে প্রিয়তমে! এর পরের চিঠিতে পাঠ কোথায় উঠবে কল্পনা করতে পার?

সবিতার কথার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিখানা বিপুলের পড়া হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু দুটি যেন জ্বলিয়া উঠিল, ডান হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া টেবিলের উপর সজোরে ঠুকিয়া কহিল—এই চিঠিই হবে বুড়োর মৃত্যুবাণ! নাস্তানাবুদ হবে তখন দেখে নিও।

দুঃখের মধ্যেও সবিতার মুখে হাসির রেখা ফুটিল, চাপা কণ্ঠে কহিল—বাস্, মুখ বন্ধ কর, রান্নাঘরে মা আছেন ভুলে যেও না যেন! চেহারাখানা একেবারে বদলে মেয়ে-বোম্বেটে গোছের হয়েছে।

বিপুল কহিল—সত্যিই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম সবিতা। একষট্টি বছরের বুড়ো যদি বিয়ের আগেই এতটা স্বাধীনতার সুযোগ নিতে পারে, তার নাতীর বয়সী তরুণরা তা হ'লে কি না করতে পারে? কখনও শুনেছ—বিয়ের কথা চলবার সময় পাত্র মেয়েকে চিঠি দিয়েছে, তাকে সঙ্গে করে শহর ঘোরবার, ফটো তোলবার, কাপড়-চোপড় গয়না-গাঁটি পছন্দ করে কেনবার কথা লিখেছে?

সবিতা কহিল—লিখবে না কেন? সে ত জানে কন্যাপক্ষের মাথাগুলো কিনেই রেখেছে। তার আস্পর্দ্ধার কথা ভেবে আমরা চুলবুল করছি, সে কিন্তু মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছে, বাবার মত আমিও হাত ধুয়ে বসে আছি—চিঠির জবাব দিই নি শুধু

লজ্জায়। তাই লজ্জা ভাঙবার জন্য ভেবেচিন্তে এই মতলব ঠিক করেছে।

বাহিরের দ্বারের কড়া দুটি আবার বাজিয়া উঠিল। রান্নাঘর হইতে যশোদা দেবী সাড়া দিলেন—ঐ আবার কে ডাকে! জ্বালাতন বাবা—

সবিতা এবার আর সাড়া দিল না, বাহিরের কড়ার শব্দ এবং মাতার কণ্ঠস্বর তাহার শ্রুতিস্পর্শ করিযাছে কি-না বুঝা গেল না। সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিখানার প্রেরকের স্পর্দ্ধা তাহার মাথার ভিতরে তখন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে।

কন্যার সাড়া শব্দ না পাইযা যশোদা দেবী নিজেই হাতের কাজ ফেলিয়া বিরক্তি-ভরে উঠিযা দরজা খুলিয়া দিতে গেলেন। সবিতার সেদিকে লক্ষ্য নাই; তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছিল, ইচ্ছা করিযাই সে বুঝি এই অপ্রীতিকর পরিবেশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য সতর্কতার বিধি-নিষেধগুলিকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

সবিতার ঠোঁট দুটি বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য স্ফুরিত হইতেছে দেখিয়াই বিপুল চাপা স্বরে তাহাকে সতর্ক করিযা দিল—এ কি ছেলেমানুষী হচ্ছে, পাগল হলে নাকি?

বিকৃত স্বরে সবিতা উত্তর দিল—পাগল হই নি কেন সেইটিই আশ্চর্য্য! এরা আমাদের কি ভেবেছে বলতে পার? মেয়ে হয়েছি বলে এত লাঞ্ছনা সইতে হবে ঘরে-বাইরে সব দিকে! এর চেয়ে কি মরাই আমাদের ভাল নয়?

ধমক দিয়া বিপুল কহিল—নিশ্চয়ই নয়, চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাবার মতই সেটা হাস্যকর। নতুন করে কি আর মরবে—অন্তরে বাইরে এ জাতটাই ত মরছে! কেন মরছে জান, দুর্ব্বল দেহের ভিতরে মনটা তাদের চাপা পড়ে আছে—তাই। এই জাতের চাপা-

পড়া মনকে চাঙা করে তোলবার জন্তেই হাত বাড়িয়েছে কুমারী-সংসদ। ভারটা তাদের হাতেই ছেড়ে দাও না। আর যদি মরতে চাও সবিতা, স্নেহলতার মত কিম্বা গড়পাড়ের মেয়েগুলোর মত অপমৃত্যুর অনুসরণ না করে মৃত্যু-বরণের নতুন পন্থা বার করতে হবে; যারা লাঞ্ছনা করছে, অপমান করছে, নির্য্যাতন করছে—তাদের মৃতদেহ সেই পথে বিছিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে তোমরা করবে মৃত্যুকে আবাহন! পারবে সবিতা, পারবে?

—ঐ যে পড়াচ্ছেন! বাবা, বাবা! ধন্যি পড়ানো। কালে কালে কত দেখবো!

ঘরের বায়ুমণ্ডল তখন উত্তপ্ত এবং তাহার আভা মুখোমুখি উপবিষ্টা দুইটি তরুণ প্রাণীর মুখমণ্ডলও আরক্ত করিয়া দিয়াছে। যশোদা দেবীর কণ্ঠস্বর পলকে একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল। স্তব্ধ বিস্ময়ে উভয়ে দেখিল—দ্বারদেশে যাহারা ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুশ্রীসুন্দর চেহারা এবং আড়ম্বরহীন পরিচ্ছন্ন বেশভূষার ভিতর দিয়া আভিজাত্যের আভাস সুস্পষ্ট!

সবিতা দেখিল, অপরিচিতা মেয়ে কয়টির উদ্দেশে বিরক্তিপূর্ণ নির্দ্দেশটি দিয়াই তাহার মাতা পুনরায় রান্নাঘরে ঢুকিতেছেন, আর অপরিচিতারা কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাহাকে ও তাহার ছদ্মবেশী মাষ্টারটিকে যেন গ্রাস করিতেছে!

বিপুলের উদ্দীপনাও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; সযত্ন প্রসারিত ছদ্ম-বেশটি গুরুভার বোঝার মত হঠাৎ তাহার দেহ-মনকে এরূপ আড়ষ্ট করিয়া দিল যে, কুমারী-সংসদের মাননীয়া প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী এবং অপর কতিপয় বিশিষ্ট সভ্যাকে কক্ষদ্বারে উপস্থিত দেখিয়াও অভ্যর্থনার জন্য শশব্যস্তে উঠিতেও পারিল না, মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

কিন্তু অভ্যর্থনার কোনরূপ প্রত্যাশা না করিয়াই অনীতাদেবী ও তাঁহার সঙ্গিনীরা অসঙ্কোচে গৃহমধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং টেবিল ও দরজাটিকে আড়াল করিয়া এমন ভঙ্গিতে তাঁহারা দাঁড়াইলেন, মনে মনে বুদ্ধিমান বিপুলকেও তজ্জন্য তারিফ করিতে হইল।

সবিতার দিকে চাহিয়া অনীতা দেবী সহাস্যে কহিলেন—যদিও আমরা তোমার পড়ার ঘরে ট্রেস-পাসার্সের মত সেঁধিয়েছি, কিন্তু সেজন্য তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই।

ইতিমধ্যেই সবিতা নিজেকে সংযত করিয়া লইয়াছে। মুখখানা শক্ত করিয়াই সে কথাটার উত্তর দিল—ভয় আমি কাউকে করি না।

প্রসন্নমুখে অনীতা কহিলেন—মেয়েরা ত কস্মিন কালেই মেয়েকে ভয় করে না, প্রয়োজনও হয় না। কিন্তু কোন ব্যতিক্রম হলেই ভয়টা নিজেই এগিয়ে আসে।

কথাগুলি বলিয়াই অনীতা বিপুলের দিকে এমন মর্ম্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যাহার অর্থ উপলব্ধি করিতে সবিতারও কষ্ট হইল না, বিপুলও মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল।

অনীতা পুনরায় কহিলেন—যে ভয়টাকে চেনা যায় না, আর চিনলেও ঠেকানো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়—সেটা কি জান?

সবিতা এই অদ্ভুত মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

অনীতা নিজেই কথাটার উত্তর দিলেন। কহিলেন—সেটি হচ্ছে—আত্মপ্রবঞ্চনা, দর্শনীয় কিছু নয়—মানুষের মর্ম্মগত বস্তু।

সবিতা কহিল—এ সব কথা কেন তুলছেন বলুন ত?

অনীতা কহিলেন—তোমার ভালোর জন্যেই।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অনীতা দেবীর প্রশান্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া সবিতা

কহিল—কিন্তু, আপনাকে এর আগে কোন দিন দেখিছি বলে ত আমি মনে করতে পারছি নে।

অনীতা দেবী কহিলেন—দেখিনি অথচ জানি, এমন অনেক জিনিস আছে। দেখা না হলেও আমরা তোমাকে জানি। যদিও প্রথম দর্শনে চোখে ধোঁকা লেগেছিল, ছাত্রী আর শিক্ষয়িত্রী—দুজনের চেহারার সাদৃশ্যটি চমকাবার মতন, তাই! কিন্তু সেটা কেটে গেছে।

সেক্রেটারী শক্তি কহিল—বিপুলা দেবী দেখছি শুধু কেতাবী বিদ্যেয় নয়—মেক্-আপেও ওস্তাদ!

মায়া নামে ফাজিল মেয়েটি এই সময় মুখ টিপিয়া হাসিয়া পাশের সঙ্গিনীটির কানে কানে চাপা গলায় কহিল—এখন 'গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়!'

সবিতা কহিল—কিন্তু মনে রাখবেন আপনাদের সম্বন্ধে কিছুই বলছেন না, আমাকে অন্ধকারেই রেখেছেন—

বিপুল এতক্ষণ মুখখানা নিচু করিয়া টেবিলের প্রান্তটির উপর হাত দুটির ভার দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। এই সময় সহসা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সবিতার উদ্দেশে কহিল—অন্ধকারটা আমিই কাটিয়ে দিচ্ছি সবিতা, জেনে তুমি নিশ্চয়ই খুশী হবে—কুমারী-সংসদের প্রেসিডেণ্ট অনীতা দেবী তোমার সঙ্গে কথা বলছেন। আর ওঁরা সংসদের বিশিষ্ট সদস্য, প্রত্যেকেই কৃতী ছাত্রী।

সবিতার মুখের ভাব পলকে বদলাইয়া গেল, যুক্ত করপল্লবদুটি সীমন্তে ঠেকাইয়া সসম্ভ্রমে কহিল—আপনি! কি সৌভাগ্য আমার, দয়া করে পায়ের ধূলো দিয়েছেন।

অনীতা দেবী কহিলেন—ও কথা বলতে নেই, তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যে, কলেজে পড়লেও সংস্কারকে আমরা মেনে চলি।

শক্তি পিছন হইতে কহিল—তা ছাড়া, পায়ে আমাদের ধূলোও নেই, দেখতেই পাচ্ছ—এবার শ্রীচরণেষু এখন স্যাণ্ডেল।

সবিতা কহিল—এসে অবধি ত দাঁড়িয়েই রয়েছেন সকলে; এসেছেন যখন দয়া করে—বসুন।

অনীতা কহিলেন—দয়া করে ত আসি নি ভাই, দায়ে প'ড়েই এসেছি। আর এই আসাটা হয়েছে বিপুলা দেবীর উদ্দেশেই। আর একদিন এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাবে, সে দিন নিশ্চয়ই বসব। কিন্তু, আজ আর নয়—

বলিযাই সহসা বিপুলের দিকে মুখখানি ফিরাইয়া এবং কথার সুরটি কিঞ্চিৎ বিকৃত করিযা প্রশ্ন করিলেন—বিপুলা দেবীর আপত্তি বোধ হয় নেই আমাদের সঙ্গে যেতে ?

বিপুল যেন এরূপ একটা প্রশ্নেরই প্রতীক্ষায় ছিল এবং উত্তরটিও প্রস্তুত করিয়াই রাখিয়াছিল। কহিল—আপনাদের দেখেই বুঝিছি, খুব জরুরী মিটিং একটা আছে, আর তাতে বড় রকমের একটা বক্তৃতা আমাকে দিতে হবে। বেশ, চলুন—যাওয়া যাক্।

সবিতা অবাক হইয়া বিপুলের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। চোখোচোখি হইতেই বিপুল তাহার অবস্থাটার সহিত জানালার বাহিরে গৃহকর্ত্রীর উপস্থিতির আভাসটুকু ইঙ্গিতে যথাসম্ভব প্রকাশ করিয়া উভয়পক্ষের উদ্দেশে কহিল—আঁকগুলো তা হ'লে কসে রেখো সবিতা, কাল এসেই দেখব। আর, তোমার বন্ধুর চিঠিখানা আমি নিয়ে যাচ্ছি, মিটিং-এ পড়ব। বন্ধুটি তোমার ঐ বয়সেও কি চমৎকার লিখতে শিখেছেন, সেটা শুনলে সংসদের মেয়েরা জ্ঞানলাভ করবেন বলেই মনে হয়। মা'কে ব'লো, এঁরা আজ আর চা-টা কিছু খাবেন না, আর একদিন এসে খেয়ে যাবেন।

বিপুলের শেষের কথাটি যশোদা দেবীর ভারি মনঃপূত হইল। ভদ্র-ঘরের এতগুলি মেয়ে বাড়ীতে আসিয়াছে, অন্ততঃ তাহাদিগকে এক কাপ করিয়া চা খাইতে দিয়াও যে ভদ্রতা রক্ষা করা উচিত, এ কর্ত্তব্যবোধটুকু গৃহকর্ত্রীর অবশ্যই ছিল। কিন্তু থাকিলে কি হইবে, রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখেন চায়ের কৌটা খালি, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, চা-যে বাড়ন্ত, সে কথা কর্ত্তাকে ত বলা হয় নাই। ঝি কিম্বা ছেলেরা না আসিলে বাজার হইতে কিনিয়া আনিবারও উপায় নাই। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিয়া সবিতাকে ডাকিবার জন্য তিনি জানালার নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, গৃহমধ্যে এতগুলি অপরিচিতা মেয়ের সহিত বয়স্থা কন্যার কি সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা হইতেছে, তাহা জানিতেও মনে কৌতূহলের উদ্রেক স্বাভাবিক। এই সময় মাস্টারণীর কথাগুলি যেমন তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্ত করিল, তেমনই অতিথি-সৎকারের দুশ্চিন্তাও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। কিন্তু এক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য, পাকা গৃহিণী-সুলভ উপস্থিতবুদ্ধিটুকুর সুযোগ লইতেও তিনি ভুল করিলেন না। তাড়াতাড়ি দরজা আগুলাইয়া আগন্তুকদের উদ্দেশে কহিলেন—অ-মা, চলে যাচ্ছ নাকি তোমরা? তা কি কখন হয় বাছা, চায়ের জল আমি চড়িয়ে এসেছি, কতক্ষণই বা লাগবে! আর— সবি, তোর আক্কেল বিবেচনা ত খুব, শুধু-মুখেই বাছাদের বিদেয় করে দিচ্ছিস্।

অনীতা দেবী সবিনয়ে কহিলেন—আপনার মেয়ের কোন দোষ নেই মা, আমাদের ভারি তাড়া আছে আজ। বিপুলাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছিলুম কি-না। আর একদিন এসে আপনার হাতের তৈরী চা খেয়ে যাবো।

আপন মনে গজগজ করিতে করিতে যশোদা দেবী রান্নাঘরের উদ্দেশে চলিলেন—এ কি রকম আসা হ'ল তা হ'লে? আজকালকার

মেয়েদের বাপু ধারাই আলাদা,—আর নিজের মেয়েরই বা কি আক্কেল বিবেচনা!

এই সাংঘাতিক দলটিকে লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইবার দিকে বিপুলের আগ্রহই সর্ব্বাধিক। সে-ই অগ্রবর্ত্তী হইয়া দরজার দিকে চলিল।

রাস্তার পার্শ্বে অনীতা দেবীর সুবৃহৎ মোটরখানি দাঁড়াইয়াছিল। সোফারের আসন শূন্য দেখিয়া বিপুলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, অনীতা দেবী নিজেই মোটর চালাইয়া আসিয়াছেন। কোন কথা না বলিয়াই সে সর্ব্বাগ্রে সোফারের স্থান গ্রহণ করিয়া স্টিয়ারিংটি চাপিয়া ধরিল।

শ্লেষের সুরে অনীতা দেবী প্রশ্ন করিলেন—এ বিদ্যেটিও জানা আছে নাকি?

বিপুল কহিল—আপনারা ভিতরে বসে পড়ুন, আমিই ড্রাইভ করছি। খুব পাকা না হ'লেও কোন রকমে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব বলেই মনে হয়।

মায়া হাসিয়া কহিল—পারেন ত শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় পঞ্চকন্যাকে পরপারে পাঠিয়ে নিজের সিচুয়েশ্যনটিকে সেভ্ করবেন মিস্ বিপুলা দেবী!

বিপুলের মুখে কথা নাই, তাহার হাতের চাপে মোটর তখন গতিশীল হইয়াছে।

ভিতর হইতে ঝুঁকিয়া আনীতা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যেতে হবে জানা আছে কি?

এই সময়টুকুর মধ্যেই মোটরখানি যেন বায়ুর সহিত পাল্লা দিয়া—শ্যামবাজারের সাংঘাতিক পাঁচ মাথার ক্রসিং পার হইয়া সার্কুলার রোডে

পড়িয়াছে। অনীতা দেবীর প্রশ্নে বিপুল ঘাড় নাড়িয়া কহিল—আপনার বাড়ীতে ত? সেইখানেই চলেছি; আর, শর্ট কাট আমার জানাও আছে, তাই সার্কুলার রোড ধরেছি।

মোটরখানা তখন অগ্রবর্ত্তী সমশ্রেণীর গতিশীল যানগুলিকে অতিক্রম করিয়া পূর্ণ বেগে ছুটিয়াছে। তরুণীর হাতে চালিত বৃহৎ মোটরখানির এই আশ্চর্য্য গতিবেগ পথচারীদের অন্তরে বোধ হয় বিস্ময়াবেগের দোলা দিতেছিল, আর মোটরের ভিতরে উপবিষ্টা তরুণী আরোহিনীরাও অবাক-বিস্ময়ে এই ছদ্মবেশীর হাতের বিচিত্র কৌশল লক্ষ্য করিতেছিলেন!

পাঁচ

পটলডাঙ্গার বাড়ীতে অনীতা দেবীর নিজস্ব মহলটির নিচের তলায় মিটিং-এর উদ্দেশে সাজানো ঘরখানির ভিতর কুমারী-সংসদের জরুরী বৈঠক বসিয়াছে। এই বৈঠকে শুধু সংসদের ভারপ্রাপ্ত সদস্যরাই আহূত হইয়াছে। সুতরাং গোল টেবিলখানির চারিপার্শ্বের অনেকগুলি আসনই পূর্ণ হয় নাই। বিপুলও বিপুলা দেবীর ছদ্মবেশে গোল টেবিলের এক প্রান্তে এমন একখানি চেয়ারে বসিয়াছে—যাহার উভয় পার্শ্বেই সংসদের কোন সদস্যই নাই, কয়েকখানি খালি চেয়ার পড়িয়া আছে।

সংসদের একটি জরুরী বৈঠক এবং বিপুলের ব্যাপারটি সম্পর্কে একটা হেস্তনেস্ত করাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। সংসদের অজ্ঞাতে বিপুলের আচরণ সম্বন্ধে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং সপারিষদ সভানেত্রী হাতে-নাতে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছেন, এই জরুরী বৈঠকেই তাহার নিষ্পত্তি একান্ত আবশ্যক। ব্যাপারটি গুরুতর বলিয়া সুবৃহৎ ঘরখানির বায়ুমণ্ডলও যেন গভীর হইয়া উঠিয়াছে, সভানেত্রী ও সম্পাদিকার মুখ দুইখানি রীতিমত গম্ভীর, অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যাদের মুখগুলিতেও তাহার ছায়া পড়িয়াছে, অন্তত প্রত্যেকেই গম্ভীর হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

সংসদের কাজ আরম্ভ হইতেই অনীতা দেবী কহিলেন—এই সংসদের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, আমাদের দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর দোষত্রুটি ছেড়ে গুণগুলিই আমরা গ্রহণ করি—হাঁস যেভাবে দুধটুকু শুষে নিয়ে জলটুকু ত্যাগ করে। আমাদের সংসদ হচ্ছে বাস্তব-পন্থী,

বাস্তবের পথ ধরেই চলতে অভ্যস্ত। সাধারণের সামনে মিথ্যা একটা আশ্বাস দিয়ে সংসদ যেমন হাস্যাস্পদ হতে চায় না, সংসদের সদস্যদের মধ্যে নিয়ম-ভঙ্গ বা অন্য কোন রকম অন্যায়ের সন্ধান পেলে সংসদের কর্তৃপক্ষ তেমনি কাজীর বিচার করে ভণ্ডামী করতেও নারাজ। বাস্তবপন্থী সংসদ সেই হাতে নাতে দোষীকে ধরে তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—সে কি অন্যায় করেছে। অপরাধী যদি জানাতে পারে—সংসদের আইন-কানুন বা লোকাচারের দিক দিয়ে সে অন্যায় করলেও আসলে তার উদ্দেশ্যটি ভাল, কোন বড় রকমের পরিকল্পনা তার সঙ্গে মিশে আছে, তা হ'লে সংসদ তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে নিজের আইনটাকেই পাল্টে দেবে। সংসদের বিশ্বাস, মানুষের বিচার-বুদ্ধি সীমাবদ্ধ, তাকে চূড়ান্ত বলা যায় না। আজ আমরা ভেবে চিন্তে যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করি, দুদিন পরে একটা উন্নত চিন্তার আলোকে স্পষ্ট দেখা যায়—ঐ সিদ্ধান্তই যথেষ্ট নয়, তারও দোষ ত্রুটি রয়েছে। এ অবস্থায়—গ্রহণ করা হয়েছে বলেই যে আগেকার ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তটাই চালু থাকবে তার কোন মানে নেই। নতুন চিন্তাধারাকেই তখন মেনে নিতে হবে। কুমারী-সংসদের বৈশিষ্ট্য এখানে। সংক্ষেপে সব কথাই আমার বলা হ'ল। আর এ সব কথা সংসদের সদস্যরা সকলেই জানেন। যে নতুন সভ্যটিকে 'কো-অপ্ট' করা হয়েছে, আর যার রহস্যজনক আচরণ আমাদের কতকগুলো জরুরী কাজের উপর একটা নতুন সমস্যা উত্থাপিত করেছে—তার জবাবদিহির আগেই সংসদের নীতিটি তাকে জানিয়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করছি।

নিবিষ্ট মনেই বিপুল সভানেত্রীর কথাগুলি শুনিতেছিল। সংসদের মেয়েগুলিও এতক্ষণ এই অভিযুক্ত ছেলেটির পানে তাহাদের বিস্ময়োৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহার নারীবেশ ধারণের অসামান্য নৈপুণ্যের তারিফ করিতেছিল মনে মনে। সভানেত্রীর বক্তব্য শেষ হইলে তাহাদের ঔৎসুক্য

এবার চঞ্চল হইল—অভিযোক্তা তাহার এই তরুণী-সজ্জার কি কৈফিয়ৎ দেয় তাহা শুনিবার জন্য।

ছেলেটি কিন্তু নির্ব্বিকার, তার মনের কোন অংশে কোনরূপ দুর্ব্বলতা মাথা তুলিবার অবকাশ পায় নাই, সুতরাং প্রসাধন-পরিচ্ছন্ন অনবদ্য মুখমণ্ডলের কোথাও কোনরূপ চাঞ্চল্যের ছায়াও পড়ে নাই। সাধারণত, অতি দক্ষ ছদ্মবেশীর রূপসজ্জাও কৌতূহলী দর্শকদের চক্ষুকে অধিকক্ষণ একই ভাবে আবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না—কোন না কোন ত্রুটি সুস্পষ্ট হইয়া অপ্রস্তুত করিয়া দেয়। কিন্তু এই ছেলেটি যদি ইহাদের পরিচিত না হইত এবং বালক-গোয়েন্দার মুখে ব্যাপারটি প্রকাশ না পাইত, এতগুলি আধুনিকা শিক্ষিতা ও সাহসিকা মেয়ের প্রখর দৃষ্টির আলোক-সম্পাতেও বোধ হয় তাহার অপূর্ব্ব ছদ্মবেশ ধরা পড়িত না—তাহাকে কোন মার্জ্জিত রুচি সম্ভ্রম-শীলা শিক্ষয়িত্রী বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইত। আধুনিক কোন ছেলের পক্ষে আধুনিকা মেয়ে সাজিয়া এতগুলি সপ্রতিভ মেয়ের মিলিত দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করা যে সামান্য দক্ষতার কথা নহে এবং এই রূপসজ্জা যে একটা উঁচুদরের কলা-বিদ্যা—সভানেত্রী অনীতা দেবীও তাহা মনে মনে উপলব্ধি না করিয়া পারেন নাই।

বিপুল আস্তে আস্তে আসনখানি ছাড়িয়া উঠিযা দাঁড়াইল; পরক্ষণে শ্রদ্ধা নিবেদনের ভঙ্গিতে হাত দুইখানি জোড় করিয়া ধীর ও সংযতস্বরে কহিল—শ্রদ্ধেয়া সভানেত্রী কুমারী-সংসদের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্বন্ধে যে কথাগুলি বললেন, আমার মনের পাতায় 'তার প্রত্যেকটি ছাপা হয়ে আছে, কাজেই এদের গুরুত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গেই আমাকে স্বীকার করতে হয়। আর, সংসদও যে তার সভ্যদের সম্বন্ধে রীতিমত সতর্ক—সর্ব্বত্র নিপুণ লক্ষ্য রাখেন আমার ব্যাপারে তার পরিচয় পেয়ে আমার শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধিই পেয়েছে। তবে সংসদ শুনে আশ্বস্ত হবেন যে, আমার এই ছদ্মবেশ

আর রহস্যজনক আচরণের মূলে এমন কোন বিশ্রী ব্যাপারের সংশ্রব নেই,—যাতে সংসদের সুনাম বা প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হতে পারে ; বরং এই ভেবে আমি মনে মনে গর্ব্ব বোধ করছি যে, সংসদেরই হাতের কাজ আমি অনেকটা এগিয়ে দিয়েছি। সে কাজটি কি—তারই কাহিনী আমি বলবার অনুমতি চাইছি।

গম্ভীর মুখে সভানেত্রী কহিলেন—ঐ কাহিনীকে আমারা কৈফিয়ৎ মনে করেই আগ্রহের সঙ্গে শুনতে প্রস্তুত আছি।

বিপুল তখন প্রসন্ন মনে ও উৎসাহ সহকারে তাহার কাহিনীটি বলিতে আরম্ভ করিল :

অবনী রায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁর বিবাহ হয়, আর—নিয়তির এমনি পরিহাস যে, দু'বছরের মধ্যেই ফল তার বিষময় হয়ে ওঠে। বধূ বাসনা দেবীর রূপ ছিল, মোটামুটি রকমের লেখাপড়াও শিখেছিলেন, উপরন্তু যে সব গুণ খুব ভাগ্যবতী গৃহস্থ-বধূর সৌন্দর্য্যকে নিখুঁত করে তোলে—বিধাতা বুঝি ওজন করেই সেগুলি তাঁকে দিয়েছিলেন। কিন্তু এমনি তাঁর অদৃষ্ট, তথাপি স্বামীর সংসারে না পেলেন সুখ্যাতি, না হ'ল তাঁর শেষ পর্য্যন্ত মাথা রাখবার একটু স্থান!

অবনী রায়ের একমাত্র অভিভাবিকা তাঁর বিধবা মা—দয়াময়ী দেব্যা। দুর্ভাগ্যক্রমে শাশুড়ীর নামটির সহিত প্রকৃতির কোন সামঞ্জস্য ছিল না। প্রচণ্ড তাঁর প্রতাপ, অমোঘ অপরিবর্ত্তনীয় তাঁর ব্যবস্থা। একবার যেটি সাব্যস্ত করবেন—সরকার বাহাদুরের অর্ডিনান্সের মতই তার আর নড়চড় নেই, তাঁর ক্ষুদ্র সংসারটির উপর চালু হবেই।

• বধু বাসনা দেবী দুর্ভাগ্যক্রমে দুঃখকে সাথী করেই বুঝিভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। মা তখন সদ্য বিধবা, সহায়হীনা; তাঁর আপনার বলতে ছিলেন জেঠা মহাশয়, নাম পশুপতি ঘোষাল। তিনিই দয়া করে বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই ছিল; কলকাতায় নিজের বাড়ী, চাকরী করতেন সরকারী আফিসে, মাইনেও ভাল পেতেন, নিজেও ছিলেন নিঃসন্তান। কাজেই বিধবা ভাইঝি আর তার একমাত্র সম্বল নবজাত মেয়েটি তাঁরই সংসারভুক্ত হয়ে পড়ে। শহরের আর দশজন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের মতই আদরে যত্নে বাসনা দেবী বিয়ের বয়সে এসে পড়েন। ঠিক সেই সময়ে তিনটি দিনের আড়াআড়িতে তাঁর বিধবা মা আর মাতামহী দুজনেই যেন পরামর্শ করে পরলোকের পথে পাড়ি দিলেন। দৌহিত্রীর মুখ চেয়ে ঘোষাল মহাশয়কে তখন পেনস্যন নিতে হল। শোকাশ্রু মুছে দৌহিত্রীও সংসারের হালটি হাতে নিলেন।

কিন্তু বছরখানেক পরেই তিনি বুঝতে পারলেন, নিজের সুবিধার দিকে চেয়ে নাতনীটিকে আর ঘরে আটকে রাখা চলে না। ফলে, বিয়ের সম্ভাবনায় ঢাকে কাঠি পড়লো। দয়াময়ী দেব্যার কানে তার বাদ্যটি মন্দ লাগল না, তলে তলে খবর নিয়ে জানলেন—বুড়োর টাকা আছে, বাড়ী আছে, মোটা পেনশ্যন পায়, এই নাতনী ছাড়া ওয়ারিস আর কেউ নেই। ঘোষাল মহাশয়ও দেখলেন—ছেলেটি দেখতে শুনতে ভাল, বি-এ পড়ছে, শ্যামপুকুর স্ট্রীটে নিজেদের বাড়ী, ভাই, বোন বা পোষ্য কেউ নেই। কাজেই মনে মনে পছন্দ করে আবেদন জানালেন—'আমার আর কে আছে, সবই ত বাসু পাবে। তবে ফর্দ্দা ফর্দ্দির কি দরকার? বেশী পীড়াপীড়ি করলে আমাকে বাড়ী বাঁধা দিতে হবে, তাতে বাসুর বাড়ীই বাঁধা পড়বে, আর জামাইকে গাঁটের পয়সা খরচ করে ছাড়াতে হবে।' কিন্তু দয়াময়ী

দেব্যা এই আবেদনের উত্তরে বেশ মিষ্ট করে যখন শুনিয়ে দিলেন—'বুঝছি ত সব, জানি—বউমার আঁচলে তার দাদুর বাড়ীখানা বাঁধাই আছে, আর সেইজন্তেই ত আপনার সঙ্গে কাজ করবার আমার এত ইচ্ছে। নইলে কত তাবড়-তাবড় লোক ত তুবেলা হাঁটা-হাঁটি করছে আমার ঘরে মেয়ে দেবার জন্তে। তারা জানে—আমি কি-ধাতের মানুষ, আর মেয়ে এঘরে পড়লে কত সুখে থাকবে। একটা ননদ পর্য্যন্ত নেই যে কুটোগাছটি নিয়ে যাবে; ভাসুর দেওরও নেই যে পরে ভাগ বসাবে। আর, আপনিও ত লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, হাত ঝাড়লে পর্ব্বত! তবে এখন যা দেবেন, দশজন লোক দেখবে শুনবে, বলবে—হ্যাঁ, মেয়ের বাপ নেই, মা নেই বটে, কিন্তু যা দিয়েছে—অন্তের পক্ষে পর্ব্বত! এই সব ভেবেই ফর্দ্দ আমাকে দিতে হচ্ছে; আর, আসল কথা কি জানেন—শুভকর্ম্মে দরদস্তরটা ভাল নয়, এক কথায় দু হাত এক হয় যাতে তাই করা উচিত। আমার কিন্তু এক কথা।'—কাজেই এ কথার উপর ঘোষাল মহাশয় কথা আর না বাড়িয়ে বিধবার কথা ও ফর্দ্দের মর্য্যাদা পুরোপুরিই বজায় রেখে দু-হাত এক করে দেন। বিবাহের পর বধূবরণ করে দয়াময়ী দেব্যা গর্ব্বিত-কণ্ঠে সকলকে জানিয়ে দিলেন—ফর্দ্দের তিনটে হাজার এ হচ্ছে ফাউ, আসল যৌতুক পিছনে পাকাপোক্ত হয়ে আছে, সে ত আর তুলে এনে দেখাবার নয়; গোয়াবাগানে বড় রাস্তার উপরে মস্ত বাড়ী—এ বাজারেও দাম তার তিরিশ হাজারের নিচে নয়।'

কিন্তু সম্বৎসরের মধ্যেই উভয়পক্ষের কথা, আশা, উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা সমস্তই ওলট-পালট হয়ে গেল। ছেলের আর বি-এ পাশ করা হ'ল না; ই, আই, রেলের আফিসে এক চাকরি পেয়ে তাতে

ভর্ত্তি হলেন। আর ছেলের মা বিয়ের পর থেকেই একেবারে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলেন আসল যৌতুকটিও হাতাবার আশায়—বধূর বৃদ্ধ দাদা মশাইটি কবে পরলোকের পথে পাড়ি দেন আর তাঁর গোয়াবাগানের বাড়ীখানা তাঁর হাতে এসে পড়ে। সম্বৎসরের ভিতর অন্তত সাতবার তিনি সদলবলে বাড়ীখানি পাতি পাতি করে দেখে যান, আর নিজের মনগড়া একটা পরিকল্পনার ছকও এঁকে রাখেন—কি ভাবে তার অদল-বদল করে বিভিন্ন অংশে চড়া হারে প্রজা বসিয়ে আয় বাড়াবেন। কিন্তু মনের ভিতরে গড়া এই আশার গাছটি হঠাৎ একদিন একটা পাকা খবরের দমকা হাওয়ায় সমূলে উৎখাত হয়ে গেল। বজ্রপাতের ভীষণ আওয়াজটির মত তাঁর কানে বাজল—বৃদ্ধ দাদামশাই পরলোকের পথে পাড়ি না দিয়ে ইহলোকেই আবার নতুন করে সংসার পেতে বসেছেন একটা ধেড়ে মেয়েকে গাটছড়ায় বেঁধে। আশাভঙ্গের সমস্ত ক্ষোভ পড়ল বধূ বেচারীর উপরে। বিয়ের পর থেকেই কারণে অকারণে শাশুড়ীর কথার আঘাত পড়ত অভাগিনীর মর্ম্মের উপরে, এখন থেকে তাঁর কোমলাঙ্গের চর্ম্মও তার নিষ্ঠুর হাতের পরশ পেতে লাগল। শেষে একদিন এই পীড়নটি এমনি সংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল যে, অন্তর্বত্নী বধূর অপমৃত্যুর সম্ভাবনাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। দাদামশাইকে জানান হল যে কলতলায় পড়ে গিয়ে তাঁর নাতনীর নাভিশ্বাস উঠেছে—দেখতে চান ত শীগগীর আসুন। খবর পেয়েই তিনি ছুটে এলেন, দেখলেন, নিচের একখানি ঘরে মাদুরের উপরে তাঁর স্নেহের নাতনী মৃতকল্প অবস্থায় পড়ে আছে, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নেই। জিজ্ঞাসা করলেন—'আমাকে খবর দিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন, ডাক্তার ডাকেন নি এখনও?' দয়াময়ী ঝাঁঝিয়ে জবাব দিলেন—'নাতনীর সঙ্গে ত আর গঙ্গামণ্ডল তালুক লিখে দেন নি

যে কথায় কথায় ডাক্তার ডাকব? মুরদ থাকে, তার ব্যবস্থা করুন; সেই জন্যেই ত আপনাকে ডাকা হয়েছে।' দাদামশাই এ কথায় কোন উত্তর না দিয়ে নাতনীকে তুলে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে, সেখানে চিকিৎসার জন্যে 'মেডিকেল বোর্ড' বসালেন বললেই চলে। নাতনীর জ্ঞান হতেই তার মুখে সব কথাই তিনি শুনলেন, তাঁকে অন্তর্ব্বত্নী জেনেও নিষ্ঠুর নির্য্যাতন চলে আর তারই ফলে তিনি সংজ্ঞা হারান, কলতলায পতনের কথাটা মিথ্যা। নিরীহ বৃদ্ধ এবার তপ্ত হয়ে উঠলেন, দয়াময়ীকে জানালেন—'আপনার বধূ-নির্য্যাতনের কথা আমি সব জেনেছি, আমি আপনাকে ছাড়ছি নে, আইনের আশ্রয় নেব; ডাক্তারদেরও এই মত।' দয়াময়ী কিন্তু দমলেন না একটুও, পাল্টা জবাবে জানালেন—'আইন আপনার একলার নয়, আমারও জানা আছে; আদালতও ঢের দেখিছি। আমাকে যদি ঘাঁটান, আমিও উল্টো রাস্তা ধরব, আদালতে হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে বলব—আপনার নাতনী খারাপ; মামলা সাজাতে আর সাক্ষী তৈরী করতে আমি জানি।' ভদ্র ঘরের বিধবার কথা শুনে দাদামশাই অবাক! তিনি আফিসে গিয়ে তাঁর ছেলেকে ধরলেন, মায়ের কথাগুলো শুনিয়ে দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এখন তুমি কি বলতে চাও?' ছেলে জানালেন—'মার কথার উপর আমার আর কোন কথা নেই, আমাকে মিছে জিজ্ঞাসা করছেন। আর, ব্যাপার যখন এতদুর গড়িয়েছে, আপনার নাতনীকে আপনার কাছেই রাখুন, আমি বরং লুকিয়ে কিছু কিছু সাহায্য করব আপনাকে।' দাদামশাই তখন বলেন—'তার চেয়ে আমি ভাবব যে আমার নাতনী বিধবা হয়েছে; যদি সে বেঁচে ওঠে, তাকে প্রতিপালন করতে কোন ছুঁচোর কাছে আমাকে হাত পাততে হবে না।' ছেলে বোধ হয় কথাগুলো মাকে শুনিয়েছিলেন, কেন না,

সেই ঘটনার পর মাসখানেকের মধ্যেই ঘটা করে ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে নতুন বউ এনেছিলেন তিনি, আর তার নিমন্ত্রণের চিঠিখানিও দাদামশাইকে পাঠাতে ভুল করেন নি।

এর পরই দাদামশাই কলকাতার বাড়ী বিক্রী করে তাঁর বৃদ্ধ বয়সের বধূ আর পুত্রবতী নাতনীটিকে নিয়ে কাশীবাসী হলেন। বিস্তর চিকিৎসার পর নাতনী ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পান, আর একটি প্রিয়দর্শন পুত্র সন্তান প্রসব করেছিলেন। কাশীর বাঙ্গালীটোলায় দাদামশাই একখানি বাড়ী কিনে তার একটা অংশ ভাড়া দিয়ে আলাদা একটি অংশে নতুন করে সংসার পাতলেন। কলকাতার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই আর তিনি রাখলেন না, দয়ামযী দেব্যা বা তাঁর ছেলে কস্মিনকালেও যাতে তাঁদের কোন সন্ধান না পান সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে তিনি পিছনের সমস্ত নিদর্শনগুলিই নিশ্চিহ্ন করে ফেললেন; এমন কি, পেনশুনের বরাদ্দ টাকা এককালীন অগ্রিম তুলে নিয়ে আফিসের সঙ্গে নামের সংস্রবটুকুও মুছে দিলেন। অবশ্য, দয়াময়ী দেব্যা বা তাঁর ছেলের পক্ষ হতেও কোন দিন কোন রূপ তদন্তের কথা শোনা যায় নি। নাতনীর ছেলেটিই সংসারের তিনটি প্রাণীর মনমঞ্জরী মনোরম ক'রে তুলছে দেখেই দাদামশাই আদর করে তার নাম রাখেন মুকুল। বাসনা দেবীর ব্যর্থ জীবন চাঁদের কণার মত মনপ্রাণ আলো-করা ছেলেটিকে কোলে পেয়ে কতকটা সার্থক হ'ল। সেই সঙ্গে এমন একটা আশায় তাঁর অন্তরটি অন্যের অজ্ঞাতে দুলে উঠল যে, এই ছেলেই হয়ত একদিন দুটি বিচ্ছিন্ন জীবনে মিলনগ্রন্থী বেঁধে দেবার উপলক্ষ হবে। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুর ভাগ্য অনাগতের প্রতীক্ষার সুযোগটুকু থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করে দিলেন চরম নিষ্কৃতি। তিন বছরের শিশুটিকে দাদামশায়ের কোলে তুলে দিয়ে তিনি চিরদিনের মত চোখ বুজ্‌লেন একদিন।

বৃদ্ধ ও তাঁর তরুণী পত্নী শিবানী দেবীর স্নেহের আবেষ্টনে শিশু মায়ের অভাব উপলব্ধি করবার সুযোগটুকুও পেল না। চারখানি হাত সর্ব্বক্ষণই তার পরিচর্য্যায় প্রস্তুত থাকে, দুই জোড়া চোখ আর দুটি স্নেহাতুর অন্তর সর্ব্বক্ষণ তাকে ঘিরে রাখে। দুজনেরই দৃঢ় সঙ্কল্প—ছেলেটিকে মানুষের মত মানুষ করে তুলতে হবে। পাঁচ বছরে পড়তেই ছেলের পড়ার পাঠ শুরু হল। সাত বছর বয়সে সে বোধোদয় শেষ ক'রে বাহবা পেলে। দাদামশায়ের সখ হল—ছেলেকে সব রকমে পাকা-পোক্ত করে দুনিয়ার বাজারে ছেড়ে দেবেন—যেন কোথাও না হোঁচট খেয়ে লোক হাসায়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলল নানা রকম খেলা আর দেহের কসরত। কামাচ্ছার হিন্দু স্কুলে ছেলেকে ভর্ত্তি করে দেওয়া হ'ল—নানা দেশের নানা সম্প্রদায়ের ছেলেদের সঙ্গে মিশে ছেলে বেশ চৌকশ হবে বলে। বাঙ্গালী, মারাঠী, খোট্টা, মাদ্রাজী, নেপালী, সিন্ধী, রাজপুত, পাঞ্জাবী, বিহারী, আসামী, বিলাসপুরী প্রভৃতি নানা প্রাদেশিক ছেলে বোর্ডিং-এ থেকে এই স্কুলে পড়ে। পড়াশুনায় মুকুল ক্লাসের সেরা ছেলে, গোড়া থেকে ডগা পর্য্যন্ত কোথাও সে পিছিয়ে পড়ে নি—এগিয়ে গেছে বরাবর। তা ছাড়া খেলার ব্যাপারে গায়ের জোরেও সে দুর্ব্বার। যতবার দৌড়ের বাজি হয়েছে, সে পেয়েছে প্রথম সম্মান। টিকরী ঘাট থেকে দশাশ্বমেধ পর্য্যন্ত তের মাইলের সাঁতার-বাজিতে সবাইকে হারিয়ে মুকুল পায় ফার্স্ট প্রাইজ। অথচ বয়সের দিক দিয়ে প্রতিযোগীদের মধ্যে সে এত ছোট আর চেহারা তার এমন পাতলা আর ছিপছিপে যে—কেউ ভেবে স্থির করতে পারে না, এ ছেলে কেমন করে সবার উপরে উঠে বাহবা পেলে। স্কুলের বর্ষোৎসবে ছেলেদের অভিনয়ে মুকুল নেচে গেয়ে রঙ্গরসের প্রবাহ তুলে হাজার হাজার শ্রোতাকে

মাত্ করে দেয়, আর কত রকমের কত মেডেল যে পেয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই।' স্কুলের অ্যাডমিসন পরীক্ষা দেবার সময় বয়সের অনুপাতে সে রেকর্ড ভেঙ্গে দেয়। তার মত কম বয়সে কোন ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষার দরজা পার হতে পারে নি। তারপর, যে বয়সে সে আই-এ পাস করে বি-এ পড়া শুরু করে,—কাশীর বেশীর ভাগ ছেলেই সেই বয়সে অ্যাডমিসনের পড়া তৈরী করতে থাকে। কাজেই মুকুল ছেলেটি কাশীর মধ্যে একটা দৃষ্টান্তের মত হয়ে দাঁড়ায়। দাদামশায়ের আনন্দ আর ধরে না, আশা তাঁর কাণায় কাণায় পূর্ণ হয়েছে, তাঁর স্নেহের নাতনীর স্মৃতি-চিহ্নটিকে তিনি মানুষ করে তুলেছেন—এতবড় শহরের মধ্যে সে ছেলের নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। তাঁর শেষ আশা—এম-এ পাস করলেই তাকে বিদেশে পাঠাবেন শিল্প শিক্ষার জন্য। চাকরির ঘানিতে এ ছেলেকে তিনি কিছুতেই জুড়ে দেবেন না, কৃতবিদ্য হয়ে ফিরলে তাকে দিয়ে কাশীতে রেশম তৈরীর একটা ফ্যাক্টরী খুলবেন।

কিন্তু শেষের সাধটি তাঁর পূর্ণ হবার আগেই হঠাৎ একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। বেশী সুদের লোভে কাশীর যে নামী মহাজনী-গদিতে সঞ্চিত টাকাগুলি দাদামশায় জমা রেখেছিলেন, একদিন হঠাৎ লাল বাতি জ্বালিয়ে তার মালিক দেউলে আদালতের আশ্রয় নিল। আবার সেই সময় অনেক দিন আগের কেনা বাড়ীখানির উপর দাবী জানিয়ে তিনটে নতুন শরিক আদালতের মারফতে হুমকি দিল। বাড়ী যাঁরা বেচেছিলেন, এঁরা তাঁদেরই শরিক-গোষ্ঠী, তখন নাকি নাবালক ছিলেন,' তাই কোন সাড়া দেন নি, এখন সাবালক হয়ে চোখে আইনের আঙুল দিয়ে আক্কেল-সেলামি আদায় করতে চান। দাদামশাই লোকটি বরাবরই ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে শান্তিতে থাকতে

ভালবাসেন, ঝগড়াবিবাদ বা অশান্তির ঝক্কি বইতে একদম নারাজ। কাজেই হাঙ্গামাকে না বাড়িয়ে বিবাদীদের সঙ্গে রফা ক'রে ফেললেন— বাড়ীর আধখানা তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে। ফলে সঞ্চয় বলতে আর হাতে কিছু রইল না তাঁর, বাড়ীর যে অংশটুকু ভাড়া দিয়ে তারই আয়ে সংসারটি চালাতেন, সেটিও হাত থেকে সরে গেল। মুকুল বেচারীকে এ অবস্থায় পড়ার খরচটুকু চালাতে ছেলে-পড়ানো-পেশার আশ্রয় নিতে হল। তার নাচ গানের ও ব্যায়ামের বিদ্যাগুলি এ সময় কাজে লেগে গেল। লেখাপড়ার সঙ্গে নাচগানও যদি শেখাতে পারে, তা হ'লে সে-রকম শিক্ষকের পসার খুব শীঘ্রই বেড়ে যায়। মুকুলের অদৃষ্টেও এর ব্যতিক্রম হয নি। এইভাবে সকাল-সন্ধ্যে তিন চার জায়গায় দিন-মজুরী চালিয়েও মুকুল শেষে 'অনার্স' নিয়ে বি, এ, পাস করে ফেলল।

কিন্তু এ-খবরটি যখন দাদামশায়ের কানে পৌঁছাল, শিবলোকের মুক্তির আলোয় তাঁর চোখ দুটি তখন জ্বলজ্বল করছে। আশা ভঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেহটিও তাঁর ভেঙ্গে গিয়েছিল। গৃহিণী তাঁর গায়ের গয়নাগুলি একটি একটি করে খুলে দিয়েছিলেন শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর চিকিৎসা চালাতে। এখন কি ক'রে শ্রাদ্ধের পাটটি সমাধা হবে সেইটিই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। বিধবা দিদিমা সেই অবস্থাতেই এক হাতে চোখের জল মুছে, আর হাতে তাঁর সিন্দুক থেকে বাড়ীর দলিলখানি বার ক'রে মুকুলের হাতে দিয়ে বললেন—'বাড়ীখানা বন্ধক দিয়ে পাঁচশো টাকা যেমন ক'রে হোক যোগাড় করতে হবে দাদা, তিনশো টাকা তাঁর কাজে খরচ হবে। বাকিটা তোমার নামে সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখবে। ঐ টাকা থেকে তোমার এম-এ পড়ার খরচ চলবে। এর পর রোজগার করে বাড়ী তুমি খালাস ক'রো দাদা। এ

'তাঁরই ইচ্ছা জেনো, কোন তর্ক তুলো না, লক্ষ্মীটি।' এমন মিনতির সুরে সদ্যবিধবা পরলোকগত স্বামীর ইচ্ছাটির উপরে জোর দিয়ে অনুরোধটি জানালেন যে মুকুল প্রতিবাদের কোন ভাষা খুঁজে পেল না। একখানা পুরু লম্বা লেফাফার ভিতরে দলিলখানা ছিল ; খামের উপ'রে দাদামহাশয় লিখে রেখেছিলেন—'দেবনাথপুরার বাড়ীর মূল দলিল মায় আদালতের সোলেনামার সমস্তই এতে আছে।' সেখানি হাতে করে মুকুল টাকার সন্ধানে বেরুল।

মুকুল ভেবেছিল, বাড়ীর দলিল দেখিয়ে টাকা চাইলে কেউ 'না' বলবে না। যে কয় বাড়ীতে সে টুইশানি করে, তাঁদের প্রত্যেকেই বড়-লোক, পাঁচশো টাকা তাঁদের কারুর পক্ষেই বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু প্রস্তাবটি শুনে প্রত্যেকেই মৌখিক সহানুভূতি দেখিয়ে টাকার ব্যাপারে মুকুলকে হতাশ করে দিলেন। যুক্তি সবারই যেন একই সুরে বাঁধা—'সামান্য টাকার জন্যে বাড়ী বাঁধা রাখবার দরকার হত না, তুমি হচ্ছ আমাদের স্নেহের পাত্র, শুধু হাতেই দিতাম ; কিন্তু কথা এই—টাকা ত হাতে নেই। আর কারুর কাছ থেকেধার-ধোর করে কাজটি সেরে ফেল, পরে তখন দেখা যাবে।' এঁদেরই মধ্যে একজন একটি নাম আর ঠিকানাটি দিয়ে বললেন—'ভারি সদাশয় লোক, পেনস্যান-নিয়ে বছর কয়েক হ'ল কাশীতে এসে বাস করছেন ; লোকের দায়ে-ঘায়ে মহাজনী করেন, বিশেষ পিতৃমাতৃদায় বা কন্যাদায় হলে আর কথা নেই। দলিলখানি নিয়ে তাঁর কাছে যাও, কাজ হবে।'

আশার ক্ষীণ আলোটি ধরেই মুকুল সেই সদাশয় মানুষটির সন্ধানে চলল। তাঁকে দেখবামাত্রই মুকুলের মনে হল যেন তার দাদামহাশয়েরই আর এক সংস্করণ। মুখখানি প্রশান্ত, দেহটি যষ্টির মত সোজা ও দীর্ঘ, এক জোড়া পুরু পাকা গোঁফ আর সেই অনুপাতে ঢেউখেলানো

দাড়ি তাঁর লম্বা দেহটির সঙ্গে দিব্য খাপ খেয়েছে। মুখের হাসি পাকা গোঁফ জোড়াটির ভিতর দিয়ে ভাসা ভাসা ছুটি চোখে ফুটে উঠছে। মানুষটি যেমন পরিষ্কার, ঝরেঝরে, তাঁর বাইরের ঘরখানিও তেমনি তকতক করছে। তক্তাপোষে বিছানো সাদা ধবধবে ফরাসটির উপরে বসে তিনি সে দিনের খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

মুকুলের মনে হ'ল, তার মুখখানার উপরে নজর পড়তেই গৃহস্বামীর চোখ ছুটো যেন বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠলো, প্রায় একটি মিনিট তার পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। পরক্ষণেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, ছোকরা দায়গ্রস্ত হয়ে এসেছে। তক্তপোশের পাশেই একখানা টুল খালি পড়েছিল, সেখানি দেখিয়ে বললেন—'হাতের আসনখানি ওর ওপরে বিছিয়ে ব'স, এতে দোষ নেই।'

দাদামহাশয়ের বিয়োগে মুকুল অশৌচ গ্রহণ করেছিল, কম্বলের আসনখানি তার সঙ্গেই ছিল। টুলখানি একটু টেনে আসনটি তার উপরে পেতে বসতেই বৃদ্ধ সমবেদনার দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বললেন —'অবস্থা ত দেখেই বুঝেছি, এখন ব্যবস্থার কথাটা সংক্ষেপে বলে ফেল শুনি।' এমন সহজভাবে মুকুলকে তিনি গ্রহণ করে কথাগুলি বললেন, যেন এই ছেলেটির সঙ্গে তাঁর কতদিনের পরিচয়।

মুকুল অবাক হয়ে বৃদ্ধের মুখখানা আর একবার ভাল করে দেখে নিল। সে যে এই অপরিচিত মানুষটির সংস্পর্শে আজই প্রথম এসেছে, এর আগে আর কোন দিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'য়েই বুঝল যে, বৃদ্ধের সম্বন্ধে যে-সব প্রশংসা সে শুনেছিল, মিছে নয়। খুব সহৃদয় না হ'লে কোন দায়গ্রস্ত আগন্তুককে এমন সহজ ভাবে কেউ গ্রহণ করতে পারেন না। তখন মুকুলের মনে এই চিন্তাটাই বড় হয়ে উঠল—কি ভাবে সে এই সদাশয় অপরিচিত মানুষটির কাছে

তার প্রস্তাবটি উত্থাপন করবে। কিন্তু গৃহস্বামীই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রশ্ন তুলে তার চিন্তার ভারটী হাল্কা করে দিলেন।

—তোমার নাম?

মুকুল মৃদুস্বরে উত্তর দিল—শ্রীমুকুল রায়।

পুনরায় প্রশ্ন হ'ল—কি করা হয়?

মুকুল বল্‌ল—পড়ি।

—কোন্ ক্লাসে?

একটু হেসে মুকুল উত্তর দিল—আমি এবার বি-এ পাশ করেছি।

গৃহস্বামীর মুখে বিস্ময়ের রেখাটি স্পষ্ট হয়ে উঠল, বদ্ধ দৃষ্টিতে মুকুলের মুখের পানে চেয়ে বললেন—রোস, মনে পড়ছে বটে—'আজ' কাগজে যেন এই নামটাই পড়েছি, এত কম বয়েসে এর আগে আর কোন ছেলে হিন্দু ইউনিভারসিটি থেকে বি-এ পাশ করতে পারে নি। এ ছাড়া আরও লিখেছে—

মুকুল একটু হেসে নিজেই কথাটা শেষ করে দিল—'ছেলেটি শুধু পড়াশুনায় নয়, সব বিষয়েই ওস্তাদ—তেরো মাইল রেসে ফার্স্ট প্লেস পায়, অভিনয় ক'রে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়'—'আজ' কাগজে এ সবও ছাপা হয়েছে। আমিও পড়েছি, আর সবিনয়ে স্বীকার করছি —সেই ছেলেটিই দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুখখানা আরও একটু তুলে, আর পাকা গোঁফজোড়াটি হাসির আভায় আলো করে গৃহস্বামী বললেন—'বা! খাসা চটপটে ছেলে ত তুমি।'

সঙ্গে সঙ্গে চাপা কণ্ঠে আপন মনেই বললেন—'এদিকেও কিন্তু আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য!'—বলেই তিনি মুকুলের মুখের উপরে পুনরায় তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

শেষের কথা কয়টি অস্ফুট হলেও মুকুলের মত চতুর ছেলের শ্রবণ-শক্তিকে এড়াতে পারে নি।

কিন্তু এ সম্বন্ধে চোখে মুখে কোন রকম কৌতূহলের চিহ্ন প্রকাশ না ক'রে সে নীরবেই গৃহস্বামীর দ্বিধা-প্রসন্ন মুখখানির দিকে চেয়ে রইল। একটু পরেই তিনি সহানুভূতির সুরে বললেন—'তোমার অদৃষ্টে দেখছি সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্য পাশাপাশি চলেছে। পাশের খবরের সঙ্গে সঙ্গেই মহাদায়! কে গত হয়েছেন?'

মুকুল উত্তর করল—সম্পর্কটা দূরের, আমার মাতামহীর জেঠামশাই। কিন্তু তিন কূলে তিনিই ছিলেন আমার সর্ব্বস্ব, আমি তাঁকে 'দাদু' বলতুম।

—বাপ নেই?

—জানি না।

কথাটা শুনেই ভুরুদুটি বেঁকিয়ে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'তার মানে?'

মুকুল সহজকণ্ঠেই বলল—'মানে শুনলে আপনি হয় ত ব্যথাই পাবেন। আমার মাতামহী বিধবা হবার পর আমার মাকে কোলে করে তাঁর নিঃসন্তান জেঠামশায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নিজের মেয়ের মতই তিনি তাঁকে গ্রহণ করেন। যথাকালে তাঁর কোলের মেয়েটি বড় হলে ভাল ঘরে বিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের অদৃষ্টের ছোঁয়াচ পেয়ে তিনিও এই হতভাগ্যকে কোলে করে মায়ের মতই অসহায় অবস্থায় মাতামহের আশ্রয়ে গেলেন। তারপর আমার জ্ঞানোদয়ের আগেই যে দুটি মহাপ্রাণের কোলে তুলে দিয়ে তিনি পৃথিবীর ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে চলে যান, জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে জানতে পারি—সেই দুটি মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে আপনার বলতে আর আমার কেউ নেই। আবার

এমনি ভগবানের খেলা, সর্ব্বহারা এই ছেলেটি তাঁদের পক্ষেও একমাত্র শিবরাত্রির সলতে। আর আমার সেই স্নেহময় অভিভাবকটি ছোট একখানি বাড়ীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী-অর্থাৎ আমার 'দিদা'কে রেখে কাশী লাভ করেছেন। সম্বল বলতে এই বাড়ীখানি ছাড়া আর কিছু নেই। দিদার একান্ত ইচ্ছা, বৃষোৎসর্গ ক'রে শ্রাদ্ধটি সম্পন্ন হয়, আর আমি এম-এ পড়া শুরু করি—এটি নাকি দাদুরই অন্তিম ইচ্ছা। এই ইচ্ছা দুটো পূর্ণ করতে অন্তত পাঁচশো টাকার দরকার। দেবনাথপুরার বাড়ীখানি দাদু সাড়ে পাঁচ হাজার টাকায় কিনেছিলেন, তার অর্দ্ধেক ছেড়ে দিতে হয়েছে নাবালকের সম্পত্তি না-জেনে কিনেছিলেন ব'লে, বাকি অংশটুকুর নির্ব্যূঢ় সত্বে তিনিই ছিলেন একমাত্র মালিক, তাঁর অবর্ত্তমানে আমার দিদাই দানবিক্রীর অধিকারিণী। এই খামখানির ভিতরেই এই বাড়ীর সম্পর্কে সমস্ত কাগজপত্তর ও রেজিস্টারী-করা দলিল আছে। এখন আপনার কাছে বাড়ীখানি বন্ধক রেখে আমার দিদা পাঁচশো টাকা ধার চান। দলিলপত্র দেখে, সার্চ্চ করে সন্তুষ্ট হয়ে আপনি যদি রাজি হন, তিনি দলিল রেজেস্টারী করে দেবেন। এই প্রস্তাবটি নিয়েই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

গৃহস্বামী নিবিষ্ট মনেই কথাগুলি শুনছিলেন। মুকুলের কথা ফুরুতেই একটু হেসে বললেন—'এমনি কিছু প্রস্তাব যে তুমি তুলবে, তোমাকে দেখেই সেটা বুঝেছিলুম। মানুষ আমার কাছে টাকার সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কে বড় একটা আসে না। মানুষের মুখ দেখলেই আমি বুঝতে পারি, সে কি বলবে। তার পায়ের শব্দ শুনে আমি গণৎকারের মতই বলতে পারি কি মতলব নিয়ে সে আসছে। আর, তুমি ত দরখাস্তখানা চেহারার উপরে স্পষ্ট করেই লিখে এনেছ হে! ভাল দেখি দলিলখানা—'

বলতে বলতেই তিনি মুকুলের দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে লম্বা লেফাফাটি টেনে নিলেন। লেফাফার উপরে মুকুলের দাদুর নাম ঠিকানাও লেখা ছিল। সেটি নজরে পড়তেই চোখের ভুরু দুটি কুঁচকে বললন,—'নামটি যেন চেনা চেনা কিম্বা খুব শোনা বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আমার কাছে এখন এখানা থাক, খাওয়া দাওয়ার পর দলিলখানা দেখে রাখব'খন। তুমি বিকেলের দিকে বরং এস। ভয় নেই, লোককে মিছিমিছি হাঁটানো আমার অভ্যেস নেই, হেস্তনেস্ত যাহোক একটা আজই করে ফেলা যাবে; বেলা হলো, তুমি এখন এসো।'

মাথাটি নিচু করে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে মুকুল বেরিয়ে এল। টেরিনিমের জনবিরল রাস্তা ধরে বরাবর বিশ্বনাথের মন্দিরের জনপূর্ণ সরু পথটির উপর পড়তেই হঠাৎ তার হুঁস হল—তাই ত' দলিলখানা ছেড়ে দিয়ে এল, একটা রসিদও নেওয়া হল না, বৃদ্ধও কিছু বললেন না ত! দলিলের লেফাফাটি নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরই ত উচিত ছিল রসিদখানা লিখে দেওয়া। মুকুলের মনে একটা ইচ্ছা দোলা দিল—সে ছুটে গিয়ে বৃদ্ধের কাছ থেকে দলিলখানা রাখবার একটা রসিদ লিখিয়ে আনে। কিন্তু পরক্ষণে বৃদ্ধের প্রসন্নমূর্ত্তি, অমায়িক আচরণ এবং সহানুভূতিমাখা সরস কথাগুলো মনে পড়তেই আগের ইচ্ছাটি মনের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। নিজের মনেই সে বলে উঠল—এ রকম মানুষকে সন্দেহ করা ঠিক নয়। এ লোক শুধু লোকের ভাল করতেই জানে; মন্দ কখন করে না, করতে পারে না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই সে দশাশ্বমেধের রাস্তায় প'ড়ে সামনেই ভূতেশ্বরের গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল—বাঙ্গালী-টোলার ভিতর দিয়ে দেবনাথপুরায় পৌছবার জন্যে।

এদিকে মুকুল বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় লেফাফাখানিকে বাঁধনমুক্ত করে তার ভিতর থেকে দলিল-পত্রগুলি টেনে বার করলেন। মূল দলিল ও পরবর্ত্তী সোলেনামাখানা পড়ে বুঝলেন যে, ছেলেটি বাড়ী সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলে গেছে, দলিলের বয়ানের সঙ্গে তার কোন গরমিল নেই। কিন্তু শেষের দিকে দলিলের সঙ্গে পাকানো শক্ত সুতো দিয়ে গাঁথা দলিলের মতই কয়েক খণ্ড ডেমি কাগজে লেখা একরারনামাটি আগাগোড়া পড়তেই তাঁর মুখখানা অস্বাভাবিক রকমে গম্ভীর হয়ে উঠল। খানিকক্ষণ চুপ করে গুম হয়ে বসে থাকবার পর তিনি নথি থেকে সেগুলি খুলে নিয়ে নথির দলিলপত্রগুলি খামখানির ভিতরেই আগেকার মত ভরে রাখলেন। শেষের কাগজগুলি একটা ক্লিপে গেঁথে আর একবার পড়বার জন্যে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, এমন সময় ঘরের ভিতরের দিকের দরোজাটি খুলে একটি মেয়ে তক্তপোষটির পাশে এসে দাঁড়াল, তারপর হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল—কে এসেছিল দাদু?

বাঁশীর মত মিষ্ট সুরটি কয়টি কথার ভিতর দিয়ে দাদুর কানে ঝঙ্কার দিতেই তাঁর গোঁফ জোড়াটিও বুঝি হাসির গমকে ফুলে উঠল। হাতের কাগজগুলির উপর থেকে চোখ দুটি তুলে মেয়েটির মুখের পানে একটু বাঁকা করে ফেলে বললেন—একটি ছেলে; বয়েস, চেহারা, গায়ের রং, চোখের ভাব, মুখের হাসি—সবগুলিই যার তোমার মতন দিদি! ভারি আশ্চর্য্য নয় কি?

মেয়েটি বলল—দিদিমণিও ঠিক এই কথা বলছিলেন—বাইরের ঘর থেকে খালি পায়ে একটি ছেলে বেরিয়ে গেল, দেখতে হুবহু তোর মতন সাবি! আমি ত সেই কথা শুনেই তাড়াতাড়ি

ভিজে কাপড়খানা ছেড়ে ছুটে এসেছি। ছেলেটির নাম কি বলত দাত্ব ?

দাত্ব বললেন—মুকুল রায়, চিনিস নাকি রে ?

সবিতা একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল—এবার বুঝিছি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নাতনীর মুখের পানে চেয়ে দাত্ব জিজ্ঞাসা করলেন—বুঝিছি মানে ?

সবিতা আস্তে আস্তে বলল—ছেলেটিকে না দেখলেও ওর নামটি শুনেছি। কাশীর মধ্যে ও যে সবচীন ছেলে, যাকে বলে সব দিক দিয়েই ওস্তাদ। আমাদের ইস্কুলের মেয়েরা সেদিন বলছিল—ছেলেটিকে দেখতে নাকি হুবহু আমার মতন। তাদের ধারণা—ও আমার ভাই না হয়ে যায় না। মুখের আদল আর পদবী যখন একই, তখন আর কথা কি! তাদের কথা শুনে আমি একেবারে অবাক।

চোখ দুটি পাকিয়ে নাতনীর পানে তাকিয়ে দাত্ব জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেটিকে দেখবার সাধও তাহলে হয়েছিল বল ?

মুচকি হেসেই মেয়েটি জবাব দিল—খুব। সেই জন্যেই ত ছুটে এসেছিলুম দেখতে, আর জিজ্ঞাসা করতে—আমার মতন চেহারা সে কোথায় পেলে ?

দাত্ব এবার মুখখানা একটু ভার করে বললেন—ছেলেটি এ-ঘরে ঢুকতেই চেহারা দেখে আমিও চমকে উঠেছিলুম। তারপর আলাপ পরিচয় হতে নিজেকেই সামলে নিই। এখন কিন্তু বুঝতে পারছি—চোখগুলো সব সময় ভুল করে না। তোমার স্কুলের মেয়েরা ছেলেটির সম্বন্ধে যা বলেছে, মিথ্যা নয় দিদি, ও সত্যিই তোমার ভাই।

সবিতার মুখের স্বাভাবিক হাসিটুকুর উপর বিস্ময়ের রেখা প'ড়ে তার মুখখানির আর এক অপরূপ শ্রী ফুটিয়ে তুলল। স্থির দৃষ্টিতে

কিছুক্ষণ দাদুর পানে চেয়ে থেকে সে বলে উঠল—আমার ভাই! কিন্তু কি করে হতে পারে? এ যে অসম্ভব!

হাতের লেখা কাগজ ক'খানি সবিতার হাতে দিয়ে দাদু গলার স্বর একটু গাঢ় করেই বললেন—এগুলো পড় দিদি, তাহলেই সব বুঝতে পারবে। ভয় নেই, দলিলের মত দেখতে হলেও, ব্যাপারটি তোমাদের মাসিকপত্রের ছোট গল্পের মতই খাসা। তফাতের মধ্যে সে সব রচা, এ হচ্ছে বাস্তব।

* *
*

বিকেলের দিকে সকালের সেই পরিচিতঘরখানিরভিতরে ঢুকেই মুকুল দেখল, গৃহস্বামী মাথা নিচু ক'রে নিবিষ্টমনে খবরের কাগজ পড়ছেন, আর তাঁর তাকিয়াটির পাশেই দলিল-ভরা লম্বা লেফাফাটি পড়ে আছে। মুকুলের মনে যে চিন্তাটুকু দোলা দিচ্ছিল, পরিচিত বস্তুটি দেখেই পলকে থেমে গেল।

পায়ের শব্দ শুনেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় সোজা হয়ে বসে ঈষৎ হেসে বললেন—এসেছ, বাবাজী! বোস।

সকালের মতই মুকুল যথাস্থানে যথাযথভাবে বসল, সেই সঙ্গে তার বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করে উঠল গৃহস্বামী কি সাব্যস্ত করেছেন, সেটুকু শোনবার জন্য। তবে এবেলার মধুর সম্ভাষণটি তার মনে কিঞ্চিৎ আশাও যে না দিল তা নয়।

মিনিট দুই তিন দুজনেই নীরব; তারপর গৃহস্বামী হঠাৎ কাগজখানা সরিয়ে রেখে মুখখানা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন মুকুলকে—আচ্ছা, একটা কথার ঠিকঠাক জবাব আমাকে দেবে? তোমার মা

তোমাকে কোলে করে এখানে এসেছিলেন, না-এখানে আসবার পরে তুমি তাঁর কোল আলো করেছিলে ?

প্রশ্নটা শুনেই মুকুল অবাক হয়ে কিছুক্ষণ গৃহস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখখানার পানে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ যে তাকে এ রকম একটা প্রশ্ন করা হবে তা সে ভাবতেই পারেনি, তা ছাড়া প্রশ্নের বিষয়টি তার নিজেরই ঠিক মত জানা নেই। একটু পরে ভাঙ্গা গলায় সে জবাব দিল—মার কথা আমার মনে পড়ে না, জ্ঞান হয়ে অবধি দাদু আর দিদাকেই দেখিছি। মার সম্বন্ধে দাদুর কাছে যেমন শুনেছি, তাই আপনাকে বলেছি। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বলুন ত ?

গৃহস্বামী গম্ভীরমুখে বললেন—টাকা-পয়সার ব্যাপারের গোড়াতে কথার ব্যাপারটাই যে কষ্টিপাথর হে, তা বুঝি জান না ? নিজের সম্বন্ধে ওবেলা যা বলেছিলে, ক'ষতে গিয়েই ভুলটুকু ধরা পড়েছে কি না, তাই প্রশ্নটা তোলা হয়েছে, বুঝলে ? তুমি কি তাহলে বলতে চাও, দাদু তোমাকে বরাবর অন্ধকারেই রেখেছিলেন, নিজের জন্মস্থান, বাপ, মা, বংশ—এ সবের কিছুই তোমাকে বলেন নি ?

ম্লান মুখে মুকুল বলল—যেটুকু আমার জানা দরকার তাই জানিয়েছিলেন। আমার অভাগিনী মায়ের দুর্গতির কথা তুলে শুধু এইটুকু বলেছিলেন, মাথার উপরে ভগবান আর তাঁরা দুজন ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কেউ আপনার বলতে নেই।

—বাপের সম্বন্ধে কিছু জানতেও আগ্রহ হয়নি ?

—না। আমার মায়ের প্রতি তাঁর ব্যবহারের কথা শুনে আমার মনে কোন আগ্রহই তাঁর সম্বন্ধে হয়নি।

একটু থেমে বৃদ্ধ পুনরায় প্রশ্ন করলেন—তোমার দাদুও কোন কথা বলেন নি ? বাপের নামও শোননি তাঁর মুখে কোন দিন ?

মুকুল এবার বেশ শক্ত হয়ে জবাব দিল—দাদু নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আমার বাবার নাম তিনি উচ্চারণ পর্য্যন্ত করবেন না। কিন্তু স্কুলের ব্যাপারে নামটি তাঁকে জানাতে হয়েছিল, অবশ্য মুখে উচ্চারণ ক'রেন নি, কিন্তু কাগজে লিখে দিয়েছিলেন।

—সে নামটি শুনতে পাইনা?

—আশুতোষ রায়।

নামটি শুনেই বৃদ্ধ হাসতেহাসতে বললেন—তোমার দাদু এখানে হাত ঘুরিয়ে নাকটি দেখিয়েছিলেন। তোমার বাপের নামে তিনি গলদ করেন নি, তবে প্রচলিত ডাক-নামটি চেপে রেখে রাশিগত নামটি জানিয়েছিলেন তোমাকে।

স্বপ্নাবিষ্টের মতন গৃহস্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুকুল বলল—আপনার কথা শুনে আমি কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি, ভেবে পাচ্ছিনা, যে-সব কথা আমিও জানিনা—আপনি কি করে জানতে পারলেন?

গৃহস্বামীর মুখের মৃদু হাসি পাকা গোঁফ জোড়াটির ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুল; সেই সঙ্গে চাপা পরিহাসের সুরে বলে উঠলেন—জানতে পেরেছি চোখ দিয়ে চেয়ে—খড়ি দিয়ে গ'ণে নয়।

কথাগুলো মুকুলের মনে রীতিমত ধাক্কা দিল, অবাক হয়ে সে এই অদ্ভুত মানুষটির মুখের উপরেই বদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

গৃহস্বামী এবার একটু গম্ভীর হয়ে সহজ কণ্ঠেই বললেন—তোমার দাদু তাঁর দলিল-দস্তাবেজগুলো যেভাবে মোড়কটির ভিতরে পুরে রেখেছিলেন, তুমি সেই অবস্থাতেই যে তাকে আমার কাছে দাখিল করে গেছ—খুলেও দেখনি, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। এটা হচ্ছে তোমাদের বয়সের দোষ। 'পথ চলবে জেনে'—এই প্রবাদটা তোমরা

কাজে মেনে নিতে :চাও না। তাই দেখতে পাই—চোখ থাকতে তোমরা সব কানা। তার সাক্ষী এই দেখনা, তোমার দাদুর দলিলের মোড়কটি খুলে ভিতরের জিনিসগুলো যে আগে নিজের চোখে দেখা উচিত, এবুদ্ধি তোমার মাথায় জাগেনি; অথচ তুমি একজন গ্রাজুয়েট! কাজেই তোমাকে চোখ থাকতে কানা ছাড়া কি বলি বল? সাহেবরা হচ্ছেন ব্যবসায়ী জাত, তাঁদের ভাষাতেও ঠিক এই রকমের একটা কথা চালু আছে—None is so blind as will not see, তুমি যদি মোড়কটি খুলে দেখতে, তাহলে আমাকে এত কথা বলতে হত না, তোমার দাদু যে চিঠিখানা দলিলের মত করে তোমার জন্যে লিখে রেখে গিয়েছেন, তা থেকেই তোমার দিদিমা, গর্ভধারিণী মা, বাবা—সবারই পুরো পরিচয় পেতে—যেটা গল্পের মতই চমৎকার!

এ পর্য্যন্ত বলেই তিনি তাকিয়ার পাশ থেকে মোড়কটি তুলে তার ভিতর থেকে ডেমি কাগজে লেখা মুকুলের দাদুর চিঠিখানা বা'র করে মুকুলের দিকে এগিয়ে দিলেন পড়বার জন্যে। কলের পুতুলের মতন হাতখানি বাড়িযে মুকুল কাগজখানি নিয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে দাদুর হাতের পরিচিত লেখাগুলি পড়তে লাগল।

একরারনামাটি মুকুলকে লক্ষ্য করেই লেখা। গোড়ার মামুলি ভণিতার পরেই গল্পের মত ক'রে লিখেছেন—অবনী রায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁর বিবাহ হয়, আর—ইত্যাদি। গল্পের গোড়াতেই যা বলা হয়েছে। ক'লকাতার পর্ব্বের পর কাশীর পর্ব্বে মুকুলের জন্ম, নামকরণ ও তার মায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত গল্পের আকারে লিখে দাদু ব্যাপারটির উপসংহার করেছেন ছোট একটি প্যারায়—এইভাবে:

তার পর আমরা স্বামি-স্ত্রী দুজনে সমান ওজনের স্নেহ দিয়ে কি-ভাবে তোমাকে মানুষ করেছি, তুমি সে সবই জান। তোমার পিতামহী ও পিতার কাহিনী ইচ্ছা করেই তোমাকে শোনাইনি, কখন শোনব না—এই ইচ্ছাই আমার মনে শক্ত হয়ে শিকড় বেঁধেছিল—পাছে তোমার বাপের নামটি তোমার কাছে ধরা পড়ে। তাই সেটাও চেপে রাখি। তোমার পিতার কোষ্ঠীর নকল আমার বাক্সে ছিল তোমার মায়ের কোষ্ঠীর সঙ্গে। আশুতোষ রায় ব'লে পিতার নাম সম্পর্কে যে পরিচয় তুমি দিয়ে আসছ, সেটা ধর্ম্মত সত্য। আমার বাক্সে তোমার বাবার কোষ্ঠীর নকল আছে, তাতে দেখতে পাবে—আশুতোষ তার রাশিগত নাম। কিন্তু ইদানীং বিবেকের যুক্তিতে আমার মনের ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হয়, তাই ব্যাপারটি আগাগোড়া—আমার যতটা জানা আছে হুবহু তোমাকে জানালুম। এর একটি বর্ণও মিছে নয় জেনো। এখন হয় ত তোমার মনে তোমার পিতা আশুতোষ রায় ওরফে অবনী রায়ের খবর জানবার জন্যে আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠবে। কিন্তু তোমার সে আগ্রহ পূর্ণ করবার মত আমার কিছুই সঞ্চয় নেই। আগে যা বলেছি—পিছনের সমস্ত চিহ্নই আমি মুছে ফেলে কাশীতে নতুন পথে জীবনযাত্রা শুরু করেছি—এর সবটাই সত্যি। অবনীদের কোন খবরই আমি শুনিনি, শোনবার আগ্রহ পর্য্যন্ত আমার মনে জাগেনি। তবে, তুমি যখন আজ মানুষ হয়েছ, নিজের পরিচয় দেবার মত যোগ্যতা অর্জ্জন করেছ, তাতে যদি অদৃষ্টচক্রে তোমাদের যোগাযোগ ঘটে, তাতে আমি সুখীই হব। আর—আমার নিজের হাতে লেখা এই স্বীকারোক্তি বা একরারনামাটি তোমার পরিচিতির একটা প্রাণবন্ত প্রমাণ হবে।

গৃহস্বামী মুকুলের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। পড়তে

পড়তে ছেলেটির মুখখানার উপরে বিভিন্ন ভাবের যে সব রেখা-চিহ্ন ফুটে উঠছিল, কোনটিই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। পড়া শেষ হলে মুকুল যেই তার চোখ দুটি কাগজের উপর থেকে তুলে সামনে উপবিষ্ট বিজ্ঞ মানুষটির মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ করল, তিনি যেন অন্তর্যামীর মতই সহসা বলে উঠলেন—বুঝতে পেরেছি, অবনী রায়ের পরবর্ত্তী খবর জানবার জন্যে তোমার মনে কৌতূহল জেগেছে। বেশ, সে কাহিনী-টুকু আমি তোমাকে শোনাতে পারি। বলেই তিনি মুকুলকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই কাহিনীটি শোনাতে শুরু করলেন :

সেই ব্যাপারের পর অর্থাৎ তোমার দাদুর নামে অবনীর দ্বিতীয় বিবাহের চিঠিখানি পাঠিয়ে তাঁর মা দয়াময়ী দেব্যা ভেবেছিলেন, নিশ্চয়ই বুড়োকে খুব জব্দ করেছেন। কিন্তু উপরে ব'সে অদৃষ্ট দেবতা তখন মুখ টিপে হেসেছিলেন। সেই হাসির গমকে এক জোচ্চোরের পাল্লায় প'ড়ে অবনীর মায়ের সঞ্চিত টাকা কড়ি, শ্যামপুকুরের পৈতৃক বসত-বাড়ী, এমন কি স্ত্রীর গায়ের গয়না-গাঁটি সমস্তই নষ্ট হয়ে গেল। যে নির্দ্দোষ বউটিকে বুড়ী রাক্ষুসীর মত নিষ্ঠুর হ'য়ে এক কাপড়ে বিদেয় করে দিয়েছিল, ছেলের আবার বিয়ে দেবার সময় আগের বৌএর গায়ের গয়নাগুলো কাছে থাকায় নতুন বোকা বেহাইটির কাছ থেকে গয়নার বদলে টাকা ধরে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু উপরের বিচারকর্ত্তার চুল-চেরা বিচার যে, একটু এদিক-ওদিক হবার জো কি! শুধু কি ওগুলো আদায় করেই বিচারকর্ত্তা তাকে রেহাই দেন ভেবেছ? হাজার কয়েক টাকার চড়াসুদের ঋণ জাঁতার মতন বুকের উপরে বসে ঘুরতে লাগল! সে কষ্টের কথা কি বলব? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না ব'লে যে কথা আছে—সেইটিই বাস্তব হয়ে দয়াময়ী দেব্যার বড় সাধের

সংসারটিকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরল—তাঁর দুরাকাঙ্ক্ষার গাছটি শুখিয়ে ঝামা হয়ে গেল। প্রথম বধূটির চোখের জল আর তাঁর বুক-ভাঙ্গা নিশ্বাস এমনি মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল যে, পুরো দশটি বছর বিছানায় প'ড়ে রোগের যাতনায় একটানা কান্নায় বাড়ীশুদ্ধ কাউকে চোখের পাতা বুজুতে দেননি। এই অবস্থায় বাড়ীর পর বাড়ী—পাড়ার পর পাড়া বদলাতে হয়েছে অবনীকে। রোগীর চীৎকারে পাড়া-পড়সীরা অস্থির, কোন বাড়ীওয়ালা এমন ভাড়াটেকে জায়গা দিতে চায় না। এদিকে প্রায় প্রতি বছরে সংসারে একটি না একটি নতুন অতিথি—ছেলে বা মেয়ের রূপ ধরে এসে দুঃখের বোঝাটি ভারি করছিল। দ্বিতীয় বিয়ের বছর পূর্ণ হতে না হইতেই চাঁদের কণার মত একটি মেয়ে সংসারটি আলো করে তুলেছিল সত্যি, কিন্তু বুড়ীর রাগের আগুনটিও সেই সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। হতচ্ছাড়া বউ প্রথম বেয়ানেই মেয়ে বিয়িয়ে বসল! আর যে বেকুব বেচারী আগের বিয়ের ব্যাপারটি না জেনে এ-বাড়ীতে মেয়ে দিয়েছিল—তার খোয়ারের কথা আর কি বলব! নাতনীটিকে দেখতে এসেই বুড়ীর কাছে যে মুখনাড়া খেলেন, তার চেয়ে মার খাওয়া ঢের ভাল ছিল। তাঁরই যখন মেয়ে, আর ছেলে না বিয়িয়ে সে মেয়ে বিয়িয়েছে, অপরাধী ত তিনিই। এর ফলে সেই যে বেচারী এদের সম্পর্ক কাটিয়ে চলে যান—আর সেমুখো হননি কোন দিন। বছর কয়েক পরে যখন এদের ভাগ্য-বিপর্য্যয় হয়, দিন আর চলে না, দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে যাবার জো, বড় মেয়েটি শক্ত অসুখে ভুগছে—ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা নেই, তার কোলের গুল্যোর অদৃষ্টে দুধ জুটছে না, বুড়ীও ব্যায়রামে প'ড়ে বিছানা নিয়েছে, ওঠবার শক্তি নেই—মেয়ের চিঠিতে এই সব শুনে তিনি কর্ম্মস্থান থেকে বিশ্বাসী লোক পাঠিয়ে সে বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করেন

আর বড় মেয়েটিকে এই সর্ত্ত নিয়ে আসেন যে তাকে তিনি মনের মত করে মানুষ করবেন, সব ভার তার নেবেন—কলকাতায় ওদের কাছে কোনদিন পাঠাবেন না। সেই থেকে মেয়েটি তাঁর কাছেই আছে, আর এখন তার বয়স ষোল বছর চলেছে। তোমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট আর কি! কিন্তু মুখের আদল দুজনের একই রকমের। হ্যাঁ, এবার অবনীর পরের কথাটিও বলি—বছর কতক হ'ল মা ভুগে ভুগে স্বর্গে গেছেন কাজের জবাবদিহি করতে, তারপর থেকে অবনীর অবস্থা কতকটা ফিরেছে আফিসে মাইনে অনেকটা বাড়ায়। পৈতৃক বাড়ীখানা অবশ্য নেই, তবে শ্যামবাজার অঞ্চলে একখানি আস্ত বাড়ী ভাড়া নিয়ে কোন রকমে বাস করছে। দেনাও সব শোধ করতে পারেনি। বড় মেয়ের পরে পিঠাপিঠি অনেকগুলো ছেলে মেয়েও হয়েছে। তবে, আর দশজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যেভাবে কলকাতায় ভদ্রতা বজায় রেখে সুখে দুঃখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে—অবনীর সম্বন্ধেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তোমার অজ্ঞাত পিতা আশুতোষ ওরফে অবনী রায়ের বর্ত্তমান অবস্থার পরবর্ত্তী পাতাটিও এক নিশ্বাসে পড়ে তোমাকে শুনিয়ে দিলুম।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে মুকুল বলিল—দাদুর চিঠিখানির সঙ্গে মিল রেখে যেভাবে আপনি উপসংহার করলেন, তাতে বুঝতে আর বাকি নেই যে, আমার ছোট মা'র সম্পর্কে আমাদের দাদু ছাড়া আপনি আর কেউ নন। নিজেকে যতই চাপতে চেষ্টা করুন না কেন, নিজের হাতের বোনা জালেই জড়িয়ে প'ড়ে ধরা দিয়ে ফেলেছেন। তাহলে আমার বোনটি এখানেই অবিশ্যি আছেন—

—থাকতেই যে হবে দাদা, এ-যে অদৃষ্টের লেখা। ভাই-বোন এক হবেই।—কথাগুলি বলতে বলতে ভিতরের দিকের দরজাটি

খুলে আধফোটা পদ্ম ফুলের মত একটি মেয়ে বিপুল পুলকের ঢেউয়ে নাচতে নাচতে মুকুলের সামনে এসে দাঁড়াল। বিস্ময় ও উল্লাসের বিপুল আবেগ মুকুলকেও চোখের নিমেষে ঠেলে তুলে দিল। কিন্তু তার মুখ থেকে কোন কথা বেরুবার আগেই হাসিমুখে শ্লেষের সুরে বৃদ্ধ গৃহস্বামী বলে উঠলেন—এ মন্দ নয়, আমে দুধে গেল মিশে, আঁটি রইল প'ড়ে পাশে! পৃথিবীর ধারাটাই এই রকম।

মেয়েটিও হাসতে হাসতে উত্তর করল—পৃথিবীর ধার আমরা পালটে দেব দাদু, আঁটিকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেরাজে তুলে রেখে।

মুকুল প্রথমটায় হতভম্বের মত হয়ে পড়েছিল, নিজেকে সামলে নিয়ে এই সময় উচ্ছ্বাসের সুরে বলে উঠল—জ্ঞান হয়ে অবধি জেনে আস্‌ছি, পৃথিবীতে নিজের বলতে আছে শুধু দাদু আর দিদা। আমার বয়সী যে সব ছেলেকে পাড়ায় দেখতুম, তাদের কত রকমের কত আপনার জন, কত ভাই, কত বোন; আমি চেয়ে দেখতুম—আর মনে মনে ভাবতুম—আমার যদি একটি ছোট বোনও থাকত! আমার সে-কথা বুঝি অন্নপূর্ণার কানে বেজেছিল, তাই আচমকা আজ এমন প্রাণখোলা হাসিমুখী বোন পেয়ে গেলুম।

মুকুলের নতুন দাদুটিও অমনি মুখখানা বেঁকিয়ে আড় চোখে নাতনীর পানে চেয়ে বললেন—হুঁ, কি বলেছিলুম আমি? মিলিয়ে নাও ভাল ক'রে—আঁটির কথা ঠিক কি না?

মেয়েটি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল—আঁটির আবার কি হ'ল?

দাদু মুখখানার হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গি করে বললেন—যা হবার তাই হ'ল—আম মিশল দুধের সাথে, আঁটি পড়ে রইল তফাতে।

ভায়ার কথা শুনলে না—অন্নপূর্ণা হাসি-মুখী বোনটিকে আচমকা মিলিয়ে দিলেন, কিন্তু তার উপলক্ষটি কে হলেন, তার উল্লেখই নেই।

মেয়েটি উত্তর করিল—উটি যে উহ্য রয়েছে দাদু, বুঝে নিতে হয়।

দাদু বললেন—উল্টো বুঝাও অসঙ্গত নয়, দয়াময়ী দেব্যার নাতী ত? দয়া করে একটা কিছু দাবী করলেই হ'ল।

মেয়েটি বলল—কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন দাদু, আমরা দুটি ভাই বোন তাঁয় দেহ-ছায়ার বাইরেই একএকটি দরদী দাদুর কাছেই মানুষ হয়েছি।

মুকুল এই সময় আস্তে আস্তে বলল—আমার সেই দাদুটির কাছ থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি দাদু, কথার চেয়ে কাজের দামই বেশী। বাঙ্গালী কথা অনেক বলেছে, এখন দরকার কাজের। তাই, মুখের কথায় আপনাকে স্তুতি না ক'রে মনের পাতায় আপনাকে এমন ক'রে এঁকে ফেলেছি দাদু, যা কোন দিন মুছবে না।

মেয়েটি এবারে খিল খিল করে হেসে বলল—কেমন, হয়েছে ত, এখন খুসী?

মুকুল প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বলল—আমি কিন্তু এখনো আমার বোনটির নাম জানতে পারিনি দাদু!

দাদু বললেন—নামটি তোমাকে অনুভব করে নিতে হবে দাদা, অন্ধকারের ভিতর থেকেই তোমার বোনটি যখন উদয় হলেন হঠাৎ, তখন তার নামটা কি হওয়া উচিত—

মুকুল বলে উঠল—আর বলতে হবে না দাদু, নাম আমি পেয়েছি। আমার বোনটিই তাহলে সবিতা দেবী—অন্নপূর্ণা কন্যা-পীঠের ছাত্রী?

মুকুলের মুখের শেষ কথাটি শুনেই মেয়েটির সুন্দর মুখখানি যেন সিঁদুরের মত লাল হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে দাদুর চোখের উপর তার দৃষ্টি প'ড়ে যেন একটা ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত খেলে গেল। কিন্তু মুকুলকে ভাববার অবসরটুকু না দিয়েই গায়ে পড়ার মত হয়ে সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে বলল—আমার নামটি বুদ্ধি খাটিয়ে বলেছ তাতে আশ্চর্য্য হয়নি, কিন্তু তোমার এই বোনটিই যে অন্নপূর্ণা কন্যা-পীঠের ছাত্রী—এটি কি করে তুমি অনুমান করলে দাদা?

মুকুল বুঝল, তার হাতের ঢিলটি ঠিক জায়গাটিতেই পড়েছে। একটু থেমে সে বলল—নাই বা শুনলে সে কথা, বোন।

সবিতার মুখখানা এবার যেন হঠাৎ কালো হয়ে গেল, চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে সে শুধু দাদুর মুখের পানে একটিবার তাকাল; সেই ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টি যেন একটা বড় রকমের কাহিনীর আভাস দিল তার স্তব্ধ দাদুকে।

কিন্তু পরক্ষণেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে গম্ভীর গলায় দাদু বলে উঠলেন—ভেবেছিলুম, দাদুর দাযটা আগে মিটে যাক, তার পর তিন মাথায় মিলে পরামর্শ করা যবে। কিন্তু এখন দেখছি, পরিচয় যখন হয়ে গেল, কিছুই আর চেপে রাখা ঠিক নয়। তাহলে তোমরা দুজনেই ব'স। ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যাক।

দাদুর কথার পর আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না, মুকুল তার কম্বল বিছানো টুলখানির উপরে বসল, সবিতাও বসবার জন্যে তক্তপোষটির দিকে এগিয়ে গেল। দুজনে বসেই দাদুর মুখের দিকে তাকাতে, দাদু মুকুলকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন—একটা কথা আগে জেনে নিতে চাই, অন্নপূর্ণা বিদ্যামন্দিরের ছাত্রী সবিতাদেবীকে তুমি এর আগে যে কোন দিন দেখনি, সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

কিন্তু তার সম্বন্ধে তুমি যে লোকমুখে কিছু শুনেছ, তোমার কথাতেই সেটা ধরা পড়েছে। সেই শোনা খবরটি আমি তোমার মুখ থেকে আগে শুনবো, তার পর আমাদের কথা বলব।

মুকুল বলল—দেখুন, 'যা রটে, তা বটে' ব'লে একটা কথা চলে আসছে সত্যি, কিন্তু আমার মনে হয়, এ সব ব্যাপারে প্রায়ই তিলকে তাল করা হয়ে থাকে। এটাও সেই রকম একটা কিছু হবে। নইলে, রিটায়ার্ড সেসন জজ রায়বাহাদুর অবিনাশ চক্রবর্ত্তী—যিনি মস্ত বড় জমিদার, মস্ত বড় মার্চ্চেন্ট, মস্ত বড় মানী লোক, গেল বছরে বিপত্নীক হয়ে যিনি স্ত্রীর দানসাগর শ্রাদ্ধ ক'রে কাশীর সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন,স্ত্রীর স্মৃতি বজায় রাখবার জন্যেই যিনি কন্যা-পীঠে যোগ দেন, আর মৃতা স্ত্রীর নামে কন্যাদের সুশিক্ষার জন্যে মোটা অঙ্কের টাকা দান করেন—তিনি যে কন্যা-পীঠের সেরা কন্যা সবিতাদেবীর রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করতে ক্ষেপে উঠবেন—কথাটা লোকের মুখে যতই রটুক না কেন, বিশ্বাস করতে কি পারা যায় কখন?

দাদু একটু হেসে বললেন—তুমি ছেলে খুব ওস্তাদ কিনা, তাই সব দিক বাঁচিয়ে কথাটা দিব্যি কায়দা করে শুনিয়ে দিলে। তোমার কথা হচ্ছে—কথাটা এই ভাবে রটেছে বটে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর না। এখন আমি বলছি—যা রটেছে তা সত্যি। জজ বুড়ো আমার চেয়েও বছর তিনেকের বড়, আর তার নিজের সংসারটাই রাবণের গুষ্টির মত' বিশাল; কিন্তু তাতে কি হয়েছে! তাঁর যখন টাকার অভাব নেই, ক্ষমতা প্রতিপত্তিও প্রচুর, তখন কন্যা-পীঠের সেরা কন্যার কাছ থেকে জোর ক'রে যদি বরমাল্য আদায় করতে চান—

এই পর্য্যন্ত বলেই দাছু চোখের দৃষ্টিটা বেঁকিয়ে সবিতার আরক্ত মুখখানার উপর ফেলতেই সে অমনি ফোঁস্ করে উঠল, ভ্রূভঙ্গি করে বলল—থাম বলছি দাছু, তোমাকে আর অত ক'রে ভণিতা করতে হবে না।

পরিহাসের স্থরে দাছু বললেন—শোন কথা, খাঁটি কথা বলাটাই যেন মস্ত দোষ! আমি কি বলিছি—তুমিই সেধে মালা গাঁথতে বসে গেছ—আরে, মালা ছড়াটি গাঁথিয়ে তার ভিতরে মাথাটি গলিয়ে দেবার জন্তেই জজ সাহেবের জুলুম চলেছে না?

মুকুলের চোখদুটো বুঝি জ্বলে উঠল কথাটা শুনে, তার গলার ভিতর দিয়ে একটা শব্দ জোরে নির্গত হল—জুলুম!

দাছু বলিলেন—তা ছাড়া কি বলব বল? কোথায় কন্যা-পীঠের এক নগন্যা ছাত্রী, আর কত উপরে তাদের পেট্রন জজ বাহাছুর! রিটায়ার্ড হলেও দপদপা তাঁর একটুও কমেনি। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তিনি যে রকম দোর্দণ্ডপ্রতাপে জজিয়তী চালিয়েছিলেন, তাতে ইউ, পি'তে হেন ডিষ্ট্রিক্ট নেই তাঁর দাপটে যেটা কাঁপেনি। এখন তাঁর নামে কাশীর বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত কেঁপে অস্থির, কন্যা-পীঠ ত তাঁর টাকায় ঢেলে সাজা একটা স্কুল।

ছুই চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি একবার সবিতার মুখের উপর ফেলেই মুকুল দাছুকে জিজ্ঞাসা করল—এখনো সবিতা ওখানে পড়তে যায়?

দাছু বললেন—না। অনেক আগেই তার নাম কাটিয়ে আনা হয়েছে; কিন্তু হ'লে কি হয়—কম্লি ছোড়্তা নহি। এখন তার ঘটকের ঠেলায় অস্থির।

—ঘটক?

হ্যাঁ, ঘটক ছাড়া কি বলি! জজ সাহেবের এক বোনাই—

বোন অবশ্য অনেক আগেই পটল তুলেছেন, কিন্তু তা'সত্ত্বেও বরটি ছেলে পুলে নিয়ে জজের কাশীর সংসার চেপে ব'সে আছেন—নাম তার রজনী হালদার, পোড়া বৃষকাঠের মত কদর্য্য চেহারা, প্রকৃতিটা তার চেয়েও বেয়াড়া, লোককে জানায় সে জজ সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী, কিন্তু লোকে তাকে পুলিশের ইনফরমার বলেই জানে—

মুকুল একটু হেসে বলল—আর আমরা তাকে 'কাশীর ষাঁড়', বলেই জানি। বুঝতে পেরেছি, জজ সাহেবের তরফ থেকে দাগা ষাঁড় ঐটাই শিং নাড়ছে অর্থাৎ আপনাকে আর আমার বোনটিকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

দাদু বললেন—হ্যাঁ, ব্যাপারটা এখন এই ভাবে দাঁড়িয়েছে। কেলেঙ্কারীর ভয়ে জজ সাহেব অবিশ্যি এমুখো হন না, ফেউ লাগিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন। আর ঐ পোড়া বৃষকাঠ নানা রকমের ছুতো নিয়ে এসে রাতারাতি আমার অদৃষ্ট ফিরিয়ে দেবার কত লালসা যে দেখাচ্ছে, সে সব বলতেও মুখে বাধে। এখন তোমাকে পেয়ে আমিও নিশ্চিন্ত, আর আমার সবি দিদিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল; কেননা, আজ ভাই এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

মুকুল বলল—দাদুর কাজটি ত আগে কোন রকমে সেরে নিই, তারপর একবার বোঝাপড়া করা যাবে ঐ বিয়ে পাগলা বুড়োর সঙ্গে, কতবড় জজ সাহেব তিনি, সেটা একবার দেখে নেব।

দাদুর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো, বললেন—তাইত বলি, ভাই না হলে বোনের জন্যে এত দরদ হয়—জোরগলায় এতবড় কথা বলতে পারে! হ্যাঁ, এ কথা এখন এই পর্য্যন্তই চাপা থাক। তোমার দাদুর কাজের কথাই এবার বলি—যার জন্যেই তোমাকে

পাওয়া। ভাগ্যিস এই দলিল দস্তাবেজ নিয়ে টাকার সন্ধানে আমার কাছে এসেছিলে!

বলেই তিনি দলিল-পত্রগুলো যেভাবে মোড়কে ভরা ও বাঁধা ছিল, ঠিক সেই ভাবেই মুকুলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—এগুলোর আর দরকার হবে না, যেখানে ছিল, যত্ন করে রেখে দিও। আর টাকার জন্যে কাজ তোমার আটকাবে না; কারণ, এ দায় এখন যে আমারই। আমি দাঁড়িয়ে থেকে যা করবার করব, তুমি ছেলে মানুষ—এসবের কি বুঝবে? চল, এক সঙ্গেই সবিকে আর তার দিদিমণিকে নিয়ে তোমার দিদার কাছে যাই। সব কথা সেখানে হবে।

ভাল ভাবেই মুকুলের দাদুর শ্রাদ্ধ শান্তির পাট চুকে গেল। এই উপলক্ষে দুইটি ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও নিবিড়তর হয়ে উঠল। মুকুলের স্বর্গগত দাদু জীবনে কখন কারুর কাছে হাত পাতেন নি, বিপন্নকে সাহায্য করতে দ্বিধা করেন নি কোনদিন, কিন্তু নিজে নানা বিপদে পড়েও কারুর সাহায্য নেন নি—শোকাতুরা বিধবার কাছে এসব শুনে বিপুলের ওদিক্‌কার দাদুটি সব দিকে চেয়েই হিসেবীর মত টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রাদ্ধের সমস্ত খরচ ও মুকুলের এম, এ পড়ার বাবদ পাঁচশো টাকার ব্যবস্থা তিনি এই সর্ত্তে করেন যে, বাড়ী বাঁধা দিতে হবে না—মুকুল ছেলেটিকেই তিনি বাঁধা রাখছেন। সে তার বোনকে দু'বেলা ভাল করে পড়াবে, আর এম, এ পাস করে নিজের উপার্জ্জনের পয়সায় এ দেনা শোধ করবে।

নতুন দাদুটি অভিভাবকের স্থান গ্রহণ করায় মুকুল যেমন তার চির-স্নেহময় দাদুর অভাবে কতকটা সান্ত্বনা পেয়েছিল, এই নতুন দাদুটিও তেমনি এক বোঁটায় ফোটা একই ধাঁজের দুটি ফুলের দিকে চেয়ে—ভাই বোনের মধুর সম্পর্কটি গভীর করে তুলতে যেন একটি নতুন প্রেরণায় আবিষ্ট হলেন। ভাই সস্নেহে বোনটিকে আত্মপ্রত্যয়ের যে মন্ত্র শোনায়, জড়তা কাটাবার আর আত্মরক্ষার যে সব কৌশল শেখায়, বৃদ্ধ তন্ময় হয়ে দেখেন,শোনেন,আর তারিফ করেন। যথা সময় মুকুল এম-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হল, সবিতারও পড়াশুনা চলতে লাগলো। বাইরের টুইশানি ছেড়ে, বোনটিকে শিখিয়ে পড়িয়ে কৃতবিদ্য করে তুলতে মুকুলের এখন যত্নের অন্ত নেই। সকালের দিকে নিজের পড়া তাকে সারতে হয়,বিকেলে এবাড়ীতে এসে সবিতাকে নিয়ে পড়ে, খানিকটা রাত পর্য্যন্ত ভাই-বোনের পড়া-শুনা চলে। মুকুলের দিদাকে অনেক করে রাজী করিয়ে এবাড়ীর দিদিমণি মুকুলকে খাইয়ে দাইয়ে বাড়ী পাঠাবার ভারটুকু পেয়ে যেন বর্ত্তে গেছেন। দুই নাতী নাতনীকে দু-পাশে বসিয়ে নানা রকম গল্প করতে করতে ভোজন-পর্ব্ব শুরু না করলে দাদুর এখন খাওয়াই হয় না। কিন্তু এমনি অদৃষ্টের লেখা, এ সুখ স্থায়ী হল না বেশীদিন, একটা দমকা বাতাসে সব যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

মুকুলের দাদুর শ্রাদ্ধের পর প্রায় তিনটি মাস রায় বাহাদুরের তরফ থেকে আর কোন রকম উৎপাত এলো না দেখে সবাই ভাবল, আপদ সরে গেছে। কিন্তু ক'মাসের এই নিস্তব্ধতা যে একটা বড় রকম ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ, সেটা তখন কেউ অনুমান করেনি। রায় বাহাদুর এরি মধ্যে যে আটঘাট বেঁধে একটা ভয়াবহ চক্রব্যূহ তৈরী করেছেন, আর তার অন্নদাস রজনী হালদার তলে তলে সমস্ত সন্ধান নিয়ে একটা মিথ্যে মামলা সাজিয়ে ফেলেছে, ঘুণাক্ষরেও

'কেউ তা জানতে পারেনি। যেদিন জানা গেল, সব রাস্তাই তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

মুকুল্ কাশীর মধ্যে সবচীন ছেলে। অতীতের পরিচয় তার দাদু বাইরে কাউকে জানাননি এবং জানানো দরকার মনে করেননি। মুকুলেরও ইচ্ছা নয় যে, দাদুর পরিচয়পত্র নিয়ে সে তার অপরিচিত পিতার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। যাঁকে সে কোনদিন দেখেনি, তার স্বর্গগত জননীর মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর সঙ্গে যাঁর নির্বিচার নিষ্ঠুরতার সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে,সে-পিতার সংস্পর্শে কখনই সে যেতেপারে না, দূরে থেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। ঈশ্বর করুন, যেন কোনদিন কোন অবস্থাতেই তাকে সেই অবাঞ্ছিত অতি পূজ্য ব্যক্তিটির গৃহদ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে না হয়—যেখান থেকে তার মহীয়সী মা সর্ব্বহারা রিক্তার প্রাপ্য নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তার এ প্রার্থনা কি ঈশ্বরের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল ?

হঠাৎ একদিন দাদু জামায়ের কাছ থেকে একখানা রেজিষ্টারী করা চিঠি পেলেন। শ্যামবাজার, মহেন্দ্র বোসের গলির বাসা-বাড়ী থেকে অবনী রায় লিখেছেন যে, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে শুনতে পেয়েছেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে কাশীর এমন একটা ডানপিটে ছেলের মেলামেশা চলেছে—সমাজে যার কোন স্থান নেই, অথচ ইউ-পি গবরমেণ্টের গোয়েন্দা বিভাগ তাকে চিহ্নিত ক'রে রেখেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সব জেনে শুনে আর সরকারী 'পেনসন্থার্' হয়ে তিনি এমন একটা বিপ্লবী ছোকরার সঙ্গে সবিতাকে মিশতে দিয়েছেন। এ অবস্থায় তাকে কাশী থেকে সরিয়ে আনাই তিনি সঙ্গত মনে করেন। সুতরাং আসছে মাসের প্রথমেই তিনি রওনা হচ্ছেন এখান থেকে, সবিতা যেন আসবার জন্যে প্রস্তুত থাকে।

চিঠিখানা পড়েই সবিতার দাদু একবারে আগুনের মত জ্বলে উঠলেন রাগে। জামাই যে তাঁকে সবিতার সম্বন্ধে এমন চিঠি কখন লিখবেন, তিনি সেটা স্বপ্নেও ভাবেননি কেননা, সবিতার ভবিষ্যতে কোন দাবী করবেন না এ সর্ত্তেই তিনি খুব সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কতকগুলো সাংঘাতিক রকমের দায় থেকে জামাইকে মুক্ত করে মরণাপন্ন শিশুকন্যাটিকে মীরাটের কর্ম্মস্থানে নিয়ে যান। পিতা-পুত্রীর মধ্যে এ-পর্য্যন্ত দেখাসাক্ষাৎ কখন হয়নি। এতকাল পরে আজ সেই কন্যার জন্যে বাপের এই আকস্মিক দরদ বৃদ্ধকে বুঝি ক্ষিপ্ত করে তুলল। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে সর্ত্তের কথা তুলে সাফ জবাব দিলেন যে, সবিতার সম্বন্ধে যে-সব কথা লেখা হয়েছে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তার অভিভাবকরূপে ইষ্টানিষ্ট আমি ভালভাবেই বুঝি ; এক্ষেত্রে তোমার গায়ে পড়ে উপদেশ পাঠানো নিরর্থক। কোন্ অধিকারে তুমি সবিতার উপরে দাবী জানাচ্ছ, পূর্ব্বের সর্ত্তের কথা কি সব ভুলে গেছ ? সবিতাকে পাঠাবার কোন কথাই উঠতে পারে না, সুতরাং এই মতলব নিয়ে তোমার আসা বৃথা হবে জেনো।

এর জবাব এল কলকাতার এক নামী য়্যাটর্ণীর আফিস থেকে। তাঁরা মেয়ের বাপের পক্ষ নিয়ে মেয়েকে অবৈধভাবে আটক করে রাখবার অজুহাত দেখিয়ে যে হুমকী দিলেন, তাতে সর্ত্তের কোন কথাই ছিল না। আর সর্ত্তটা মুখেই হয়েছিল, কাগজে কলমে কোন লেখাপড়া হয় নি। য়্যাটর্ণীর এই হুমকীর সঙ্গে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ নিয়ে এ সম্পর্কে দাদুর টেরিনিমের বাড়ীতে সরেজমিনে তদন্ত করতে এলেন সিটি ইনেস্পেক্টর অমূল্যরতন সেন। লোকটি যেমন অমায়িক, তেমনি বিচক্ষণ। এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সদাশয় কর্ম্মচারী পুলিশ-বিভাগে অল্পই দেখা যায়। সবিতার দাদুর মুখে সব কথা শুনে তিনি

ব্যাপারটা ভাল করে বুঝলেও দাদুকে পরামর্শ দিলেন—'আইনের দিকে চেয়ে নাতনীটিকে আপাততঃ ছাড়তেই হবে। নতুবা তিনিও বিপদে পড়বেন, আর মুকুল ছেলেটিও কাকোরি কন্‌সপিরেসি কেসের সংস্রবে জড়িয়ে পড়বে। তার কারণ, এই সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র মামলাটির ব্যাপারে এমন একজন প্রাক্তন নামজাদা রাজকর্ম্মচারীর প্রভাব আছে যিনি সবিতার ব্যাপারে 'ইনটারেষ্টেড' আর মুকুল ছেলেটি ষড়যন্ত্রকারীদের সংস্রবে আছে বলে সন্দেহ করেন।' এরপর দাদুকে হাল ছেড়ে দিয়ে মাথায় হাত দিতে হয়। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, এ-ব্যাপারে কল-কাটি নাড়ছে কে আড়ালে থেকে। জোর করে সবিতাকে এখন ধ'রে রাখতে হলে তাঁকে আইনের প্যাঁচে প'ড়ে নাস্তানাবুদ হতে হবে, আর মুকুল বেচারীর আখেরটিও নষ্ট হয়ে যাবে। অগত্যা মুকুলের সঙ্গে পরামর্শ করে সবিতাকে তিনি কলকাতায় বাপের কাছে পাঠানোই স্থির করলেন। সবিতা প্রস্তাবটি শুনেই বেঁকে দাঁড়াল, জোর গলায় প্রতিবাদ তুলল—'বাবা তাঁর প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে অন্যায় করছেন জেনেও আমি তার সমর্থন করব? তার চেয়ে আমি রামকৃষ্ণ মিশনে নাম লেখাব, সেবাব্রত মেনে নেব, কেউ আমাকে ধরতে ছুঁতে পারবে না।'

মুকুল বলল—'না বোন, তা হবে না। মিশন তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না, ওখানেও রায় বাহাদুরের প্রভাব যথেষ্ট। আমি চাই, আমাদের দাদুর গায়ে আঁচটি না লাগে, অর্থাৎ সাপও মরে, আর লাঠি গাছটিও না ভাঙ্গে। আমাদের বাবা যে অন্যায় করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে।'

সবিতা আর্ত্তস্বরে বলল—'প্রায়শ্চিত্য করা মানে ঐ পাষণ্ড বুড়োর কাছে আত্মসমর্পণ, এই ত? তুমি বুঝতে পারনি দাদা, দাদুর কাছে

কোন দিক দিয়ে পাত্তা না পেয়ে ওরা কলকাতায় গিয়ে বাবাকে ধরেছে, বড় রকমের লোভ দেখিয়েছে, তার মানে হচ্ছে—বিয়ের হাঁড়িকাঠে আমার বলিদান।'

মুকুল বলল—'তোমার পরিত্রাণই যে আমার লক্ষ্য বোন। অনেক অভিনয় করেছি,বড় বড় কলাবিদ্‌দের কাছে বাহোবা পেয়েছি। সে অভিনয়কে আজ কাজে লাগাব বোন—তোমার জন্যে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাব কলকাতায়। শুনিছি, সেখানে শিক্ষিতা মেয়েরা তোমার মত দুর্গত মেয়েদের পরিত্রাণের জন্যে একটা শক্তিশালী সংস্থার পত্তন করেছেন, নাম হয়েছে তার কুমারী-সংসদ। আমি তাঁদের সাহায্য নেব আর নিজেও আত্মোৎসর্গ করব। তোমার সামনে ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি বোন, এমন শিক্ষা দেব আমি ঐ দাম্ভিক রায় বাহাদুরকে, যেটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এই শ্রেণীর লোভী বৃদ্ধদের বিয়ের ব্যাপারে। এখন তোমাকেও আমার মতন অভিনয় করে যেতে হবে বোন। আমি তোমার রুটিন বেঁধে দেব—কলকাতায় গিয়ে কি ভাবে চলবে, মনের জ্বালা বুকের ভিতরে চেপে রেখে সবার সঙ্গে মিশবে কেমন করে, পড়ার ব্যবস্থা কি হবে—রুটিনে সে সবই লেখা থাকবে। তার পর কি করতে হবে আমি সেখানে গিয়ে জানাব। মনে রেখো বোন, যাঁর অনুগ্রহে একদিন আমাদের বাবা দায়মুক্ত হয়েছেন, তুমি পেয়েছ যাঁর কাছে কালোপযোগী শিক্ষা, যিনি আমাদের স্নেহময় অভিভাবক, তাঁর মঙ্গলের দিকে চেয়েই তোমাকে কাজ করতে হ'বে।'

দাদার কথাগুলি নিবিষ্টমনে শুনে সবিতা হেঁট হয়ে তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলল—'তাই হবে দাদা, এখন থেকে তোমার উপদেশই আমার জপের মন্ত্র হ'ল!'

যেদিন সবিতাকে কলকাতায় পাঠানো হয়, সেইদিনই মুকুল খবর পায় যে, কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় সে জড়িয়ে প'ড়েছে—পুলিস আসছে তার বাড়ী সার্চ্চ করতে! বিশ্বস্তসূত্রে খবরটি পেয়েই সহৃদয় সংবাদদাতার পরামর্শে মুকুলও সেইদিন ভোল ব'দলে বিপুল বিশ্বাস হ'য়ে বোনটির অনুসরণ করল তার প্রতিশ্রুতির দিকে চেয়ে। সঙ্গে নিল শুধু স্বর্গগত দাদুর লেখা পরিচয় পত্রখানি, কিছু অর্থ, আর তার প্রসাধনের সরঞ্জাম বাক্সটি।

ভাই বোন দুজনেই যে প্রাণপণে প্রতিশ্রুতি মেনে চলেছে—সে পরিচয় কুমারী-সংসদও নিশ্চয় পেয়েছেন। দুজনকেই অভিনয় করতে হয়েছে বাঁধা রুটিনের দিকে চেয়ে। মুকুল হ'য়েছে বিপুল বিশ্বাস, ওরফে বিপুলা দেবী। সবিতা শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়বার প্রস্তাব বাপের কাছে তোলবার দিন দুই পরেই অযাচিত ভাবেই সেখানে গিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে মেয়ে পড়াবার চাকরীটা বাগিয়ে নিতে বিপুলা দেবীকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। তারপর, নিজের থাকবার আর খাবার ব্যবস্থাও চাঁপাতলার 'সুহৃদ সমিতি'র সম্পর্কে কি ভাবে সে যোগাড় করে নেয়, সংসদ সে সন্ধানও পেয়েছেন। কাজেই মুকুল বা বিপুল সংসদের বিরুদ্ধাচরণ যে করেনি, বরং 'শঠে শাঠ্যং' নীতিতে তারই কাজের অনুবর্ত্তী হয়েছে—এই কাহিনীটিই তার প্রমাণ।

প্রায় একটি ঘণ্টা ধরিয়া একই ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বিপুল তাহার এই দীর্ঘ বিবৃতিটি সংসদের সভানেত্রী ও সদস্যগণকে শুনাইয়া আস্তে আস্তে আসন গ্রহণ করিল। সংসদের প্রত্যেকেই যেন রুদ্ধ-নিশ্বাসে স্তব্ধভাবে এই বিচিত্র আখ্যায়িকাটি শুনিতেছিলেন। দক্ষ

অভিনেতার মত মুখে বিভিন্ন ভঙ্গি ও সুরের সংযোগে কথাগুলি নিঃসৃত হওয়ায় বিষয়-বস্তুটি প্রত্যেকেই এরূপ আগ্রহে উপভোগ করিতেছিলেন যে, কথা শেষ করিয়া মুকুলকে বসিতে দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া বসিল—এ যে মাসিক পত্রের ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাসের মত হয়ে দাঁড়াল দেখছি, শেষ নেই, পাঠকদের ধৈর্য্যের উপর নিষ্ঠুর আঘাত।

সভানেত্রী বলিলেন—উনি পত্তন করেছেন, শেষ করবে তোমরা।

মায়া কহিল—তাহলে বারোযারী উপন্যাস বলুন।

সেক্রেটারী শক্তি উত্তর করিল—নিশ্চয়ই, বারোজন নিয়েই ত আমাদের সংসদ। কাজেই এই উপন্যাস শেষ করতে সবাইকে সমান ওজনে মস্তিষ্ক চালনা করতে হবে।

অনীতা দেবী কহিলেন—মুকুলই হোন বা বিপুলই হোন, ওঁর এই কাহিনীটি যে কুমারী সংসদের এক নির্ভরযোগ্য গীতা, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। এই গীতাখানির ভিতরে আমাদের দেশের দুর্গত মেয়েদের অপমানাহত ক্রন্দসী মুখগুলি যেন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। আমরা এর জন্য রচয়িতাকে সংসদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখন এই ব্যাপারটির প্রসঙ্গে একটি কথা জানবার জন্য আমাদের আগ্রহ হচ্ছে; সেটি এই যে—রায় বাহাদুর কতদূর এগিয়েছেন, আর সবিতার বর্ত্তমান অভিভাবকদের মনোবৃত্তিটি কি রকম ?

সভানেত্রীর প্রশ্নটির উত্তর দিতে উঠিয়া মুকুল কহিল—সবিতার পড়ার ঘর থেকে আমরা যখন বেরিয়ে আসি, আমি তাকে বলেছিলুম—'তোমার বন্ধুর চিঠিখানা আমি নিয়ে যাচ্ছি, মিটিং-এ পড়ব। বন্ধুটি তোমার ঐ বয়সেও কি চমৎকার লিখতে শিখেছেন, সেটা শুনলে সংসদের মেয়েরা জ্ঞান লাভ করবেন বলেই মনে হয়।'—জানিনা, এ কথাটা আপনাদের মনে আছে কি না।

সভানেত্রী কহিলেন—খুব আছে। তোমার গল্পের ভিতরে ঐ চিঠির প্রসঙ্গটা ওঠেনি, তবে আমি ভুলিনি, প্রশ্ন উঠতই।

মুকুল কহিল—আপনাদের উপস্থিতির মিনিট পনেরো আগেই এই চিঠিখানি ডাকে আসে। সবিতার মা তখন রান্নাঘরে ছিলেন, আট-ঘাট বেঁধে আর চারদিকে নজর রেখে পাঠাগারে ভাই-বোনকে কত সন্তর্পণে আলাপ করতে হয় সেটা অনুমান করে নিন। কোন দিকেই মা'র নজর এড়ায় না—কে এল, কি এল, কে কি বলল, সব দিকেই তাঁর দৃষ্টি। চিঠি আসতেই জানতে চাইলেন—কার চিঠি, কে দিলে? সবিতা জানাল—আমার, কাশী থেকে এক বন্ধু লিখেছে। সেইজন্যে আমাকেও বন্ধুর কথা বলতে হয়েছিল। বন্ধুটি কে বুঝতেই পারছেন—স্বয়ং-মনোনীত পাত্র মহামান্য রায় বাহাদুর। কাশী থেকে তিনিই চিঠিখানি ডাকে পাঠিয়েছেন সবিতার নামে। কলকাতায় এসেই সবিতা জানতে পারে যে, রায় বাহাদুরের সঙ্গে তার বিয়ের কথাটা প্রায় পাকা হয়ে গেছে। অবিশ্যি, রায় বাহাদুর এ পর্য্যন্ত নেপথ্যেই আছেন, নিজে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এই নীতিটি ষোল আনা মেনে তাঁর দালাল রজনী হালদারকে 'এজেন্ট' করে কলকাতায় রেখেছেন। সে-ই লোকটাই তাঁর পক্ষ থেকে কথাবার্ত্তা চালাতে থাকে। ঋণগ্রস্ত, সর্ব্বহারা, বিপন্ন, ছাঁপোষা গৃহস্থকে মাত করবার মত যতগুলো অস্ত্র থাকতে পারে, তিনি এজেন্টের মধ্যস্থতায় সবক'টিই চালিয়ে ইদানীং মূল পাত্রীকে বাধ্য করবার জন্যে নিজেই উঠে পড়ে লেগেছেন। ঝুনো পলিটিসিয়ান কিনা, তাই এখানে আর এজেন্টের উপরে এ-ভারটি চাপাতে ভরসা পাননি, ডাক-ঘরের মারফতে চিঠিবাজী চালাতে থাকেন। এখানি হচ্ছে তিন নম্বরের পত্র। এক নম্বরের পত্রের পাঠ ছিল—কল্যাণীয়াসু। তার 'বিষয়-বস্তু হচ্ছে মন ভেজানো। দু নম্বরের পত্রখানার পাঠ কল্যাণীয়াসু থেকে স্নেহের সবিতায় এসে নামে, তার বিষয়-বস্তুটি উচ্ছ্বাসে

ভরা, এক একটি পংক্তি যেন সুরলোকে তোলবার এক একটি সিঁড়ি। এখন তিন নম্বরের চিঠিখানা এসেছে ঠিক সোনার শিকলের মতন হয়ে ; এর সুর একবারে শেষ পরদায় কি ভাবে উঠেছে, আর বস্তু-তান্ত্রিকতার দিক দিয়ে প্রত্যেক পংক্তিটি 'ফ্যাক্টস'-এর (facts) বাঁধুনি দিয়ে কি রকম শিকল তৈরী করেছে, চিঠিখানি শুনলেই বুঝতে পারবেন।

কথা এইখানে শেষ করিয়া মুকুল রায় বাহাদুরের লিখিত তিন নম্বরের চিঠিখানি পড়িতে আরম্ভ করিল :

বেনারস, জজ-ভিলা

প্রিয়তমে,

পর পর যে দুইখানি চিঠি তোমার নামে কলিকাতার ঠিকানায় লিখিয়াছি, তাহাতে তোমার গুণমুগ্ধ এই ব্যক্তিটির হৃদয়ের সব কথাই সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। এই পত্রখানিতে অকপটে ও খোলা-খুলিভাবে আমি লিখিয়া জানাইতেছি যে, তোমার মত কন্যারত্নের জন্য তোমার ঋণগ্রস্ত সর্ব্বস্বান্ত বিপন্ন পিতা-মাতা ও অসহায় ভাই-ভগিনীরা কিরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়া সমাজে বরেণ্য হইতে চলিয়াছেন।

তোমার পিতার যে ঋণ আছে, তাহার তিন মাসের সুদ পড়িয়া যাওয়ায় যাহার জন্য তাগাদায় অস্থির হইতেছিলেন, আমার আদেশে কলিকাতার কর্ম্মচারী উক্ত সুদ শোধ করিয়া দিয়াছে। বিবাহের পরে আসল ঋণটুকুও পরিশোধ করা হইবে। শ্যামপুকুরে তোমাদের যে পৈতৃক বাড়ী দেনার দায়ে বিকাইয়া গিয়াছে, তাহা তোমার নামে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বিবাহের পর তোমার বাবা সপরিবারে ঐ বাড়ীতেই বরাবর বাস করিতে থাকিবেন। তোমার জননীর নামে হাজার টাকার একখানি গবরমেণ্ট পেপার কিনিয়া দিব।

তোমার ভাই বোনদের শিক্ষার ভার লইব। তোমার বাবার প্রোমোশনেরও যথাবিহিত ব্যবস্থা করিব।

এইবার, প্রাণাধিকে, তোমার কথা বলিতেছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, শুভ-বিবাহের পূর্ব্বেই তোমাকে সঙ্গে লইয়া তোমার পছন্দ মত বসন-ভূষণগুলি ক্রয় করি। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার কতিপয় বিখ্যাত মণিকারের দোকানে অলঙ্কারের জন্য অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ভাবিয়া দেখিতেছি, তোমাকে সঙ্গে লইয়া অলঙ্কারগুলি নির্ব্বাচন করাই সঙ্গত। এজন্য অবিলম্বেই আমার কলিকাতায় উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে করিতেছি। আগামী ইংরাজী মাসের পঁচিশ-তারিখে প্রত্যুষেই আমি কলিকাতায় উপস্থিত হইব। কলিকাতার সর্ব্বাধিক মনোরম এবং নির্জ্জন অঞ্চল লাউডন ষ্ট্রীটে আমার একখানি ছবির মত বাড়ী আছে। এইখানেই আমরা দুজনে সুখনীড় বাঁধিয়া মনের আনন্দে কালযাপন করিব।

আজ এই পর্য্যন্ত। কলিকাতায় পৌঁছাইয়াই আমি তোমাকে পত্র লিখিব এবং আনিবার জন্য মোটর পাঠাইব। তোমাকে পাশে বসাইয়া কলিকাতা ভ্রমণের সুখ এবং বড় বড় দোকান গুলি ঘুরিয়া তোমার পছন্দমত বসনভূষণ কিনিবার আনন্দ আমাকে এমনই অভিভূত করিয়াছে যে, বেনারস আমার পক্ষে যেন বিষময় হইয়া উঠিয়াছে।

আমার অন্তরের সমস্ত ভালবাসাটুকু নিঙ্গড়াইয়া এই চিঠিখানিতে মাখাইয়া তোমার কাছে পাঠাইতেছি, জানিবে।

তোমার একান্ত প্রিয়

অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রায় বাহাদুর, রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট য়্যাণ্ড সেসন জজ

চিঠিখানির পাঠ শেষ করিয়া যেমন মুকুল বসিয়াছে, অমনি মেয়েদের ভিতর হইতে চাপা হাসি ও বিভিন্ন কণ্ঠের শ্লেষাত্মক মন্তব্যের যেন ফোয়ারা ছুটিল।

—বাবারে বাবা—এযে সত্যিই তাজ্জব কাণ্ড!

—একষট্টি বছরের বুড়োর প্রাণে এত রস!

—রস না থাকলে লিখতে পারে কখন—'মনের সমস্ত রস নিঙড়ে চিঠিতে মাখিয়ে দিয়েছি।'

—চিঠিখানি যেন হাত-ছাড়া না হয়,সংসদের একটা মস্ত বড় 'একজি-বিট' ওটা।

—এমনি কতকগুলি চিঠি জমা হলে, চাইকি একটা একজিবিসনও খোলা যেতে পারে। দেখে, দেশের লোকের চোখ ফুটবে।

সভানেত্রী অতঃপর কহিলেন—আর নয়, এবার থাম। বর্ষণ যথেষ্ট হয়েছে, এখন কাজের কথা হোক।

সেক্রেটারী শক্তি কহিল—ব্যাপারটি কিন্তু সত্যই বিশ্রী হয়ে উঠেছে, স্রোতটা যে ভাবে এগিয়ে এসেছে, তাতে খুব সাবধান হয়ে কাজ না করলে সব গুলিয়ে যাবে।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া মায়া জিজ্ঞাসা করিল—মুকুল রায়ের 'কেস'টির কি হল? তিনি এখন ফেরার, পিছনে কোন 'ফেউ' লাগেনি ত?

বিপুল সহজভাবেই উত্তর করিল—মুকুলের কেসের ফাইলটি এখন রায় বাহাদুরের মর্জ্জির সুতোয় ঝুলছে। সুতোটাকে ছিঁড়ে ফেলা, কিম্বা আরো পাকিয়ে মুকুলের গলায় জড়িয়ে দেওয়া দুটোই তাঁর সমান এক্তিয়ার। তবে বিপুল আশা রাখে, ঐ সুতো নিজের হাতেই বুড়ো রায় বাহাদুর তার গলায় জড়াবে।

সভানেত্রী ছেলেটির দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

ছুটো। প্রশ্ন আমি তোমাকে করছি, বুঝে উত্তর দাও। কি নামে আমরা অতঃপর তোমাকে ডাকবো ? আর, সবিতার ব্যাপারে তুমি কতখানি ভরসা কর এবং সংসদের কাছে কি সাহায্য চাও ?

দৃঢ়স্বরে নির্ভীক ছেলেটির কণ্ঠ হইতে উত্তর আসিল—আপাতত বিপুল নামটিই আমার বজায় থাকুক সেই সঙ্গে বিপুলা দেবীও। আর, ভরসা আমি পুরোপুরিই রাখি ; তার কারণ, আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করেছি—এই অন্যায়ের প্রতিকার আমাকে করতেই হবে। সাহায্যের কথা যা বললেন, প্রয়োজন হলেই আপনাকে জানাব।

বিপুলের কথায় সভানেত্রীর মুখে আনন্দের আভা পড়িল। একটু থামিয়া তিনি কহিলেন—একটা কথা বিপুল, তোমার থাকার ও খাবার সব ব্যবস্থা যদি এখানেই হয়, তাতে কোন ক্ষতি হবে কি ?

বিপুল কহিল—সুহৃদ্ সমিতির কর্ত্তারা অসময়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, ওঁদের অভিনয়টি যাতে সুশৃঙ্খলে হয়ে যায় সে ব্যবস্থাটিও যে আমাকে করতে হবে দিদি। এ সব ব্যাপারে আমি ভারি সত্যনিষ্ঠ এবং সচেতন, কথার খেলাপ করি না, কাউকে ঠকাই না। কিন্তু বর্ব্বরের সংস্পর্শে এলেই আমার দেহের সমস্ত রক্তের ভিতরে শঠতার বীজাণু কিল-বিল্ করতে থাকে, তখন আমি আর-এক মানুষ।

সভানেত্রী কহিলেন—এমনি মানুষেরই আজ প্রয়োজন হয়েছে ভাই। আমিও বলছি শোন, যদি তুমি সবিতাকে রক্ষা করতে পারো—এই বিশ্রী ব্যাপারটার গতি ঘুরিয়ে, তাহলে শেষের যা ব্যবস্থা—সেটা সুশৃঙ্খলে সিদ্ধ করা হবে আমার কর্ত্তব্য। আচ্ছা, সভা এখন ভঙ্গ হোক।

বিপুল হাসিয়া বলিল—তাহলে, আমিও এখন বাথরুমে ঢুকে রূপ বদলাতে চাই, কারণ বিপুলাদেবী এবার বিপুলে পরিণত হবেন।

সভানেত্রী বলিলেন—কোণের ঘরখানির পাশেই বাথরুম আছে। ঐ ঘরখানি তোমার প্রসাধনের জন্যেই ছেড়ে দেওয়া গেল। প্রসাধন-পর্ব্বটা বরং এখান থেকেই সেরে নিও—যখন প্রয়োজন হবে।

হাসিমুখে বিপুল কহিল—তাই হবে দিদি, তাহলে ধরা পড়বার আর ভয় থাকবে না, সংসদের উড়ে মালিটাকেও ঘুস দিতে হবে না।

ছয়

সবিতার ব্যাপারটি রীতিমত পল্লবিত হওয়ায় তাহারই সমদুঃখিনী কুমারী নিভা দেবীর 'কেস'টি মুলতুবী থাকিলেও সংসদের যে সদস্যটির উপর ইহার তদ্বিরের ভার পড়িয়াছিল, তাহার পক্ষ হইতে কোনরূপ ত্রুটি ঘটে নাই।

কুমারী নিভাদেবীকে উপলক্ষ করিয়া নদার ধনাঢ্য অধিবাসী, উপ-রস্তু চিহ্নিত 'পণ-পাহাড়' হরিদাস গাঙ্গুলীর হৃদয়হীন ব্যবহার সম্বন্ধে সংসদে যে অভিযোগ উঠে, সে সম্বন্ধে যথাবিহিত তদন্তের ভার সংসদের অন্যতম সদস্য কুমারী মায়া দেবীর উপর অর্পিত হয়।

শশধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-যে টালা অঞ্চলের একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি এবং তাঁহার চাল চলনও বনিয়াদী ধরণের, সে কথা সংসদের বৈঠকে পঠিত পত্রেই জানা গিয়াছে।

ঘর বর দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভগিনীদিগকে পাত্রস্থ করিলেও জ্যেষ্ঠ ভগিনী বিমলা দেবী পতিহীনা হইয়া এবং পতিকুলে স্থান না পাইয়া, একমাত্র কন্যা নিভার হাত ধরিয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। সহৃদয় ভ্রাতা কর্ত্তব্য জ্ঞানেই বিধবা ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে তাঁহার বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কার্য্যে বা ব্যবহারে আশ্রিতদের প্রতি তাঁহার আন্তরিকতার কোনরূপ অভাব কেহ কোন দিন দেখিতে পায় নাই।

ভগিনী বিমলাদেবীর মর্ম্মন্তুদ পরিণাম দেখিয়া তিনি ভাগিনেয়ী নিভার পাত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। কিন্তু সেই

ভাগিনেয়ীকে দেখিতে আসিয়া বাহিরের একটি লোক বাহিরের ঘরে যে কাণ্ড বাধাইয়া গেলেন, তাহার আবর্ত্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শান্তির সংসারটির উপর যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল।

বেচারী নিভা সাজিয়া গুজিয়া বাহিরের ডাকের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল, ডাক আর আসিল না; আসিল, এই সূত্রে বাড়ীর ও পাড়ার অনেকগুলি নারীকণ্ঠের নানারূপ আঘাত ও নিষ্ঠুর আলোচনা। সমবয়স্কারা হাসিল, উপহাস করিল, বর্ষীয়সীরা নজীর হাতড়াইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল—এ রকম কাণ্ড তাহারা আর কখনও দেখে নাই, শুনেও নাই!

আলোচনারজের কি একদিনে মিটিতে চায়! পরপর কয়টি অপরাহ্নের মেয়ে মজলিস সেদিনের সেই অপ্রীতিকর ব্যাপারটিকে লইয়া যেন ক্রমশ গুলজার হইতেছিল, কথা আর শেষ হয় না। বাড়ীর গৃহিণী গলগ্রহ-স্বরূপ বিধবা ভগিনী ও তস্য কন্যার প্রতি স্বামীর প্রচণ্ড সহানুভূতি দেখিয়া এ পর্য্যন্ত কোন আপত্তি তুলিতে সাহস পান নাই, কিন্তু এই কাণ্ডটি তাঁহার মুখটিও যেন খুলিয়া দিয়াছে। এদিন মজলিস বসিতেই তিনি বলিলেন—বিয়ে করতে এসে বর ফিরে যাওয়া যেমন অলুক্ষণে কাণ্ড, এও ঠিক তাই! দশটা নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়, ভয়ে ভাবনায় হাত-পা আমার পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে! এ মেয়ে নিয়ে ঠাকুরঝিকে কিন্তু শেষে পস্তাতে হবে, এ আমি ব'লে রাখছি।

মেয়ের যে কি অপরাধ, তাহা মেয়েও বুঝিল না, মেয়ের মাও নয়। অথচ, কথাটার যে প্রতিবাদ তুলিবে, সে সাহস বা সাধ্যও তাহাদের ছিল না। তাহাদেরই অদৃষ্টদোষে অপ্রত্যাশিতভাবেই এই বিভ্রাট, সুতরাং এই সূত্রে ভ্রাতৃজায়ার শরাঘাত নিরুত্তরে সহ্য না করিয়া উপায় কি!

কিন্তু এই ভাবে যখন ডজন দুই মেয়ের সাক্ষাতে নিভা ও তাহার মায়ের উদ্দেশে একতরফা আঘাত চলিয়াছে, তখন সহসা দমকা বাতাসের মত

সেই ঘরে এক সুসজ্জিতা তরুণী প্রবেশ করিয়া, প্রদীপ্ত দুই চক্ষু মেলিয়া সমবেত মহিলামণ্ডলের দিকে চাহিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা আভিজাত্য ও আত্মনির্ভরতার দ্যুতি ঝলমল করিতেছিল।

মেয়েটিকে দেখিয়াই গৃহিণী ভাগিনেয়ী নিভার অদৃষ্ট-চর্চ্চা ছাড়িয়া হাস্যোজ্জ্বলমুখে কহিয়া উঠিলেন—ওমা, মায়া যে! কখন্ এলি?

মায়া জোর করিয়া কণ্ঠে সহজ সুর টানিয়া কহিল—এই ত আসছি, বাইরে বসেছে মরদদের মজলিস; আর এদিকে এসেও দেখছি, আলোচনার বস্তু একই; তুমিও দিচ্ছ ক'যে—মরার উপর খাঁড়ার ঘা।

মামীমা মুখখানি মচকাইয়া কহিলেন—শোনো মেয়ের কথা! কলেজে প'ড়ছিস্ ব'লে তুই যে দিন দিন কি হয়ে উঠছিস্ মায়া, কথা যদি বলবি ত অমনি দিবি খোঁচা।

অতঃপর একটুখানি থামিয়া তিনি স্মিতমুখে কৌতুকের ভঙ্গিতে কহিলেন—সেদিন যদি তুই আসতিস্ মায়া, তা হ'লে তোকেই দিতুম আমি বৈঠকখানায় পাঠিয়ে, সেই গাঙ্গুলী মিনষের সঙ্গে মনের সাধ মিটিয়ে করতিস তখন কথা-কাটাকাটি!

মায়া নীরস স্বরে কহিল—সে আফ্‌শোস তোমার চেয়ে আমারই বেশী, মামীমা! আমি থাকলে দেখে নিতুম, নিভাকে না দেখে সে অনামুখো কি ক'রে ঘরমুখো হ'ত, আর এই সোনার প্রতিমা দেখে কি ক'রে মত না দিয়ে যেতো। তা হ'লে কি এতক্ষণ বেচারী এ রকম ক'রে তোমাদের গঞ্জনা শুনত, মামীমা!

মামীমা এবার মুখখানি গম্ভীর করিয়া প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে কহিলেন—বেশ ত, তুমি যখন এসেছ মা, তোমার বোনটির গতিমুক্তির ভারটুকুও না হয় নিয়েই ফেল না!

মামীর মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে মায়া কহিল—তুমি

কি মনে করেছ মামীমা, তোমাদের মতন আমিও এসেছি বোনটিকে ক্রমাগত কথার খোঁচা নিয়ে বিঁধে বিঁধে মারতে ?

মুখখানা ভার করিয়া বিকৃতস্বরে গৃহিণী কহিলেন—ভাল, ভাল, বেঁচে থাকলে অনেক কিছুই দেখতে পাব, বাছা! বলে—'মার বোন মাসি কাদায় ফেলে ঠাসি।'—হাসিও পায়, রাগও হয়—পরের ঘর করবে বলেই যারা জন্মায়, এখন কথায় ঘা তারা এতটুকু সইতে চান না।

মামার কথায় বিচলিতা হইয়া একুতাব ভঙ্গিতে মায়া কহিল—সয়েই ত আপনারা বরাবর এসেছেন শুনতে পাই, কিন্তু আমরা তা থেকে কতটুকু শিক্ষা পেয়েছি বলুন ত। আপনারা আমাদের বয়সে যে আঘাত পেয়েছেন, সে বয়েস কাটিয়ে গিন্নী-বান্নী হয়ে আপনাদের বউ-ঝির ওপর সেই আঘাত, আরও শক্ত করে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, মেয়েদের ব্যথা এতে বেড়েই চলেছে, আর মুখ বুজে তারা সইছে। সেই জন্যই আমরা আজ বেঁকে দাঁড়িয়েছি; পণ করেছি—অন্যায় কিছুতেই সইব না। আমাদের কুমারী-সংসদ মূক বাঙ্গালার মেয়েদের এই ব্যথাকে সচেতন ক'রে তুলেছে, বাণী দিয়েছে, বলতে শিখিয়েছে—আমরা আর সইব না।

সমবেত মহিলাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, এই বয়সের মেয়ের মুখে এমন ঝাঁঝালো কথা তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই, সুতরাং এক সঙ্গেই অনেকগুলি অঙ্গুষ্ঠ স্ব স্ব অধিকারিণীদের গণ্ডদেশে সংলগ্ন হইয়া তাঁহাদের বাক্‌শক্তি যেন রুদ্ধ করিয়া দিল।

এমন সময় বাহিরে গৃহস্বামীর পদধ্বনি ও সেই সঙ্গে চেষ্টাকৃত একটা অস্ফুট কণ্ঠস্বরের আভাস পাওয়া গেল। কর্ত্তার উপস্থিতির নিদর্শন পাইয়াই বাহিরের মহিলারা ব্যস্তভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

কর্ত্তা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতেই হাসিমুখে কহিলেন—কি রে পাগলী, এখানেও বক্তৃতা সুরু ক'রে দিয়েছিস্!

গৃহিণী এবার উৎসাহিতা হইয়া কহিলেন—মেয়ের কথা যদি শোন, তুমিও থ হয়ে যাবে! আমরা ত শুনে একেবারে কাঠ—

কর্ত্তা জোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—ও আমাদেরও অবাক্ ক'রে দিয়ে এসেছে আগেই; অথচ, যে সব কথা বলেছে, তার ওপর আর কথা চলে না।

মায়া মামার মুখের দিকে চাহিয়া সুস্পষ্টস্বরে কহিল—তা হ'লে নিভাকে আমার হাতে দিন; একটু আগে মামীকেও বলেছি, এখন আপনাকেও বলছি, নিভাকে পার করবার ভার আমি নিতে চাই।

মামা কৌতূহলাবিষ্ট নয়নে ভাগিনেয়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন—তুমি ভার নিতে চাও নিভার—বল কি! কিন্তু তোমরা ত শুনেছি, সংসদ খুলে বিয়ে করবে না ব'লে পণ ক'রে বসেছ, তবে? নিভা ত—

মামার কথায় বাধা দিয়া মৃদু হাসিয়া মায়া কহিল—নিভাকেও বুঝি এই পণে বন্দী ক'রে দলে টেনে নেব ভেবেছেন! আমরা আমাদের সংসদের কাজে এই পণ করেছি ব'লে, বাঙ্গলাদেশের সমস্ত মেয়েকেই যে বিয়ের বিরুদ্ধে পণ করতে হবে, তার কোনও মানে নেই। আমাদের উদ্দেশ্য, পণপ্রথার নাম মুছে ফেলা। আমরা চাই—বিয়ের সঙ্গে পণ বা দেনা-পাওনার কোনও সম্বন্ধ না থাকে; যেখানে এই নিয়ে পীড়াপীড়ি হবে—সেইখানেই আমরা ঝড়ের মত গিয়ে সব তছনছ ক'রে দেব।

মামীমা সহজকণ্ঠে এইবার প্রশ্ন করিলেন—বেশ, তা হ'লে স্পষ্ট করেই বল মা, নিভার সম্বন্ধে তুমি কি করতে চাও?

মনের সঙ্কল্প মুখের কথায় মেয়েটি এতক্ষণে প্রকাশ করিল—ঐ যে

লোকটা সেদিন এখানে এসে অভদ্রতার চূড়ান্ত ক'রে গেছে, বাইরে একটা সীন্ ক্রিয়েট ক'রে তার ছাপ রেখে গেছে, ঐ লোকটার পাশ-করা ছেলের সঙ্গেই আমরা নিভার বিয়ে দেব।

দমকা বাতাসে ঘরের আলোটি হঠাৎ নিবিয়া গেলে, ঘরের ভিতরের মানুষগুলির চক্ষুর উপর যে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠে, মায়ার মুখের কথা শুনিয়া সহসা তাহাদের মনের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

ঘরের নিস্তব্ধতা মামাই প্রথমে ভাঙ্গিয়া দিলেন; একটা ছড়া কাটিয়া রসিকতার সুরে কহিলেন—বলে—'ছুঁচ গড়তে নারে, বন্দুকের বায়না নিয়ে মরে!'

মামীর ভঙ্গিপূর্ব্বক ছড়া বলিবার সুরে মায়ার মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেও সরস কণ্ঠে কহিল—আমরাও দু একটা ছড়া জানি মামীমা, শুনবেন? আচ্ছা, আপনার ছড়ার পিঠে আমি যদি বলি—'সূঁচ, সোহাগা, সুজন—ভাঙ্গা গড়ে তিন জন!' মামা, আপনিই বলুন মামীমার ছড়ার ঠিক জবাব হয়েছে কি না?

মামার মুখে ও চক্ষুতে ভাগিনেয়ীর সম্বন্ধে প্রশংসা যেন হাসির সহিত ঝলমল করিয়া উঠিল, উল্লাসের সুরে তিনি কহিলেন—তোমারই জিত হয়েছে মা, ঠিক মুখের মত জবাব দিয়েছ তুমি, এখন আমি বুঝতে পারছি হয় ত এই ভাঙ্গা সম্বন্ধ তোমাদের চেষ্টায় যোড়া লাগতেও পারে। কিন্তু মা, টাকা—ওদের খাঁই!

অবজ্ঞার সুরে মায়া কহিল—এ যে সেই, 'সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা কার ভার্য্যা' হল, মামা!—দেখুন, রাসিয়ায় কেউ যেমন এখন ভাবে না—কে হবে দেশের রাজা, কুমারী-সংসদও তেমনই যে বিয়েতে হাত দেয় সেখানে কোনও রকমের খাঁই—হাঁ করে ভয় দেখাতে পারে না—'ম্যায় ভূঁখা হুঁ!'

মামা তখন ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন—তা হলে—

মায়াই সহজভাবে সমস্যাটির মীমাংসা এবং এই আলোচনার শেষ করিয়া দিল—আজই আমি নিভাকে নিয়ে যাব আমাদের বাড়ীতে মাসীমাও সঙ্গে যাবেন ; না হয় দু'মাস সেখানে রইলেন। দুটি মাসের মধ্যেই শুভকার্য্য সমাধা। অবশ্য, চুপি চুপি হবেনা ; আপনারা খবর পাবেন।

সাত

মায়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী অনুপমার কন্যা, পূরা নাম মহামায়া ; কিন্তু সকলে মায়া বলিয়াই ডাকেন। মায়ার পিতা মিষ্টার এস,মুখার্জ্জী বেসাণ্টের থিয়োজফিকাল সোসাইটির একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ও পরিচালক। সংসারে এক প্রকার নির্লিপ্ত, স্ত্রী অনুপমাকেই সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতে হয়। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। কলিকাতার চাঁপাতলা অঞ্চলে নিজস্ব বাড়ী। এক পুত্র শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিয়াছে, অন্য পুত্র মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতেছে ; মায়া মিশন কলেজে থার্ড ইয়ারের ছাত্রী ও বিখ্যাত কুমারী সংসদের অন্যতম প্রবর্ত্তিকা। সংসদের বিধি অনুসারে তাহাকেও প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছে, পণপ্রথার উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রজাপতির বন্ধনে ধরা দিবে না, প্রেম-স্পৃহাকে সযত্নে অন্তরের অন্তস্তলে চিরসুপ্ত করিয়া রাখিবে। কন্যার এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় পিতা সায় দিয়াছেন, মাতা নানা প্রতিবাদ তুলিয়াও কন্যার মতপরিবর্ত্তনে অক্ষম হইয়া অগত্যা নিরস্ত হইয়াছেন।

পিতৃহীনা, মাতুলালয়ে প্রতিপালিতা নিভার প্রতি মায়ার স্নেহের অন্ত নাই। নিভা বয়সে মায়া অপেক্ষা দুই বছরের ছোট, মায়ার মত যদিও সে উচ্চশিক্ষার অবকাশ পায় নাই, কিন্তু মায়া এবং মাতুলপুত্র জলধরের সহায়তায় নিভা মোটামুটি রকমের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে। একটি বিষয়ে নিভার বৈশিষ্ট্য অসাধারণ, সেটি তাহার চমৎকার রূপ ও স্বাস্থ্যপুষ্ট সুশ্রী গঠন। ইহা ভিন্ন নিভার প্রকৃতিগত কোমলতার সহিত বিনয়নম্র আচরণও প্রশংসনীয়।

আহার-পর্ব্বের পর বিদায়-পর্ব্ব চলিয়াছে, এমন সময় মাতুলপুত্র জলধর বাড়ীতে ফিরিল। মেডিকেল কলেজের সে একজন কৃতী ছাত্র; এখনও অবিবাহিত। তাহার ধনুর্ভঙ্গ পণ—বিবাহ যদি করিতে হয় কখন, কোন কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র সদ্ব্রাহ্মণের কন্যাকেই সহধর্ম্মিণী করিবে। কুমারী-সংসদের প্রতি তাহার শ্রদ্ধাও নিবিড়। মায়ের নিকটে সমস্ত শুনিয়া সে মায়ার সন্ধানে ছুটিল।

উপরের একখানি ঘরে নিভা তাহার সুটকেসটি গুছাইয়া চাবিবন্ধ করিয়া কহিল—বইটই আর কিছু নিলুম না মায়াদি, শুধু গীতাখানাই সঙ্গে নিয়ে চললুম।

মৃদু হাসিয়া মায়া কহিল—ওখানাও না নিলে পারতে, কেন না, সেখানে গিয়েই—যে নতুন গীতা তোমাকে মুখস্থ করতে হবে, সেটা আমার কাছেই পেতে।

সলজ্জ হাসিভরা মুখে নিভা কহিল—তোমার সব কথাতেই ঠাট্টা!

একটু গম্ভীর হইয়া মায়া কহিল—ঠাট্টার কথা কি হ'ল! আচ্ছা, আগে ত সেখানে চল্; তার পর দেখবি,তখন পাঠের কি গুরুতর ব্যবস্থা, হাঁফিয়ে উঠতে হবে।

এই সময় জলধর ঝড়ের মত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রশ্ন তুলিল—কি ব্যাপার বল ত!

সুটকেশটি দেখাইয়া নিভা হাসিমুখে কহিল—বুঝতে পারছ না দাদা, মায়াদি'র এ একটা নতুন য়্যাডভেঞ্চার!

সহজকণ্ঠে মায়া কহিল—তার এখনও কিঞ্চিৎ দেরী, তবে উপস্থিত যে 'ডিপ্যারচার', সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জলধর কহিল—নিভাকে সত্যই নিয়ে যাচ্ছ, মায়া?

মায়া একটু কঠিন হইয়া কহিল—না নিয়ে গিয়ে উপায় কি!

শেষকালে ও একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসুক, আর তোমরা করো করোনারের কোর্টে ছুটোছুটি, লজ্জায় আমার মুখখানা পুড়ে যাক! না—সে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না, সেই জন্যই ত এই সতর্কতা ও রক্ষণশীলতা।

দৃঢ়স্বরে জলধর প্রশ্ন করিল—আমি তোমাদের কোন কাজে আসতে পারি?

মায়া কহিল—তোমাদের সহায়তা যদিও আমরা অনাবশ্যক মনে করি, কিন্তু তুমি এ-ব্যাপারে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছ, তাতে আমাদের সংসদের পক্ষ থেকে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, জলধরদা! সুতরাং নিভার 'কেসে' তুমি যদি কিছু উপাদান যোগান দিতে চাও, বোধ হয় সেটা সংসদ অগ্রাহ্য করবেন না।

জলধর দীপ্ত দৃষ্টিতে মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া এক নিশ্বাসে কহিল—যে সঙ্কল্প তোমাদের, তাই আমারও।

মায়া স্থিরদৃষ্টিতে জলধরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—তা হ'লে তুমিও আমাদের সঙ্গে চল জলধরদা, আজ রাতেই আমরা তা হ'লে কাজের একটা খসড়া ক'রে ফেলতে পারব। সংসদে এ কেসটা উঠেছে, তদ্বিরের ভার পড়েছে আমার উপরে। বুঝতে ত পারছ, 'শঠে শাঠ্যং' নীতিতে এখন আমাকে বোঝাপড়া করতে হবে নদার শিব ঠাকুরটির সঙ্গে। এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য খুবই কাজে লাগবে। তুমি তবে তৈরী হও দাদা, আমি মামাবাবুর অনুমতি না হয় নিয়ে আসছি।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরেই পটলডাঙ্গার সুপরিচিত বাড়ীটির সুসজ্জিত বৈঠকখানায় কুমারী-সংসদের এক জরুরী বৈঠক আহূত হইয়াছে। সংসদের অধিকাংশ সভ্যাই মহোৎসাহে সভায় যোগ দিয়াছে। অনীতার বাবা এ সময় বাড়ীতে অনুপস্থিত, আফিসের প্রয়োজনে কয়দিন হইল কার্শিয়াঙ্গে গিয়াছেন; ফিরিতে বিলম্ব হইবার কথা। সুতরাং বাহিরের ঘরটির ভিতর কুমারীদের কলহাস্যে সংসদের কার্য্য নিরুদ্বেগেই চলিয়াছে।

সেক্রেটারী শক্তি বোস এবং কো-আপ্ত সভ্য বিপুল বিশ্বাস সবিতা দেবীর ব্যাপারে কার্য্যান্তরে লিপ্ত থাকায় এই সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। শক্তির সহপাঠিনী ও সহকারিণী মায়া দেবীই আজ তাহার প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। সংসদের এই বিশেষ বৈঠকে অদ্যকার একমাত্র আলোচ্য বিষয়টির এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে :—নদার শ্রীযুত হরিদাস গাঙ্গুলী মহাশয়ের বরপণ-প্রসঙ্গে অস্বাভাবিক আচরণের জন্য সংসদের এই বিশেষ অধিবেশন এবং প্রয়োজনমত কার্য্যপদ্ধতি প্রয়োগে উহার যথোচিত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা।

সভায় আজ আর অন্য কোনও প্রস্তাব উঠিল না, কেবল এই প্রস্তাবটিই সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিপুল উৎসাহে গৃহীত হইল।

নিভাকেও সভায় ডাকা হইয়াছে এবং তাহাকে দেখিয়া সংসদের সভ্যাদের চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া গিয়াছে।

সংসদের সভানেত্রী অনীতা দেবী মর্ম্মস্পর্শী স্বরে কহিলেন—এই সব সোনার প্রতিমা ছেড়ে যারা টাকাকেই সার করতে পারে তাদের সম্বন্ধে 'পণ-পাহাড়' বিশেষণটা বোধ হয় ঠিক উপযুক্তই হয়েছে।

মায়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে মন্তব্য প্রকাশ করিল—তাতে আর সন্দেহ কি! পাষাণ-প্রতিমা চূরমার করত ব'লে কালাচাঁদ নাম পেয়েছিল—কালাপাহাড়; আর ইদানীং বাঙ্গলার মেয়েদের হৃদয়গুলো বর-পণের দাপটায় ভেঙ্গে চুরমার করছে একশ্রেণীর ছেলের অভিভাবকরা, তখন তাদের যোগ্য বিশেষণই হচ্ছে—পণ-পাহাড়!

এই সময় ঘড়িতে চারিটা বাজিতেই সত্যনেত্রা সচকিত হইয়া কহিলেন—নিভা, তুমি এবার পাশের ঘরে গিয়ে ব'স ত বোন, আমরা এখন অসামান্য 'ইম্নাডিয়েট ম্যাপ্লীয়ার্' প্রত্যাশা করছি—যার ওপর সমস্ত কেসটাই 'ডিপেণ্ড' করছে।

সলজ্জ হাসিমুখে নিভা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই মায়া তাহার দিকে চাহিয়া কৌতুক হাস্যে কহিল—অবশ্য, তার 'ম্যাপ্লীয়ারেন্সটাও তোমার পছন্দ করবার প্রধান বিষয়।

অনীতা দেবী কথাটায় সায় দিয়া কহিলেন—নিশ্চয়, তোমার মত না পেলে আমাদের অগত্যা আসামীকে বে-কসুর খালাস দিতে হবে।

মায়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—পরদার ফাঁক দিয়ে দুই নেত্র বিস্ফারিত ক'রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে যেন ভুল না হয়!

কৃত্রিম কোপকটাক্ষে মায়ার দিকে চাহিয়া নিভা কহিল—যা—ও! পরক্ষণে আস্তে আস্তে দ্বারের পরদা ঠেলিয়া পার্শ্বের ঘরখানির মধ্যে সে প্রবেশ করিল।

মায়া কহিল—নিভাকে দেখলেই মনটি দুলে ওঠে; তাই ভয় হয়, শিব গড়তে ব'সে শেষে বাঁদর না বানিয়ে বসি।

সত্যভামা কহিল—বাপের যে রকম প্রকৃতি শুনলুম, ছেলেও যদি তার ধার দিয়ে যায়, তা হলেই ত চিত্তির!

মায়া কহিল—সব ক্ষেত্রে বাপের গুণ যেমন ছেলেকে অর্শায় না,

দোষের সম্বন্ধেও সেটা খাটে। এমন অনেক স্থলেই দেখেছি, বাপ দুর্জ্জয় মাতাল, ছেলে কিন্তু পাণটি পর্য্যন্ত খায় না।

অনীতা দেবী কথাটার সমর্থন করিয়া কহিলেন—আমিও এ কথা স্বীকার করি; চোখের উপরই ত আমরা দেখতে পাই, বাপ যত বড় কর্ম্মী, ছেলে তত বড় অকর্ম্মা; বাপ দেশপূজ্য নেতা, ছেলে দেশের ওঁছা জঞ্জাল। বাপ দেশবিখ্যাত পণ্ডিত, ছেলে গণ্ডমূর্খ, বাপ হয়ত মহাত্মা, ছেলে মার্কামারা দুরাত্মা, এর উলটো দিকটাও আবার উল্লেখ করা যায়—বাপ যত বড় দুষ্ট, ছেলে তত বড় শিষ্ট—

ফটকের সম্মুখে একখানি রিক্সা আসিয়া দাঁড়াইল। অমনই কক্ষমধ্যে সব কয়টি তরুণীর চোখে চোখে যেন একসঙ্গে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, ঘরের ভিতর একটা অপরিসীম গাম্ভীর্য্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

কোমরে কুকরী বাঁধা, খাকির পোষাক পরা, বেঁটেখেঁটে গুরখা দারোয়ানটিকে দেউড়ীতে দেখিয়াই তড়াক করিয়া রিক্সা হইতে নামিয়া রিক্সার আরোহী তাহাকে প্রশ্ন করিল—এইটেই কি একুশ নম্বরের বাড়ী?

নেপালী সেলাম ঠুকিয়া মৃদুস্বরে কহিল—জী!

রিক্সাওয়ালার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া ব্যগ্রভাবে আগন্তুক তাহাকে অপূর্ব্ব হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল—তুম জান্‌তা হায়, হিঁয়া কৈয়্যাকসিডেণ্ট হুয়া, এক ভদ্দর আদমী—

নিরুত্তরে একটি অঙ্গুলি তুলিয়া নেপালী ভৃত্যটি বৈঠকের ঘরখানি দেখাইয়া দিল। আগন্তুক তরুণটিও আর কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরখানির দিকে সবেগে পদচালনা করিল।

কিন্তু দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া কক্ষাভ্যন্তরে দৃষ্টি প্রসারিত করিতেই সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। এখানে একসঙ্গে এতগুলি আধুনিকা

তরুণীর সমাবেশ সে প্রত্যাশাই করে নাই। কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

কক্ষের তরুণীরাও মুখের উপর গাম্ভীর্য্য টানিয়া ও চক্ষুতে কৌতূহল ছড়াইয়া নবাগতের দিকে চাহিতেই বুঝিল, সেই-ই তাহাদের প্রতীক্ষ্য আসামী, নদার হরিদাস গাঙ্গুলীর পুত্র, এম-এ শ্রেণীর ছাত্র শিবদাস গাঙ্গুলী। বয়স বড় জোর একুশ কিম্বা বাইশ, সুন্দর সুশ্রী চেহারা, মুখে দিব্য কোমলতার ছায়া, দেখিলেই মনে স্বভাবতঃ যেন মায়ার সঞ্চার হয়। অঙ্গের পরিচ্ছদে ও মাথার কেশ পারিপাট্যের পরিচয় পাওয়া যায়; চোখে সোনার ফ্রেমে আঁটা চশমা। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ছেলেটির প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে সহজেই ধরিতে পারা যায় যে, পড়াশুনা ও বাবুয়ানার দিকে তাহার মনের যতটুকু প্রভাব, বিষয়বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির ঠিক ততটুকু অভাব।

ছেলেটির মুখ দিয়াই প্রথমে কথা বাহির হইল। বার দুই কাসিয়া, গলাটি পরিষ্কার করিয়া, একান্ত কুণ্ঠিতভাবেই সে কহিল—দেখুন, আমি য়ুনিভারাসটি কলেজ থেকে আসছি। এক ভদ্রলোক আমার ক্লাসে খবর দেন, এই রাস্তায় একটা য়্যাকসিডেণ্ট হয়েছে, আমারই কোন আত্মীয় নাকি—

কথাটা তাহাকে শেষ করিবার অবসর না দিয়াই সভানেত্রী অনীতাদেবী গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন—বুঝিছি, আপনিই তাহ'লে শিবদাস গাঙ্গুলী, ফিফথ্ ইয়ারে পড়েন। নমস্কার!—ভেতরে আসুন, বসুন।

ছেলেটিও সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুখানি যুক্ত করিয়া ললাটে তুলিল, তাহার পর ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল—বুঝতেই পারছেন, খবরটা পেয়েই কি রকম 'ডেস্পারেট' হয়ে এখানে ছুটে এসেছি—

কৃত্রিম সমবেদনার সুরে অনীতা দেবী কহিলেন—তা ত দেখতেই পাচ্ছি!

অসহিষ্ণুভাবে ছেলেটি কহিল—তা হ'লে এখনও আমাকে সন্দেহে রাখছেন কেন? তিনি কে, সেইটিই আগে বলুন ত; সহরে আমার অনেক আত্মীয় আছেন, কিন্তু তিনি—

বেশ সহজ সুরেই অনীতা দেবী কহিলেন—আমি আপনাকে বলছি শিবদাসবাবু, তাঁর জন্য আপনার এতটা উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই; আপনি বসুন, আপনাকে সবই বলছি।

গোল টেবিল ও তাহার চারিধারের চেয়ারগুলির সহিত সংস্রব কাটাইয়া যে কেদারাখানি ঘরের কোণের দিকে ছোট একটি টিপয়ের সম্মুখে শূন্য পড়িয়াছিল, অনীতা দেবী হাত বাড়াইয়া সেইটি দেখাইয়া দিলেন।

অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া চেয়ারে আসীনা তরুণীদের অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে বসিতেই কক্ষ-প্রাচীরে একখানি সুবৃহৎ ছবির নিচে টাঙ্গানো কালো রঙ্গের ফলকটির বুকে লেখা সাদা হরফগুলির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল; দুই চক্ষু অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ করিয়া সে পড়িল—কুমারী-সংসদ!

তৎক্ষণাৎ সে য়্যাকসিডেণ্টের কথা ভুলিয়া গেল, আহত আত্মীয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা কোথায় সরিয়া পড়িল, মনে জাগিল একটা অনিশ্চিত আতঙ্ক ও গভীর বিস্ময়। কিছুদিন হইতেই এই ভয়াবহ সংসদের নাম অবিবাহিত তরুণসমাজের চিত্তে রীতিমত শিহরণ তুলিয়াছে। বিশেষতঃ যে সকল পণগ্রাহী অভিভাবক কৃতবিদ্য পুত্রদের দিকে চাহিয়া চক্ষুর পরদা অনায়াসে তুলিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের ছেলেদেরই বেশী ভয়—কুমারী-সংসদ গোয়েন্দাগিরি করিয়া পাছে তাহাদিগকেও টানিয়া রাস্তার 'ডাষ্ট-বিন'এ নামাইয়া দেয়। সুতরাং কুমারী-সংসদের নামটি পড়িবামাত্রই পিতৃগুণ-সর্ব্বজ্ঞ পুত্র শ্রীমান্ শিবদাস যদি চমকিত হইয়া উঠে, তাহাতে চমৎকৃত হইবার কিছু নাই।

মনের বিস্ময়টুকু চাপিবার চেষ্টা না করিয়াই শিবদাস রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—আমি কি তা হ'লে কুমারী-সংসদেই উপস্থিত হয়েছি ?

প্রশ্নকর্তার মুখের উপর প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া স্বচ্ছন্দ স্বরে অনীতা দেবী উত্তর দিলেন—আজ্ঞে হাঁ ; আপনার সম্বন্ধে সংসদ আজ এই ইমারজেন্সি মিটিং কল্ করেছেন ; আর—আপনি যাতে 'উইদাউট ফেল' ঠিক সময়ে হাজির হন, সেই জন্যই এই 'আন্‌ফেভারেবল্ সীন' একটা ক্রীয়েট ক'রে 'অ্যাক্‌সিডেণ্টে'র ঐ 'ফাউল-প্লেটা' করতে হয়েছে ; আসলে কিন্তু খবরটা—'ফল্‌স্' ।

শিবদাসের মুখের অস্ফুট স্বর গভীর বিস্ময়ের সহিত বাহির হইল —ফল্‌স্ !

সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় বিচলিত হইয়া সে সবেগে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সঙ্গে সঙ্গে তরুণী-সমাজও যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সভানেত্রী অনীতা দেবী শিক্ষয়িত্রীর গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ প্রখর-দৃষ্টিতে শিবদাসের দিকে তাকাইয়া আদেশের স্বরে কহিলেন—দাঁড়ান, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না। আপনার বিরুদ্ধে একটা গুরুতর নালিশ এসেছে সংসদের কাছে, সেই জন্যই আপনাকে এখানে হাজির করা হয়েছে, বুঝেছেন ?

নালিশ—তাহার বিরুদ্ধে কুমারী-সংসদের কাছে ! এ কথাও নীরবে শিবদাস শুনিতেছে ? ছাত্রসুলভ আত্মমর্য্যাদার অভিমান ক্ষণিকের জন্য তাহাকে উগ্র করিয়া তুলিল ; কিন্তু নিরুত্তরে কক্ষত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেই সে সবিস্ময়ে দেখিল, দুই স্থূলকায়া তরুণী তাহাদের চেয়ার দুইখানি ঘুরাইয়া ইতিমধ্যেই বাহিরে যাইবার দরজাটি একেবারে রুদ্ধ করিয়া বসিয়াছে ; পৌরুষের অভিমান সেই মুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া তাহার দুই চক্ষুর

দীপ্তিও মলিন করিয়া দিল। ছাত্রসমাজে কোনও দিনই উদ্ধত বলিয়া শিবদাসের দুর্নাম ছিল না, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও সে অবাধ্য না হইয়া একেবারে হতবুদ্ধির মতই আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিল—আপনাদের যা ইচ্ছা হয় করুন, আমি 'সারেণ্ডার' করছি।

গম্ভীর মুখে মায়া কহিল—বুদ্ধিমানের মতই কাজ করেছেন।

একটা চাপা হাসির আবর্ত্ত বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে অবস্থিত মেয়েটির মুখখানি পর্য্যন্ত আরক্ত করিয়া দিল, কিন্তু এ কক্ষে দণ্ডায়মান অভিভূত পুরুষটির চিত্তে তাহাতে কোনও বিক্ষোভ উঠিল না; সে শুধু আড়ষ্ট হইয়া ভাবিতেছিল, তাহার জীবনে এ পর্য্যন্ত এমন দুর্ভোগ বুঝি আর কোনও দিন আসে নাই।

—এই চিঠিখানা বোধ হয় চিনতে পেরেছেন?

চমকিত হইয়া শিবদাস চাহিয়া দেখিল, বয়োজ্যেষ্ঠা মেয়েটি খামেভরা একখানি চিঠির দিকে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া এই প্রশ্ন করিতেছে। নির্ব্বাক্ নয়নে সে চিঠিখানার দিকে চাহিয়া রহিল, কোনও কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অনীতা দেবী এবার একটু শ্লেষের সুরেই কহিলেন—চিনতে পারলেন না? কিন্তু এত শীঘ্র ত ভোলবার কথা নয়, চেনা উচিত ছিল আপনার!

শিবদাস আমতা আমতা করিয়া কহিল—আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।

চিঠিখানার কথা মনেও পড়ছে না আপনার? আচ্ছা, না হয় এর 'ইন্‌ট্রোডাকশানটা' ধরিয়ে দিচ্ছি; চাঁপাতলা পার্কে যে অপরিচিতা মেয়েটিকে কিছুদিন 'ফলো' করেছিলেন, নিশ্চয়ই তার কথা ভোলেন নি?

—আমি?

—তারপর তাকে জয় করে 'ইলোপ' করবার অভিসন্ধিতে যে 'লাভ লেটার'খানা তার পায়ের তলায় দাখিল করেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন—

—আমাকে বলছেন এসব কথা আপনি—আমাকে ?

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে অনীতা দেবী কহিলেন—আজ্ঞে হাঁ, এবার 'কন্‌ক্লুসন্'টাও শুনুন—সেই অপরিচিতা মেয়েটি সরলা বালিকার মত আপনাকে ফলো না ক'রে, আপনার নেমন্তন্নর চিঠিখানা আমাদের হাতেই ফেলে দিয়েছেন।

বিবর্ণমুখে শিবদাস কহিল—আপনি ত আমার বিরুদ্ধে একতরফাই যা তা ব'লে চলেছেন !

খামের ভিতর হইতে খপ করিয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া অনীতা দেবী জোর কণ্ঠে কহিলেন—যা বলেছি মুখে, তার অব্যর্থ প্রমাণও আমাদের হাতে। এই চিঠিখানাই আপনি সেই মেয়েটিকে লিখেছিলেন, এখন আমাদের হাতে এসে আপনার মৃত্যুবাণ হয়েছে।

—আপনারা আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ভুল করেছেন, কোন মেয়েকেই আমি কোন রকম খারাপ চিঠি জীবনে কখনও লিখিনি, এমন নীচ মনোবৃত্তি আমার নয়।

—কিন্তু চিঠিতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে—আপনার রূপমুগ্ধ শ্রীশিবদাস গঙ্গোপাধ্যায়, য়ুনিভারসিটি বিল্ডিং'স্, ফিফ্‌থ ইয়ার ক্লাস, ইংলিস, গ্রুফ সি, রোল নম্বর সাতাশ। আপনি এগুলো মিথ্যা বলতে চান ?

—আমার নাম, কলেজ, ক্লাশ, গ্রুফ, নম্বর এ সব মিথ্যে কি ক'রে বলব ! তবে চিঠিখানা মিথ্যে।

সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি মেয়ে আপনার নামে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে খামকা চিঠি লিখেছেন—এতগুলি মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি এ কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন ?

আমিও ভদ্রসন্তান এবং ছাত্র-মহলে আমার যথেষ্ট সুনাম আছে।

—এ চিঠি আপনি লেখেন নি, শপথ ক'রে এ কথা বলতে পারেন ?

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু লেখা যদি আপনার হাতের হয় ?

দৃঢ়স্বরে শিবদাস উত্তর করিল—অসম্ভব! এ হ'তেই পারে না। আচ্ছা, অনুগ্রহ করে চিঠিখানা এক মিনিটের জন্যে আমাকে দিন, আমি একবার দেখতে চাই।

অনীতা দেবীর মুখে ক্রুর হাসি ফুটিয়া উঠিল, স্বর একটু রুক্ষ করিয়া কহিলেন—আমি এতটা নির্ব্বোধ নই যে, একমাত্র প্রমাণটি এক মিনিটের জন্য হাতছাড়া করব!

শিবদাস হতাশের স্বরে কহিল—তা হ'লে আমি নিরুপায়।

অনীতা দেবী মনে মনে ভাবিবার ভঙ্গিতে ক্ষণকাল চুপ করিয়া সহসা কহিলেন—দেখুন, একটা উপায় আছে; আমি এই চিঠির বয়ানটা ডিক্‌টেট্ করি, আপনি লিখুন; তার পরে দুখানা চিঠির হস্তাক্ষর 'কম্পেয়ার' করলেই সত্য মিথ্যা ধরা যাবে।

সরল বিশ্বাসে শিবদাস যেন এতক্ষণে অকূলে কূল পাইল; কহিল—আমার আপত্তি নেই।

অনীতা দেবী কহিলেন—তা হ'লে যেখানে বসেছিলেন, সেইখানেই বসুন; পাশের টিপয়ে সাদা প্যাড, কালি, কলম সবই আছে।

শিবদাস চেয়ারে বসিয়া টিপয়ের দিকে ঝুঁকিতেই দেখিল, তাহার উপর হাল্কা রঙের চিঠির কাগজের প্যাড, লেফাফা, কালি, কলম সমস্তই

সাজান রহিয়াছে। কলমটি কালির দোয়াতে ডুবাইয়া লিখিবার উদ্দেশে অনীতা দেবীর মুখের দিকে চাহিতেই তিনি হাতের চিঠিখানি লিখাইবার ভঙ্গিতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন :—

য়ুনিভারসিটি বিল্ডিংস,
পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস,
গ্রুপ সি, রোল ২৭,

অপরিচিতা রূপসী,

পার্কে আপনি নিত্য আসেন, আমিও আসি। আপনি আমাকে দেখিয়াছেন, আমিও আপনাকে দেখিয়াছি ; এবং প্রথম দিন দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছি, আত্ম হারাইয়াছি, আমার মন প্রাণ সমস্তই আপনার উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি। আপনি কে, কিবা নাম, কোথায় ধাম, কোন্ জাতি, কিছুই জানিতে চাহি না, যে হেতু প্রেমের পথে কোনো বাধাই থাকে না, ও-সবের বালাই নাই। আমি আপনাকে ভালবাসিয়াছি, আমি আপনাকে চাই। আমার পরিচয় সংক্ষেপে এই পত্রে জানাইতেছি,—বি, এ পাশ করিয়াছি, এম, এ পড়িতেছি। কিন্তু আর পড়িবার ইচ্ছা নাই। বাবার প্রচুর পয়সা ও ভূসম্পত্তি আছে, আমি একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমার হাতেও অর্থের অভাব নাই। আপনাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছি, আপনি বুদ্ধিমতী, আমার অভিপ্রায়ও যে বুঝিতেছেন, এ আশা রাখি। কাল এই সময় আপনার মনের কথা জানিতে চাহি। যে-ভাবে আমি পত্র দিলাম, আমার মর্ম্মব্যথা আপনাকে জানাইলাম, আশা করি, আপনিও এইভাবে আমাকে পত্র দিবেন ও প্রতীক্ষা করিবেন।

আপনার রূপমুগ্ধ
শ্রীশিবদাস গঙ্গোপাধ্যায়

লেখা শেষ হইলে শিবদাস বিরক্তির সহিত কলমটি টিপয়ের উপর ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল।

অনীতা দেবী কহিলেন—হাতের কাজটুকু এখনো সব শেষ হল না। চিঠিখানা ভাঁজ করে খামে ভরুন, তারপর উপরে লিখুন—অপরিচিতা প্রেয়সী।

আদেশমত অবশিষ্ট কাজটুকু শেষ করিয়া শিবদাস খামখানি অনীতা দেবীর সম্মুখে টেবলের উপর ছুড়িয়া দিল, তাহার পর রুক্ষস্বরে কহিল—এবার মিলিয়ে দেখতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি যা 'ডিক্‌টেট' করলেন, নিজের হাতে কলমে ফুটিয়ে আমি নিজেই তার জন্য লজ্জা অনুভব করছি।

গম্ভীর মুখে অনীতা দেবী উত্তর দিলেন—লজ্জা অনুভব করাই উচিত।

চিঠির দিকেই শিবদাসের চক্ষু পড়িয়াছিল; সে সবিস্ময়ে দেখিল, অনীতা দেবী চিঠি দুইখানি না মিলাইয়াই একটা ফাইলের মধ্যে বাঁধিতেছেন। তৎক্ষণাৎ সে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কহিল—কৈ, 'কম্পেয়ার' করলেন না ত!

একটু হাসিয়া অনীতা দেবী কহিলেন—কম্পেয়ারের জন্যই ত ফাইলে বেঁধেছি, হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞের কাছেই এটা চলেছে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে কাল ঠিক তিনটের সময় এখানে আসবেন; যা রেজাল্ট হয়, জানতে পারবেন। আচ্ছা, নমস্কার। আপনি এখন যেতে পারেন, আমাদের আবার কতকগুলো প্রাইভেট কাজ আছে।

ইহার পর আর থাকা চলে না, চিঠির কথাও পুনরায় উত্থাপন করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। অগত্যা অনীতা ও অন্যান্য মহিলাদের উদ্দেশে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া শিবদাস উঠিয়া পড়িল। যে দুই তরুণী চেয়ারশুদ্ধ

কক্ষদ্বার আগুলাইয়া বসিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বেই তাহারা দ্বারদেশ ছাড়িয়া টেবিলের দিকে পুনরায় সারিয়া গিয়াছিল।

শিবদাস ফটক পার হইয়া গেলে কক্ষমধ্যে নিভার ডাক পড়িল, পরদা ঠেলিয়া সে পুনরায় দেখা দিল।

একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—আসামীকে ত দেখলে, পছন্দ হ'ল ?

নিভা মুখখানি হেঁট করিয়া দাঁড়াইল, কোনও উত্তর নাই।

অনীতা দেবী কহিলেন—আমরা করলুম 'ইন্‌ট্রোডাকশান্‌', তুমি করবে নিভা 'কন্‌ক্লুশান্‌',—অবশ্য, মায়া তোমাকে তালিম দেবে।

মায়া হাসিয়া কহিল—নিভা যে জিতবে, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই ; আসামী একদম নীরেট, বিষয়বুদ্ধি কিছুই নেই।

চাঁপা কহিল—থাকলেও এ ক্ষেত্রে একবারে 'পাজল্‌' হয়ে গেছে। এখন নিভা খেলিয়ে তুলতে পারলে হয়।

অনীতা দেবী কহিলেন—যাতে ও 'সাকসেস্‌ফুল' হয়, এখন থেকেই ওকে নিয়ে তুমি তার রিহারস্থাল দাও, মায়া! আপাততঃ আমরা জলধর চ্যাটার্জ্জীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাভঙ্গ করছি, আসামীকে এভাবে আমরা এত শীগ্‌গীর গ্রেপ্তার করতে পেরেছি তাঁরই সৌজন্যে।

নয়

পরদিন শিবদাস যখন এই কক্ষে প্রবেশ করিল, তখনও তিনটা বাজে নাই, বাজিতে মিনিট দশেক বাকী আছে। কিন্তু সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, গোল টেবিলখানি পরিবেষ্টন করিয়া চেয়ারগুলি যথাযথ ভাবে থাকিলেও, পূর্ব্বদিন যাঁহারা সেগুলির শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই নাই!

দেউড়ীতে সেই নেপালীই দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে সসম্ভ্রমে জানাইল যে, মা-জীলোক আজ এখনও আসেন নাই, আসিবেন কি না ঠিক নাই।

তাহার কথা শিবদাসের মনে ধরিল না, তাঁহারা যখন সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কি ব্যতিক্রম হইবে? কিন্তু এখনও ত তিনটা বাজে নাই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পর কি ভাবিয়া সে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মিনিট দুই পরেই ঘড়িতে তিনটা বাজিল এবং ঘড়ির বাজনার তালে তালেই যেন সেই ঘরের ভিতরে ঢুকিল এক সুবেশধারিণী রূপসী তরুণী। তাহার রূপের প্রভায় ও সজ্জার ছটায় ঘরখানির শোভা যেন উছলিয়া উঠিল। নবাগতা তরুণীকে দেখিয়াই শিবদাস সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সংযুক্ত করে ললাট স্পর্শ করিয়া সলজ্জ-ব্যগ্র-কণ্ঠে কহিল—এই যে এসেছেন! আমি মিনিট কতক আগেই এসে পড়েছি; কিন্তু আপনি যে একা?

দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি শিবদাসের মুখের উপর স্থাপন করিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে মেয়েটি প্রশ্ন করিল—আপনি কে?

শিবদাস অবাক্! বুঝিতে পারিল না, এ প্রশ্ন করিবার কি অর্থ!

কাল এই সময় এই কক্ষে যাহাদের সমক্ষে সে এক ঘণ্টারও উপর আদালতের আসামীর মত জবাবদিহি করিযাছে, আজ তাহাদেরই এক জন তাহাকে দেখিয়া অপরিচিতার মত প্রশ্ন করিতেছে—আপনি কে ?

শিবদাস একটু হাসিয়া কহিল—এর মধ্যেই ভুলে গেলেন! কাল যে এখানেই আপনাদের কোর্টে আসামীর হালে হাজির হয়েছিলুম।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তরুণী কহিল—মাপ করবেন, আমি আপনার কথাগুলো 'য়্যাপ্রিসিয়েট' করতে পারলুম না, সম্ভবতঃ আপনি অপর কোনও মেয়েকে 'মীন্' করেই আমাকে এ সব কথা বলছেন।

অতঃপর সে শিবদাসের দিকে আর কোন মনোযোগ না দিয়াই তাহার পাশ কাটাইয়া দূরবর্ত্তী একখানি চেযারে গিযা বসিল ?

স্তব্ধবিস্ময়ে শিবদাস এই অদ্ভুত মেযেটির মুখের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া চাহিল, সংশয় তাহার মনটির ভিতর ক্রমাগতই দ্বিধা তুলিতেছিল—সত্যই কি সে ভুল করিযাছে! সহসা তাহার মনে একটা অনুভূতি এই সময় বদ্ধমূল হইল, কল্যকার বে-পরোয়া প্রগতিবাদিনীদের মধ্যে এই অনিন্দ্য-সুন্দর লজ্জানম্র সুনির্ম্মল মুখখানি সত্যই বুঝি সে দেখে নাই; দেখিলে, এ মুখ ত সহজে ভুলিবার কথা নয়, মন হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন হইতে পারে না ত!

মেয়েটি এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকেই মুখ ফিরাইযাছিল, কিন্তু শিবদাসের অপলক দৃষ্টি অব্যাহত ভাবে তাহার মুখখানির উপরেই পড়িযাছিল; সুতরাং মেয়েটি ফিরিযা চাহিতেই উভয়ের দৃষ্টির প্রচণ্ড সংঘাত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সে সবেগে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কোপ-কটাক্ষে শিবদাসের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল—আমার দিকে অমন অভদ্রের মত আপনি চেয়ে রযেছেন যে! আমাকে আপনি কি ভেবেছেন বলুন ত ?

কি বিপদ! শিবদাসের মনে হইল, চেয়ার শুদ্ধ সে ঘরের সেই প্রকাণ্ড গোল টেবলখানির চারিধারে ঘুরপাক খাইতেছে, আর কুমারী-সংসদের কল্যকার সেই বিচারিকা তরুণীটি সহসা উপস্থিত হইয়া তাহার পীঠের উপর চাবুকের নিষ্ঠুর আঘাত দিতেছে! যে অপবাদ আহার অলক্ষ্যে রচিত হইয়া এই বিভ্রাট বাধাইয়াছে, আজ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই তরুণীও সেই অপবাদের প্রাথমিক তীর তাহার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিতেছে! অথচ, সে ত মিথ্যা বলে নাই; সত্যই যে তাহার মুখের দিকে নির্লজ্জের মত সে বহুক্ষণ চাহিয়াছিল! কিন্তু কেন? শুধুই কি অনুসন্ধিৎসা, অথবা ইহার মূলে অন্য কোনও দুর্জ্ঞেয় রহস্য নিহিত আছে?

দৃষ্টি মলিন করিয়া বিবর্ণ মুখে অপরাধীর ভঙ্গিতে শিবদাস কহিল—দেখুন, আমি মিথ্যা বলব না; আপনার দিকে যে চেয়েছিলুম, তা অস্বীকার করবার শক্তি আমার নেই! কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, কোনও মন্দ অভিপ্রায় আমার মনে ছিল না, এখনও নেই। আমার সঙ্গে সামান্য সংস্রব আছে, এমন কোনও সমিতির কতকগুলি মেয়ে আমাকে ভারি সমস্যায় ফেলেছেন, আমি আপনাকেই তাঁদের এক জন 'মীন্' করেছিলুম, সেই জন্যই—

কিঞ্চিৎ প্রসন্নভাবে কণ্ঠের স্বর একটু নরম করিয়া মেয়েটি বেশ পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল—কিন্তু আপনার এভাবে 'মীন্' করাটা যে মারাত্মক ভুল হয়েছে, সে কথাটা গোড়াতেই ত আপনাকে ধরিয়ে দিয়েছিলুম! তা ছাড়া, সামনা-সামনি দেখেও আপনার মনের ধাঁধাটুকু কাটল না! আপনার বোধশক্তিও ত দেখছি চমৎকার!

তরুণীর এই প্রসন্নতায় কৃতার্থ হইয়া ও শেষের সশ্লেষ মন্তব্যে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে শিবদাস কহিল—দেখুন, ও দোষটুকু আমাদের বোধশক্তির নয়, বরং বলা উচিত—দৃষ্টিশক্তির! মাপ করবেন, আজকাল

আপনাদের কাপড়-চোপড় পরা, চলাফেরা, কথাবার্ত্তা এমনই একই ধাঁজে বাঁধা-ধরা হয়ে পড়েছে যে, খুব ঘনিষ্ঠতা না থাকলে চেনা যায় না, চোখে ধাঁধা লাগবেই। এই, আমার কথাই ধরুন না—

মেয়েটি এবার একটু হাসিয়াই মৃদুস্বরে কহিল—আপনার সম্বন্ধে আমার যা সার্টিফিকেট, সে ত আগেই দিয়েছি।

তাহার পর কণ্ঠস্বর সহসা পরিবর্ত্তন করিয়া কৃত্রিম আগ্রহের সুরে সে কহিল—আচ্ছা, আপনি ঐ যে সমিতির মেয়েদের কথা বললেন, সে কোথায়?

ফাঁড়াটি কাটিয়া যাওয়ায় শিবদাস তখন আশ্বস্ত হইয়াছে,মেয়েটির এই প্রশ্নে আপ্যায়িত হইয়া, অবশ্য চক্ষুর রাসটুকু সতর্কভাবে ধরিয়া সে ব্যগ্র-ভাবেই উত্তর দিল—কোথায় যে তাঁদের হেড্ কোয়াটার্স, তা অবশ্য জানি না, তবে কাল এই ঘরেই তাঁদের মিটিং বসেছিল।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে পুনরায় প্রশ্ন করিল—এই ঘরে? কাল? আচ্ছা, কি নামটা তাঁদের সমিতির বলতে পারেন?

শিবদাস কহিল—আপনি নিশ্চয়ই নামটা শুনেছেন—কুমারী-সংসদ।

অতিশয় বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে মেয়েটি কহিল—কুমারী-সংসদ!

কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া আর কথাই বাহির হইল না। শিবদাস চমকিত হইয়া একবার তাহার দিকে তাকাইয়াই পরক্ষণে বেত্রাহতের মত দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইল। মেয়েটি অপাঙ্গে তাহা লক্ষ্য করিয়া পরক্ষণে পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল—তা হ'লে এই কুমারী-সংসদের উদ্দেশেই কি আপনি এখানে এসেছেন?

ব্যগ্রভাবে শিবদাস উত্তর করিল—আজ্ঞে হাঁ।

আস্তে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বিস্ময়ের সুরে মেয়েটি যেন আপন মনেই কহিল—আশ্চর্য্য! একই উদ্দেশ্যে তা হ'লে উভয়ের আগমন!

সবিস্ময়ে শিবদাস জিজ্ঞাসা করিল—বলেন কি! আপনিও এখানে ওদের সন্ধানে এসেছেন?

সলজ্জ মুখে মেয়েটি উত্তর দিল—বলেন কেন! এঁদের ধাপ্পাবাজীতে ভয় পেয়ে যে ভুল ক'রে বসেছি, তার আর সারবার যো নেই, এখন রীতিমত পস্তাচ্ছি!

মনের বিপুল কৌতূহল দমন করিয়া শিবদাস আস্তে আস্তে কহিল—কি রকম?

মেয়েটি অপ্রতিভভাবে তাহার দিকে একবার চাহিয়া ও একটি নিশ্বাস জোরে ত্যাগ করিয়া কহিল—কাল টিফিনের পর সবে ক্লাসে গিয়ে বসেছি, এমন সময় আমারই বয়সী একটি মেয়ে খবর দিলে, আমার মা মোটরচাপা পড়েছেন; শুনেই তার সঙ্গে এখানে ছুটে আসি।

নিশ্বাস প্রায় রুদ্ধ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠেই শিবদাস প্রশ্ন করিল—তার পর—তার পর?

মেয়েটি কহিল—এসে জানলুম, সব ভূয়ো; ঐ খবর দিয়ে আমায় ধ'রে এনেছে আমার বিরুদ্ধে একখানা চিঠির তদারক করতে। আমি না কি পার্কের ভিতর একটা ছেলেকে একখানা কুৎসিত চিঠি দিয়েছি! আমি ত শুনেই অবাক্, এ পর্য্যন্ত কোনও ছেলের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কখনও আমি মিশিনি; অস্বীকার করলুম, কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস হ'ল না; শেষে কি করলেন শুনবেন? চিঠিখানা আমারই হাতের লেখা কি না, সেটা 'ভেরিফাই' করবার জন্য ঐ চিঠিটার লেখাগুলো ডিক্‌টেট ক'রে আমাকে দিয়েই লিখিয়ে নিলেন। কিন্তু চিঠি দুখানা ভেরিফাই করা হ'ল না; বললেন, হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টকে দিয়ে মেলাবেন; আজ তিনটার সময় খবরটা দেবার কথা, সেই সূত্রেই আসা, এবং আপনার সঙ্গে দেখা।

মেয়েটির মুখের কথা শেষ হইতেই শিবদাস উচ্ছ্বাসের সুরে

চীৎকার তুলিয়া কহিয়া উঠিল—এক্জ্যাক্টলি সেম্, এক্জ্যাক্টলি য্যান্ ইকোয়্যাল—

মেয়েটি সভয়ে চমকিত হইয়া কহিল—হ'ল কি আপনার!

শিবদাস কহিল—আমারও এই কেস্, একেবারে সিমিলার! ঐ য়্যাকসিডেণ্ট, য়্যাফ্‌ফেয়ার অফ লাভ্ লেটার, ডিটেন এণ্ড ডিক্‌টেট। শেষে হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টের ধুয়ো ধ'রে জাজমেণ্ট রিজার্ভড্! আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—পার্কে এক মেয়েকে না কি আমি বিশ্রী চিঠি লিখে অপমান করেছি!

মেয়েটি মর্ম্মস্পর্শী স্বরে কহিয়া উঠিল—কি সর্ব্বনাশ! All tarred with the same brush! তা হ'লে নিশ্চয়ই এ চক্রান্ত; কোনও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়েই ওরা এ কাজ করেছে।

শিবদাস কহিল—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এতে ওদের কি লাভ!

মেয়েটি কহিল—আমার কি ভয় জানেন, ওদের লাভ হোক আর নাই হোক, আমাদের ক্ষতি করবার মত রীতিমত অস্ত্র ওরা এই সূত্রে সংগ্রহ ক'রে রেখেছে, ইচ্ছে করলেই আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারবে।

শিবদাস নীরবে জিজ্ঞাসুনয়নে মেয়েটির মুখের দিকে চাহিল।

মেয়েটি বিবর্ণ মুখে কহিল—কি বোকা আপনি, আমাদের ভুলটুকু এখনও ধরতে পারেন নি! ধরুন, যে চিঠি ওঁরা প্রথম দেখিয়েছেন আপনাকেও, আমাকেও; স্বীকার করছি, সে চিঠি আমরা কেউ লিখিনি। কিন্তু তার পর, ওঁরা ডিক্‌টেট করতে চিঠির কথাগুলো হুবহু ত আমাদের লিখতে হয়েছে কাগজে-কলমে?—এখন আমরা কি ক'রে বলতে পারি, ঐ চিঠি আমরা লিখিনি; আপনিও না, আমিও না!

মেয়েটির যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া এবার শিবদাসের মাথা ঘুরিয়া গেল, পাংশুমুখে হতাশের স্বরে সে কহিল—সত্যই আমরা সর্ব্বনাশ করেছি,

স্বখাত সলিলে ডুবতে বসেছি! এখন বুঝতে পারছি, এই জন্যই তারা গা-ঢাকা দিয়েছে।

হঠাৎ এই সময় ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। অন্যের বাড়ী, বাহিরের লোকের সাড়া দিবার কি অধিকার! সুতরাং ঘণ্টা বাজিয়া চলিল, রিসিভার ধরিতে কাহারও দেখা নাই। সহসা মেয়েটি শিবদাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ধরব না কি?

শিবদাস কহিল—ধরুন না, এমনও হ'তে পারে, সংসদেরই কেউ ডাকছে, হয়ত ওদের খবরও এই সূত্রে পেতে পারি।

মেয়েটির পশ্চাতেই টেলিফোনের রিসিভার ছিল, সেটি তুলিয়া লইয়া সে হাঁকিল—হ্যাল্‌লো! হাঁ—ডবল টু ও ফোর—আমি?—নিভা মুখার্জ্জী…

শিবদাসের দুই কর্ণকুহরে কে যেন সহসা সুধা ঢালিয়া দিল! এতক্ষণ এই চমৎকার মেয়েটির সহিত এত কথা হইয়া গেল, কিন্তু তাহার নামটি ত এ পর্য্যন্ত তাহার কানে ঝঙ্কার তুলে নাই! নি—ভা! বাঃ! কি মিষ্টি নামটি এই মেয়েটির, তাহার আশ্চর্য্য রূপেরই অনুরূপ!

এ দিকে টেলিফোনের কথোপকথনের দিকেও শিবদাসকে উৎকর্ণ থাকিতে হইয়াছে—যদি এ আহ্বান কুমারী-সংসদেরই কোনও কুমারীর হয়!

নিভা তখন কহিতেছিল—কতক্ষণ এসেছি? এক ঘণ্টার ওপর। আজ আর আসবেন না?—হ্যাল্‌লো!—এ্যাঁ?—কাল তিনটেয়?—আচ্ছা—নমস্কার।

রিসিভার যথাস্থানে রাখিয়া নিভা কহিল—শুনলেন ত? ওঁরা আজ আর কেউ আসবেন না এখানে, চিঠি 'ভেরিফাই' এখনও হয়নি, তাই। কাল তিনটেয় ওঁদের মিটিং বসবে।

শিবদাস আশাহতের সুরে কহিল—রিসিভারটা খপ্ করে ছেড়ে দিলেন! আমাকে একবার যদি দিতেন—

অনুতপ্তের ভঙ্গিতে মৃদু হাসিয়া নিভা কহিল—ওহো! সত্যই ভারি ভুল ক'রে ফেলেছি ত! আপনি যে সশরীরে এখানে ব'সে রয়েছেন, সে কথা মনেই ছিল না। যাক্, আর একটা দিন ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা করুন—কাল তা' হ'লে আসছেন ত?

নীরস স্বরে শিবদাস কহিল—দেখি।

সন্দিগ্ধভাবে শিবদাসের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া পরক্ষণেই সকৌতুকে নিভা কহিল—দেখি নয়, আসা চাই, নতুবা কেস্‌টা হোপলেস্ হয়ে যাবে। আচ্ছা, তা হ'লে এখন ওঠা যাক্।

শিবদাস এতক্ষণে মনের সঙ্কোচ কাটাইয়া জিজ্ঞাসুভাবে নিভার দিকে চাহিয়া কহিল—দেখুন, আমাদের দুর্দ্দশার বিষয় আমরা দুজনেই জেনেছি, কিন্তু পরস্পরের পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

নিভা মৃদু হাসিয়া কহিল—এ আফশোসই বা থাকে কেন? আমার পরিচয় আগেই ব্যক্ত করছি; অতি সংক্ষিপ্ত সাধারণ বিষয়—সংসারে আপনার বলতে আছেন শুধু মা, আমিই একমাত্র সন্তান—নিঃস্ব এবং অসহায়া দুই-ই; ভদ্রঘরের কতকগুলি মেয়েকে ভালভাবে পড়াবার জন্য এক স্কুল হয়েছে, তাদের শিক্ষার ভারটুকু নিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করি।

শিবদাস মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া কহিল—এই বয়সে নিজের পায়েই নিজে দাঁড়াবার উপায় খুঁজে নিয়েছেন, এ ত খুবই গৌরবের কথা, একটা সত্যকার পরিচয়!

মুখখানি আরক্ত করিয়া মৃদুকণ্ঠে নিভা কহিল—আপনার পরিচয়টুকুও যে জানতে ইচ্ছা হয়।

আমি পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়ছি, এখনও ছাত্রজীবন চলেছে, আপনার মত উপায়ক্ষম হতে পারিনি। আমার নাম শিবদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

কণ্ঠস্বর কৃত্রিম শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত করিয়া নিভা কহিল—আপনার পরিচয় পেয়ে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও গভীর হয়ে উঠল! এই বয়সে আপনি ত অনেক দূর এগিয়ে পড়েছেন দেখছি। আচ্ছা, নমস্কার, কাল তা হ'লে আবার এখানে দেখা হচ্ছে।

শিবদাস প্রতিনমস্কার করিয়া মিনতির সুরে কহিল—যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত—

ফিক করিয়া হাসিয়া নিভা কহিল—গিয়ে পৌছে দিয়ে আসতে চাইছেন ত? কিন্তু বুঝতেই পারছেন, 'ফেউ' এখনো আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে, কলঙ্ক থেকে এখনো আমরা অব্যাহতি পাইনি; সুতরাং এ অবস্থায় কি এটা উচিত হবে?

অন্তরে ব্যথা পাইয়া কাতরভাবে শিবদাস কহিল—তবে থাক্।

নিভা কহিল—তা হ'লে আপনি আগেই বেরিয়ে পড়ুন, আমি একটু অপেক্ষা ক'রে পরে যাব; একসঙ্গে দুজনের যাওয়াটাও ঠিক নয়।

নিষ্পলকনেত্রে নিভার দিকে আর একবার চাহিয়া বিবর্ণ মুখে শিবদাস ফটকের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনের ভিতরে তখন উদ্বেগের বিভিন্নমুখী দুটো তরঙ্গ সবেগে বহিয়া চলিয়াছে। নিজের হাতে লেখা চিঠিখানার পরিণতির সঙ্গে কুমারী-সংসদের আফিসে অপ্রত্যাশিতভাবে পরিচিতা তাহারই সমদুখিনী তন্বী সুন্দরী কিশোরীটির বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভ মুখের হাসিটি মিশিয়া একি অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব করিল!

শিবদাস ফটকের বাহিরে অদৃশ্য হইতে না হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের পরদা ঠেলিয়া বিদ্যুল্লতাটির মত মায়া ছুটিয়া আসিযা নিভাকে জড়াইয়া

ধরিল, কলহাস্যে ঘরখানি মুখরিত করিয়া কহিল—থ্যাঙ্ক'য়ু সিষ্টার! খাসা অভিনয় করেছ, একেবারে 'অ্যান্ প্যারাল্যাল'।

মুখখানা বাঁকাইয়া ও চিত্ররেখার মত অপূর্ব্ব ভুরুদুটি নাচাইয়া নিভা কহিল—থামো, তোমার শিক্ষার তালিম দিতে গলা আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে।

নিভার চিবুকটি সস্নেহে নাড়িয়া দিয়া মায়া কহিল—তার ব্যবস্থা এখনই হচ্ছে। কিন্তু ও ভদ্রলোকটি যে ঘণ্টাখানেকের খেলাতেই মনটি এখানে হারিয়ে ফেলেছে, তার নিদর্শন স্পষ্ট পেয়েছি। অতএব, ভয় নেই, জিত্ আমাদের হবেই।

দশ

লাউডন ষ্ট্রীটের প্রান্তভাগে সাহেবী ফ্যাসানের একখানি ছোট বাড়ী। ছোট হইলেও বাড়ীর সামনে একটু হাতা আছে, ফটক হইতে তাহার বুক চিরিয়া লাল কাঁকরের সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি বারান্দার কোলে গিয়া মিশিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে টবে বসানো বাহারি গাছের সারি; হাতার দুইটি অংশই ফুটন্ত মরশুমি ফুলের বাহারে ঝকমক করিতেছে। হাতার কিনারা লোহার রেলিংয়ে ঘেরা। সামনের সরু বারান্দাটি ছোট একখানি টেবিল ও কয়েক খানি চেয়ার দিয়া সাজানো। বারান্দার পরেই সুবৃহৎ হলঘর; তাহার দুই ধারে দুইখানি ছোট ছোট কামরা, পিছনেও সামনের মত একখানি বারান্দা, তাহার পাশ দিয়া কার্পেট-মণ্ডিত কাঠের সিঁড়ি দোতালায় গিয়াছে। উপরের আয়তন নিম্নের অনুরূপ হইলেও বাঙ্গালী পরিবারের গৃহস্থালীর উপযুক্ত আসবাব ও তৈজস পত্রে ঘরগুলি পূর্ণ। নিচের তালাটিই আগাগোড়া এই অঞ্চলের ইয়োরোপীয় অধিবাসীদের রুচি-অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত। আমাদের প্রয়োজনও এই অংশেই।

গেটের বাম দিকে অনুচ্চ, সুশ্রী প্রাচীর সংলগ্ন পিতলের প্লেটে স্ক্রিপ টাইপের ছাঁদে ইংরাজীতে গৃহ ও গৃহস্বামীর যে পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে তাহা এই :

জজ ভিলা

রায় এ, সি, মুকার্জ্জী বাহাদুর

রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট য্যাণ্ড সেসন্স জজ

রাস্তার যে ফুটপাথে এই গেট, সেই দিকের বাড়ীগুলির নাম ও নম্বর দেখিতে দেখিতে তিনটি মেয়ে জজ ভিলার সম্মুখে আসিয়াই সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। যুগপৎ তাহাদের মুখগুলি যেন হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বেলা তখন আটটা, এইমাত্র সন্নিহিত একটি গীর্জ্জার ঘণ্টা সরবে সময়টা জানাইয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া তিনটি মেয়ের হাতেই এক এক গাছি সোণার চুড়ির পাশে ব্রেসলেটের মত 'রিষ্ট ওয়াচ' রহিয়াছে। মেয়ে তিনটি যে খুব আধুনিকা, তাহাদের সাদাসিদা সাজসজ্জা ও অসঙ্কোচ গতিভঙ্গিতেই প্রকাশ পাইতেছিল। একই ধরণের পেটা পাড়ের শাড়ী, হাল্কা রঙ্গের ব্লাউস, কানে ঝুমকো লতার মত হালফ্যাসানের দুল, পায়ে স্যাণ্ডেল। কিন্তু অঙ্গসজ্জার আকর্ষণে পথচারী কোন রূপপিয়াসী ইহাদের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইলে যে হতাশ হইয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইবে তিনটি মেয়ের তিন খানি মুখ যেন সগর্ব্বে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

মেয়ে তিনটিকে আমরা কুমারী-সংসদের বৈঠকে দেখিয়াছি, তবে ইহাদের রূপবর্ণনা সে সময় সম্ভব হয় নাই, প্রয়োজনও পড়ে নাই। কলেজে সহপাঠিনীদের মধ্যে এই তিনটি মেয়ে বপুর প্রাচুর্য্যে 'ধুম্‌সী' আখ্যা পায়, আর সংসদের সতেরটি সদস্যের মধ্যে ইহাদিগকেই যাবতীয় দুঃসাহসিক ব্যাপারে দৈহিক পটুতার খাতিরে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে হয়। এমনকি, সবিতা দেবীর সম্পর্কে ছয় জন বিশিষ্ট সদস্যকে লইয়া গঠিত কমিটির মধ্যেও এই তিনটি মেয়ে সভানেত্রী কর্তৃক মনোনীত হইয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট এবং স্থুল বপুর মত মেয়ে তিনটির নামও প্রশস্ত। যথা—সত্যভামা সান্ন্যাল, গোদাবরী গুপ্তা ও তিলোত্তমা তালুকদার। পদবি হইতেই বুঝা যাইতেছে, ইহারা তিনটি বিভিন্ন শ্রেণী ও পরিবারের বচ্ছা, কিন্তু ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য এমনই বিস্ময়াবহ যে, মনে হয় যেন একই বংশলতা-সঞ্জাত একই বর্ণের তিনটি অপরিজিতা ফুল ইহারা।

মোটা মোটা লোমবহুল হাত, ভারিভুরি গোলাকার মুখ, পুরু পুরু ঠোঁট, স্থূল বপু, উপরন্তু চিকণ কালো রং মেয়েগুলির সৌন্দর্য্যকে যতই দাবাইয়া রাখুক না কেন,ইহাদের টিকালো নাক, ভাসা ভাসা টানা চোখ, মাথার নিচে কুণ্ডলীবদ্ধ এলো খোঁপার বিপুল আয়তন এবং সর্ব্বাঙ্গের স্বাস্থ্য-গত আঁটসাট নিটোল বাঁধুনি যেন দর্শকদের চোখে আঙ্গুলি দিয়া জানাইতে চায় যে রূপসী এবং সুশ্রী না হইলেও ইহাদিগকে শ্রীহীন বলা যায় না। কলেজের সহপাঠিনী এবং সংসদের সভ্যরা ভাল করিয়াই জানে, এই তিনটি মেয়ের রূপের অভাব পূর্ণ করিয়া দিয়াছে ইহাদের উচ্ছ্বলিত প্রাণ। একটুতেই যেন ইহারা হাসিতে লুটাইয়া পড়ে, পক্ষান্তরে ইহাদের সম্মুখে নারীত্বের প্রতি কোনরূপ অসম্মান ঘটিলে প্রত্যেকের মুখে এমন এক অনমনীয় দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠে যে, মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার না হইয়া পারে না। তিনটি মেয়েরই উৎসাহ অদম্য, ব্যগ্রতা যেন মজ্জাগত, লজ্জা বা সঙ্কোচ চলার পথে ইহাদিগকে বাধা দিতে অসমর্থ। বয়সের দিক দিয়া মেয়ে তিনটির মধ্যে দুই-চারি মাসের পার্থক্য থাকিলেও দেখিলেই সময়স্কা মনে হয় এবং এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে প্রত্যেক মেয়েটিই বাইশ তেইশ বছরের 'ধুমসী'। কিন্তু কলেজের খাতা এবং জন্মকোষ্ঠির পাতা দেখিলে প্রতিপন্ন হইতে পারে, এখন পর্য্যন্ত তিন জনেই সতেরোর সীমা-রেখার মধ্যে আবদ্ধ আছে।

গেটের গায়ে আঁটা পিতলের ফলকটির উপর তিনজনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইবামাত্র সত্যভামা কহিল—এই বাড়ী। ঐ ছাখ্ গিল্টির হরফ জ্বল্ জ্বল্ করছে—জজ ভিলা।

শ্রীমতী গোদাবরী কহিল—নিচের লাইন হচ্ছে, রায় এ, সি, মুকাৰ্জ্জী বাহাদুর।

শ্রীমতী সত্যভামা ফলকের শেষ লাইনটি পড়িল—রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট

য়্যাণ্ড সেসন্‌স জজ। যাই হোক, বাইরের ফলক পড়েই বোঝা গেল— লোকটার প্রকৃতি কি রকম। যে পদ খসে গেছে অনেকদিন আগে, তার বড়াই করে গেটে সাইনবোর্ড ঝোলাতে লজ্জা নেই।

হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া সত্যভামা কহিল,—কাজেই বউ যদি বেহেস্তে এন্তেজাম করে থাকে, আর একটি বউ আনতে নির্লজ্জ হওয়াই এই জজ সাহেবটির পক্ষে স্বাভাবিক!

শ্রীমতী তিলোত্তমা নামে মেয়েটি গেটের লোহার দরজার মজবুত গরাদগুলির ফাঁক দিয়া ভিতরের দিকে চাহিযাছিল। সে কহিল— ঠিক। তার সাক্ষীও রয়েছে প্রচুর। ভিতরে নজর পড়লেই দেখতে পাবে।

সত্যভামা ও গোদাবরী তাহার দেখাদেখি গরাদের উপরে মুখখানি রাখিযাই হাসিয়া ফেলিল।

—ওরে বাবা, এযে একবারে 'ইডিন গার্ডেন'

—ফুলে ফুলে যে ধূল পরিমাণ!

তিলোত্তমা কহিল—কিন্তু দ্বার যে রুদ্ধ, দ্বারীর টিকিও ত দেখছিনে।

গোদাবরী কহিল—কি দরকার দ্বারীকে, সরাসরি খোদ গৃহস্বামীকে ধরা যাক—

বলিয়াই তাহার বিপুল দেহভার দরজার উপর সমর্পণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে একদিকের কপাটখানি একটা কর্কশ আর্ত্তনাদ করিযা ঘুরিয়া গেল!

সত্যভামা হাসিয়া কহিল—ট্রেসপাসের চার্জ্জে জজ সাহেব যদি সেসন-সোপরদ্দ করেন?

গোদাবরী উত্তর করিল—কোন নারী কখন ট্রেসপাসের চার্জ্জে পড়েছে শুনেছ? বরং দ্বারী এবং গৃহী উভয়েই নারীর ট্রেসপাস নিশ্চয়ই পছন্দ করে।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া তিলোত্তমা কহিল—কিন্তু সে নারী আলাদা; সাবিত্রী, শক্তি কিংবা মায়া হ'লে একথা খাটত।

সত্যভামা কহিল—আর আমাদের ত্রিমূর্ত্তিকে দেখবামাত্রই জজ সাহেবের হার্ট-ফেল করবার জো হবে!

ফটকের সামনেই লাল কাঁকরের রাস্তা, দুই পাশের হাতায় উৎপন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর মরশুমি ফুলের বাহার দেখিতে দেখিতে ইহারা সুশ্রী বারান্দাটির উপর উঠিল। বারান্দার দেওয়ালের গায়ে টুপি ও ছড়ি রাখিবার বাহারী র‍্যাক, ফ্রেমে বাঁধা ছোট ছবি; সামনের দিকে স্থানে স্থানে লোহার শিকলিতে বাঁধা সজল টবে জলচর মরশুমি পাতার বাহারী গাছ ঝুলিতেছে।

দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিলোত্তমা কহিল—এক ডজন ছবির মধ্যে জজ সাহেবের জাতভাই একটিও নেই—সবাই নারী; গোলেবকাউলি থেকে গহরজান পর্য্যন্ত কেউ বাদ পড়েন নি।

সত্যভামা কহিল—এতেই গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, নিশ্চয়ই ইনি এক নম্বরের নারী-সাধক!

গোদাবরী চারিদিকে চাহিয়া কহিল—ব্যাপার কি, গেট থেকে বারান্দা পর্য্যন্ত জনশূন্য যে! ডাকব নাকি?

তিলোত্তমা কহিল—তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, বিবসনা নারীদের তসবির ক'খানা খুলে এসো জোরে আছাড় দিয়ে একটা সিন ক্রিয়েট করি, তা হলেই গৃহস্বামীর সাড়া পাওয়া যাবে।

বলিতে বলিতে সে সামনের ছবিখানার দিকে সবেগে অগ্রসর হইল, এমন সময় নিচের ফুল বাগানের পাশ দিয়া উর্দ্দীপরা এক মূর্ত্তি ছুটিয়া আসিল এবং সসম্ভ্রমে কুর্নিশ করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সত্যভামা তাড়াতাড়ি সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া কহিল—অতটা পরিশ্রমের আর দরকার নেই, দ্বারী এসেছে।

গোদাবরী জিজ্ঞাসা করিল—জজ সাহেব বাড়ী আছেন ?

ভৃত্য পুনরায় কুর্নিস করিয়া উত্তর দিল—জী, হুজুর !

সত্যভামা কহিল—তাঁকে খবর দাও, আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ভৃত্য কোন উত্তর না দিয়া নিকটের টেবিলখানার ড্রয়ার হইতে ছোট একখানি প্যাড ও পেনসিল বাহির করিয়া সত্যভামার সামনে ধরিল। প্যাডের কাগজে ছাপা ছত্র দুইটির উপর দৃষ্টি পড়িতেই তিনটি মেয়েই বুঝিল, কাগজে সাক্ষাৎকারীর নাম ও প্রয়োজন ছাপা রহিয়াছে এবং তাহাদিগকে শূন্য স্থানগুলি পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

সত্যভামা খপ করিয়া প্যাডটি লইয়া তাহাতে তিনজনের নাম এবং প্রয়োজন পংক্তিতে Regarding miss Sabita Debi (কুমারী সবিতা দেবী সংক্রান্ত) এই কয়টি কথা লিখিয়া দিল।

ভৃত্য প্যাড হইতে কাগজখানি খুলিয়া লইয়া দীঘ দরজাটির উপর টাঙ্গানো জাপানি ছিটের পরদাটি ঠেলিয়া হলের ভিতর প্রবেশ করিল।

তিলোত্তমা হাসিয়া কহিল—এদিকে কায়দা কানুনও ঠিক আছে।

সত্যভামা কহিল—হাজার হোক জজ সাহেব ত !

গোদাবরী কহিল—দেখা যাক্, স্রোতটা কতদূর গড়ায়।

মিনিট দুই পরেই ভৃত্য আসিয়া অধিকতর সম্ভ্রমের সহিত কুর্নিশ করিয়া জানাইল যে, হুজুর সেলাম দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে দ্বারের পরদাটি টানিয়া পথ করিয়া দিল। ত্রিমূর্তি সহাস্যে ও নির্ভীক ভঙ্গিতে হলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে রায় বাহাদুর দ্বিতল হইতে নিচের সুসজ্জিত হলঘরে নামিয়া একখানি সুবৃহৎ সোফার বক্ষে তাঁহার বিপুল দেহটি সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ একটি ঘণ্টা একখানা চিঠি লইয়া তিনি স্বচ্ছন্দে ও পরমানন্দে কাটাইয়া দিয়াছেন। চিঠিখানিকে একেবারে তাজা বলা যায় না, বাসি। প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কাশীতেই ডাকযোগে এই চিঠিখানি তাঁহার হস্তগত হয়। চিঠিখানির তলায় অসংলগ্ন কবিতাটির মধ্যে প্রেরকের নামটি মাত্র পড়িয়া তিনি আনন্দে এরূপ প্রমত্ত হইয়া উঠেন যে, প্রায় এক যুগ পূর্ব্বে গেজেটের পাতায় তাঁহার নামের সহিত রায় বাহাদুর খেতাবটির সংযোগ দেখিয়াও বুঝি এতটা উল্লসিত হন নাই। চিঠিখানি পাইবার পর যে-কয়দিন কাশীতে তিনি ছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রধান পাঠ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আজও সকালে হলঘরে নামিয়া ও আসন গ্রহণ করিয়া ইতিমধ্যে আরও বার পাঁচেক পড়িয়া ফেলিয়াছেন। চিঠির বিষয়-বস্তুর ভিতরে তাঁহার অধিকাংশ ইন্দ্রিয় এতটা নিবদ্ধ হইয়াছিল যে বাহিরের বারান্দায় তিনটি মেয়ের আবির্ভাব ও তাহাদের অম্লমধুর সংলাপও তাঁহার কর্ণস্পর্শও করে নাই। সুতরাং এতবড় বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তি যে চিঠিখানির ব্যাপারে এরূপ সমাবিষ্ট, তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে চিঠির অবয়ব ও বিষয়-বস্তুটি অবিকল জানা আবশ্যক। তাহা এই :

গোলাপী রংয়ের কাগজে মুক্তার মত সাজাইয়া একই আকারের স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরগুলি নীল রংয়ের কালিতে 'মাথাইয়া বসানো হইয়াছে। চিঠির কোণে একখানি রঙ্গীন জলছবি যেন ফটোর মত ঝকমক করিতেছে। আলুথালু বেশে এক যুবতী আকাশ পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে ; আর আকাশ-পথ আলো করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে এক ক্ষুদ্রকায় পাখী, তার চঞ্চুপুটে একখানি চিঠি। ছবি দেখিলেই মনে হয় যে,

উক্ত বিরহিণীর লিখিত চিঠিখানির বাহক হইয়া পাখী ছুটিযাছে প্রিয়তমের উদ্দেশে, প্রিয়াটির মন প্রাণও সেই দিকে পড়িয়া আছে।

ছবির বিপরীত দিকে কবি রবীন্দ্রনাথের কোন বিখ্যাত কবিতার 'প্যারোডি' কয় ছত্রে লেখা :

আমার মনের কথা পাখী জানে,
পাখীই জানে।
ভ'রে রইল বুকের তলা
কারো কাছে হয়নি বলা
কেবল বলে দিলাম পাখীর
কানে কানে।

অতঃপর আধুনিক গদ্যে চলতি ভাষায় চিঠিখানি এইভাবে লেখা হইয়াছে :

মনের মানিক,

কলকাতায় এসে পর পর তোমার তিনখানি চিঠির পরশে খুঁজে পেয়েছি এমন একটি তাজা মন—চিরদিনই যেটা সবুজ আর কাঁচা, মানিকের মতোই অবিরত স্নিগ্ধ রশ্মি ছড়ায়, আর তার আভায় কুমারী-মন-মুকুরের ঢাকাটি পলকে খুলে যায়। বয়েসের গোণাগুণতি মাপকাঠি এখানে বাযসের কা-কা শব্দের মতো কানে তালা ধরায় না, কেবলি মনে হয় তারুণ্যের উৎস তুমি, তাই তরুণ মনের রস তোমার হাতের ঝরণা-কলমটির ভিতর দিয়ে চিঠির শব্দগুলির উপরে উপচে পড়েছে। প্রথম চিঠিখানি এসেছিল ঠিক পশ্চিমের বোশেখী 'আঁধি'র মত। দেখেই বুকখানি প্রথমে ভযে টিপ টিপ করে উঠলেও, তার দুরন্ত পরশে আগুন মাখানো 'লু' বসন্তের মলয় বাতাসে পরিণত

হয়ে মনে প্রাণে তৃপ্তির হিল্লোল তুলে জানিয়ে দেয়—আকৃতি তার যাই হোক প্রকৃতি কিন্তু কত মধুর! তাই, পশ্চিমে লোকের প্রাণগুলো যখন আগুন-ঢালা-গরমে আই-ঢাই করে, তাদের মনগুলি তখন চোখের ওপরে ঠেলে উঠে চাতকের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—কখন আকাশ কালো ক'রে ঝাঁপিয়ে আসে ওই আঁধি। আমিও যে আকুল নয়নে আমার কুমারী-জীবনের এই ভীষণ সুন্দর 'আঁধির' পানেই তাকিয়ে আছি প্রিয়তম!

তিন নম্বরের আঁধিটির অপরূপ হিল্লোলে আমার মনের জড়তা আড়ষ্টতা সঙ্কোচ-লজ্জা যত কিছু দুর্বলতা সবই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই-না মনের কথা কলমের মুখে নির্ঝরিণীর মতো ঝির্ ঝির্ করে নির্গত হচ্ছে, সেই সঙ্গে মনের পাতায় আশা-কুহকিনী প্রতীক্ষার লেখনী নিয়ে শাশ্বত-বাণী দেগে দিয়েছে—

তোমার মধুর মুরতি আঁখিতে
হেরিব মাসের পঁচিশে নিশীথে।

আজ থেকে এ বাঞ্ছিত দিনটি মনে-মনে গণাই হয়েছে পড়া-শোনার অঙ্গ। তোমার মধুর সঙ্গ পাবার লোভ আমাকে এমনি মাতিয়ে তুলেচে, আর পোড়া মনে এম্নি একটা অহংকার জেগেচে, আমার আগে ও-সঙ্গ আর কেউ পাবে না। তুমিই যে মনে লালশা জাগিয়ে দিয়েচ প্রিয়তম! আমাকে সঙ্গে নিয়ে শহর ভ্রমণ করবে—মনের মতন বসনভূষণ চয়ন ক'রে সাজিয়ে দেবে তোমার প্রিয়াকে বিয়ের আগে—আর কোনো 'বর' কোনো হবু

'কনে'র কাছে এমন করে মনের আবেদন জানাতে পেরেছে কোনদিন! কিন্তু প্রাণসখা, এ-কাজটি সংগোপনে সারা চাই। কারণ, পিছনে 'ফেউ' লেগেছে।

সংক্ষেপে কথাটা খুলে বলি তাহলে। এই শহরের শিক্ষিতা মেয়েরা মিলে একটা সংসদ খুলেচে, তার নাম দিয়েচে—কুমারী-সংসদ। এরা চায—বিয়ের ব্যাপারে পণের ব্যাপার থাকবে না। তাছাড়া—কোন বুড়োকে এরা বিয়ে করতেও দেবে না। আমাদের ব্যাপারটা কি করে যে এদের কানে গিয়ে ওঠে জানিনে। সেদিন হঠাৎ আমাদের বাসায় তিন তিনটে ধুমসী মেয়ে এসে হাজীর। বাবা তখন আফিসে, মাকে বললে—'মেয়েটার হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্চেন কেন? আমরা এ হ'তে দেব না।' মা তোমার কথা তুলে বললেন—'এ ত মেয়ের ভাগ্যি!' কিন্তু, মাগো! মেয়েগুলোর কি তেজ, লম্বা লেকচার দিয়ে মাকে একেবারে থ করে দিলে। তারপর আমাকে ডেকে কত কি বোঝালে, বললে—'তুমি শক্ত হও, রাজি হয়ো না কিছুতে. আমরা এ বিয়ে হতে দেব না, কেনো।' আমি একবারে 'স্পীকৃটি নট', জানি বোবার শত্রু নেই। তারপর শুনলুম, আফিসে গিয়ে বাবাকেও শাসিয়েচে, বলেছে—এ বিয়ে হতে দেবে না। বাবা এতে ভারি ঘাবড়ে গেছেন। মা বলেন—'আমার সুখ হবে জেনে আবাগীদের বুকে ঢেঁকি পড়েছে।' আমি তাই অনেক ভেবে চিন্তে একটা উপায় ঠিক করেছি। বিয়েটা এমন ভাবে হওয়া চাই—কাক চিলও জানতে না পারে। আর

পঁচিশ তারিখের রাতে আমাদের শহর ঘোরার ব্যাপারটিও চুপি চুপি সারতে হবে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, পঁচিশ তারিখের সকালে তুমি যে কলকাতার বাড়ীতে আসছ, এটা যেন চাপা থাকে। কেউ জানবে না—বাবা পর্য্যন্ত নয়। এমন কি, তুমি মোটর পাঠিয়ে জানাজানি করে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাও—এটাও আমার ইচ্ছে নয়। এখন আমার আর্জ্জীটি জানাচ্ছি আমার মনোরাজ্যের জজবাহাদুরের দরবারে।—ঘটনাচক্রে ঐদিনই আমার এক বান্ধবীর বাড়ীতে প্রীতিভোজের একটা উৎসব আছে। তাঁরা আমাকে নিয়ে যাবেন বিকেলে, আর রাত ন'টার ভিতরেই পৌছে দেবেন বাড়ীতে; মা রাজি হয়েচেন।

তারপর, নেমন্তন্ন বাড়ীতে এসেই আমি বলে রাখব যে, সন্ধ্যের পর আমার এক আত্মীয় এসে ঘণ্টাখানেকের জন্যে মার্কেটে নিয়ে যাবেন কিছু কেনবার জন্যে। সেই আত্মীয়টি হ'য়ে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাতটার সময় সেখান থেকে এই তৃষিতা চাতকীটিকে মোটরে তুলে নিয়ে যাবে তুমি। শহর ভ্রমণ আর বসন-ভূষণ নির্ব্বাচন ভূষণ নির্ব্বিঘ্নে চলবে।

দু'-নম্বরের আর্জ্জী হচ্ছে—কলকাতায় আসবার আগে তোমার কালো কুত্তাটিকে কাশীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া চাইই। কলকাতা শহরে ও-চীজ চলবে না, কালভৈরবের রাজ্যই ওর যোগ্য আস্তানা। সম্পর্কে আমি শালাজ হব ব'লে এরি মধ্যে আমাকে অস্থির করে তুলেছে, দেখলেই মুখ আর চোখের কোণে এমনি বিশ্রী ভঙ্গি করে—যাতে কাশীর জ্বালাতন-করা জানোয়ারগুলোর কথাই মনে পড়ে।

ঐ হতভাগাটাই ত আমাদের বিয়ের কথাটা চারদিকে রটিয়ে দিয়েছে, নইলে 'কুমারী-সংসদ' এখবর পেল কোথা থেকে? শুনলে তুমি অবাক হবে—তোমার কাঁধে ভর ক'রে আব ঐ নজীরে সে নিজের জন্যেও ক'নে যোগাড়ের চেষ্টায় আছে! তবে একথাও বলে রাখছি সব দিক ভেবে, এসব কথা চেপে রেখে কৌশল করে ওকে কাশীতে ডেকে নাও; কেন না, ভিতরের সব কথাই ও যখন জানে, কুমারী-সংসদের সঙ্গে যোগ-সাজস ক'রে আমাদের মুস্কিলে ফেলতেও পারে। অনেক কথা লিখলুম, চিঠিখানা খুব বড় হয়ে গেল। যে সব কথা বলতে বাকি রইল, পত্রে কুলোবে না; পাত্রীই পাশে ব'সে বলবে—কেমন? এখন তাহলে ৮০। ইতি

পুঃ—আমার ভালবাসা কালি-কলমে এঁকে জানাবার নয়, কানে কানে বলবার, সে কথা চিঠির ডগাতেই বলেছি। তবে পাখীটি কে, সেটিও কি খুলে বলতে হবে?

তোমার মনের পাতার আঁধার বুকে
আমার আলোর আসন আছে পাতা,
আমি যে সবিতা, ওগো প্রিয়তম,
তোমারি **সবিতা**।

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে তাহার প্রতি ছত্রের শব্দগুলি যে রায় বাহাদুরের মনের তন্ত্রিতে সজোরে ঝঙ্কার তুলিয়াছে, তাঁহার মুখ-ভঙ্গিতেই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল। আলো-ছায়ার খেলা বলিয়া যে একটা কথা আছে, রায় বাহাদুরের মুখে ও চোখে যেন তাহার আভা পড়িয়াছে। হাসিখুসীর আলোর আভায় মুখখানি ভরিয়া উঠিবার পরক্ষণেই ক্রোধ ও বিরক্তির আঁধার ঘনাইয়া উঠে, আবার একটু পরেই তাঁহাকে স্বাভাবিক

অবস্থায় আসিতে দেখা যায়। তবে সুখের বিষয় এইটুকু যে, রায় বাহাদুরের মুখ-ভঙ্গির এই ঘন ঘন পরিবর্ত্তন-দৃশ্যটি উপভোগ করিবার মত কোন রসিক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল না।

উল্লাসের কারণ হইতেছে—লেখিকার মর্ম্মবাণী তাঁহার অত্যন্ত মনঃপূত হইয়াছে। ক্রোধ ও বিরক্তির মূলে রহিয়াছে, তাঁহারই অন্নদাস একান্ত অনুগৃহীত ও আশ্রিত রজনীর স্পর্দ্ধা ও কৃতঘ্নতা। কুক্কুরের ন্যায় হেয় ও পদানত হইয়াও সেই নীচাশয় কিনা সিংহের বাঞ্ছিত নিধির পানে তুচ্ছ একটা সম্পর্ককে উপলক্ষ করিয়া তাকাইতে সাহস করে? চিঠিখানি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই রোষান্ধ রায় বাহাদুরের অন্তরে আগ্রহ উদ্দীপিত হইয়াছিল—তাহাকে টেলিগ্রাম করিয়া কাশীতে আনাইয়া আচ্ছা করিয়া হাণ্টার হাকরাইয়া উপযুক্ত শিক্ষা দেন; তাহার যে গোষ্ঠীবর্গকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া দিয়া গায়ের ঝাল মেটান। কিন্তু পরক্ষণে অভিযোক্তার সমীচীন-নির্দ্দেশটিই তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া দেয়। বুঝিলেন, এ ব্যাপারে কল-কাঠি সত্যই রজনীর হাতে, এখনই চরম পন্থা লইলে পরে পস্তাইতে হইবে। তাই তিনি জরুরী তার-যোগে রজনীকে কাশীতে আনিয়া এমন একটা কাজে লিপ্ত করিয়া দিয়াছেন, পনের দিনের পূর্ব্বে যাহার অন্য কোন দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবসর মিলিবে না। সঙ্গে সঙ্গেই ভাবপূর্ণ ভাষায় লেখিকার পত্রের উত্তর দিয়া—তাহার বুদ্ধির প্রচুর প্রশংসা ও আর্জ্জীকে আদেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া চতুর্থ পত্র পাঠাইয়াছেন। পাছে কোন গোলযোগ ঘটে, সেইজন্য তিনি উক্ত পত্রে প্রত্যুত্তরের দাবী পর্য্যন্ত করেন নাই। তবে লেখিকার প্রস্তাবটির পূর্ণ সমর্থন করিয়া জানাইয়াছেন যে, মার্চ্চ মাসের পঁচিশ তারিখে সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময় তিনি পটলডাঙ্গার একুশ নম্বর বাড়ীর সম্মুখে মোটর লইয়া উপস্থিত হইবেন, লেখিকা যেন প্রস্তুত থাকেন।

চিঠিখানি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কর্ম্মা রায় বাহাদুরের মনের ভিতর পরবর্ত্তী ব্যবস্থাগুলির ক্রিয়াও যেন স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিতেছিল। সহসা কি ভাবিয়া রায় বাহাদুর চিঠির উপরের কবিতাটির উপর পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন :

আমার মনের কথা পাখী জানে
পাখীই জানে—

সঙ্গে সঙ্গে চিঠির শেষের দিকের কথাটিও রায় বাহাদুরের মনে জোরে একটা দোলা দিল—'পাখীটি কে, সে কথা কি খুলে বলতে হবে ?' সপ্তাহ কাল দিবারাত্রি ভাবিয়াও রায় বাহাদুর স্থির করিতে পারেন নাই যে, পাখীটি কে !

দুই চক্ষু মুদিয়া রায় বাহাদুর চিঠির এই হেঁয়ালীটির অর্থ বাহির করিতে পরিপক্ক মস্তিষ্কের উপর কিঞ্চিৎ জোর দিয়াছেন, এমন সময় বেয়ারার কম্পিত স্বর তাঁহার চিন্তা ভাঙ্গিয়া দিল :

দুই চক্ষু পাকাইয়া চাহিতেই বেযারার হাতের শ্লিপখানায় হুজুরের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া সেখানি টানিয়া লইয়া চোখের উপরে ধরিতেই তাঁহার দেহের সমস্ত শিরাগুলির ভিতর রক্তের গতি দ্রুততর হইয়া ছুটিতে থাকিল। স্নায়ুপুঞ্জে যে মানসীর নামটি কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার সম্পর্কেই তিনটি অপরিচিতার আকস্মিক আবির্ভাব তাঁহারই সকাশে—সাক্ষাৎ প্রার্থনায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে! এ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ভিতরে আনিবার জন্য যেরূপ সব্যগ্র-নির্দ্দেশ হুজুরের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল তাহাতে আগন্তুকাদের সম্বন্ধে বেহারার চিত্তটিও শ্রদ্ধাবনত হওয়াই স্বাভাবিক।

ত্রিমূর্ত্তি সুসজ্জিত হল-ঘরটির ভিতরে ঢুকিয়াই সর্ব্বাগ্রে গৃহস্বামীকে এক নজরে দেখিয়া লইল, পরক্ষণে করজোড়ে নমস্কার করিল। আগন্তুকা-দিগকে সম্বর্দ্ধনা করিতে রায় বাহাদুর কুশন দেওয়া সোফাখানির উপরে সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের একই ছাঁদের 'রণংদেহি'—গোছের চেহারা তাঁহার মুখের ভঙ্গি যেন বদলাইয়া দিল। এমন কি, শিষ্টাচারের কথা ভুলিয়া যেরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ত্রিমূর্ত্তির পানে তাকাইলেন, তাহাতে সন্দেহের ছায়া সুস্পষ্ট হইল। কিন্তু তরুণীদের শিষ্টাচারের প্রত্যুত্তর না দিয়াও তিনি পারিলেন না, মাথাটি ঈষৎ নাড়িয়া এবং হাতখানি সন্নিহিত সারিবদ্ধ সোফার দিকে হেলাইয়া কহিলেন—বসুন।

একখানি দীর্ঘ সোফায় তরুণীত্রয় একসঙ্গে বসিল এবং বিস্মিত গৃহস্বামীকে কোন প্রশ্ন তুলিবার অবকাশ না দিয়াই তাহাদের ভিতর হইতে শ্রীমতী গোদাবরী কহিল—মাপ করবেন রায় বাহাদুর, কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আমরা আপনার মূল্যবান সময়ের খানিকটা অপচয় করতে এসেছি। আমাদের নাম স্লিপেই দেখেছেন। আমার নাম হচ্ছে—গোদাবরী গুপ্তা, এঁর নাম—সত্যভামা সান্ন্যাল, আর ইনি—তিলোত্তমা তালুকদার। আমরা তিনজনেই 'কুমারী-সংসদে'র—

বিচারাধীন শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন খুনী আসামী হঠাৎ মুক্ত হইয়া খাস-কামরার ভিতরে বিচারকের সম্মুখে আসিয়া আত্মপরিচয় দিলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক...গোদাবরীর মুখে 'কুমারী-সংসদ' কথাটি শুনিবামাত্রই রায় বাহাদুর ধৈর্য্য হারাইয়া ঠিক অনুরূপ একটা পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়া বসিলেন পলকের মধ্যে। নরম সোফার উপরে বসিয়া স্থূল দেহটিকে যতটা খাড়া করিতে পারা যায়, তাহার পূর্ণ প্রয়াস করিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—সাট আপ! আর বল্‌তে হবে না,

তোমাদের চেহারা দেখেই আমি এমনি কিছু অনুমান করছিলুম, এখন সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল। কোন কথা আর নয়; 'গো—'

ইংরাজী শব্দটি অসম্পূর্ণ রাখিয়াই লম্বা ও লোমশ হাতখানি বাঁকাইয়া হল-ঘরের দরজাটি তিনি দেখাইয়া দিলেন।

কিন্তু ত্রিমূর্ত্তি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এক সঙ্গেই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। মনে হইল, একই আকারের তিনিটি জাপানী পুতুলের স্প্রিংএ এক সঙ্গে কে যেন সজোরে চাবি ঘুরাইয়া দম দিল। রায় বাহাদুর ভাবিলেন, প্রগল্‌ভা তিনটি মেয়ে তাঁহার মুখের কঠোর আদেশটি তাহাদের মুখের তীক্ষ্ণ হাসির গমকে উড়াইয়া দিল। সবিতার পত্রে কুমারী-সংসদের স্পর্দ্ধা ও অনধিকার-চর্চ্চার প্রসঙ্গটি পড়িয়া অবধি তিনি যে-সংস্থাটিকে মনে মনে ভারত-সরকারের চিহ্নিত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান-গুলির পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই দলের তিনটি মেয়ে তাঁহারই ড্রয়িং রুমে আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছে, মুখে ব্যঙ্গের হাসির ঝলক তুলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছে!

ক্রোধে রায় বাহাদুরের সদ্য-ক্ষৌরিত প্রসাধন-স্নিগ্ধ মুখখানি রৌদ্রপক্ক ফল-বিশেষের মত উগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু ভিতর হইতে তাপোদ্গমের পূর্ব্বেই মুখের হাসি চাপিয়া সত্যভামা নামে মেয়েটি তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল—থামুন, থামুন; চেঁচিয়ে একটা 'সীন্ ক্রিয়েট' করবেন না রায় বাহাদুর!

তিলোত্তমা কহিল—আপনার 'লাউড ভয়েসে'র সঙ্গে এই তিনটি লেডীও যদি কোরাসে 'হেল্প্' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, তখন দেখবেন—লাউ-ডন ষ্ট্রীটের সমস্ত লোকে আপনার ড্রয়িং রুম ভ'রে গেছে—

গোদাবরী কহিল—এবং তাদের সামনে আপনার বৃদ্ধ বয়সের গুপ্ত-কথার হাঁড়ীটিও ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে।

পর পর এমন তৎপরতার সঙ্গে মেয়ে তিনটি অপরূপ ভঙ্গি ও সুরে তাহাদের বক্তব্য কথাগুলি বলিয়া ফেলিল যে, ক্রুদ্ধ গৃহস্বামীর কণ্ঠ হইতে উদ্গতপ্রায় স্বর স্তব্ধ হইয়া গেল, সেই সঙ্গে উত্তেজিত মুখখানির উপরেও ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তার একটা কালো ছায়া পড়িয়া তাঁহাকে যেন অবসন্ন করিয়া দিল। অপেক্ষাকৃত সংযত স্বরে রায় বাহাদুর অতঃপর প্রশ্ন করিলেন—তোমাদের মতলব কি শুনি ?

কথাটার উত্তর দিল গোদাবরী ; কহিল—শোনবার অবসর দিলেন কই ? কুমারী-সংসদের নাম শুনেই ত 'গো' ব'লে দরজা দেখিয়ে দিলেন ; কিন্তু গো-জাতি হলেও আমরা ভগবতীর স্তরে প্রমোশ্যান পেয়েছি—বুঝেছেন ? আমরা সবরমতী-আশ্রমের অহিংস গোরু নই যে, চোখ রাঙালেই ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে চোখের জলে মাটি ভেজাব—উলটে ছুটে গিয়ে চোখে শিংয়ের খোঁচা দেবার শিক্ষা আমরা পেয়েছি। শিষ্টকে আমরা শ্রদ্ধা করি, দুষ্টকে দুর্ম্মুস করতে জানি, কেউ হিংসায় মারমুখী হয়ে এলে আমরাও রণমুখী হই ; আমরা বশিষ্ঠাশ্রমের কপিলা গাই—সাক্ষাৎ ভগবতী।

সত্যভামা কহিল—অতএব আমাদের ঘাঁটাবেন না। গোড়াতেই আপনি এমন একটা ভুল করে ব'সলেন, কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মনোবৃত্তির সঙ্গে যার কোনরূপ সংশ্রব থাকা উচিত নয়। অতি বড় শত্রুর পক্ষ থেকেও কোন প্রস্তাব নিয়ে দূত এলে তাকে গ্রহণ করবার রীতি আদিম যুগ থেকেই চলে আসছে। কিন্তু আপনিই বোধ হয় এই প্রথম সেই সনাতন নীতির উপরে আঘাত দিলেন !

তিলোত্তমা কহিল—অবশ্য, আপনার মস্তিষ্ক যে সুস্থ নয়—তার সংবাদ আমরা রাখি। ব্যাধির তাড়নায় বড় বড় লোকেরাও অনেক অপকর্ম্ম করে থাকেন শুনিছি। এই ত সেদিন আমাদের দেশের একজন নেতা

এলাহাবাদে এমন বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন, পাগল ছাড়া আর কারুর পক্ষে যেটা সম্ভব নয়। তিনি রাক্ষসের মত তাঁর বিরোধীদলের বুকে বসে রক্ত পান করবার হুমকী দিয়েছিলেন। এর মূলেও ছিল ব্যাধি, সুস্থ হতেই তিনি আবার মাপ চান মনঃক্ষুণ্ণ দেশবাসীর কাছে। আপনার মনোরাজ্যেও যে-ব্যাধিটি ব্যাপক হয়ে উঠেছে, তারই প্রভাবে আপনিও বিভ্রান্ত হয়েছেন।

গোদাবরী কহিল—কিন্তু আমাদের ভরসা আছে, আপনিও নির্ব্ব্যাধি হয়ে দেশবাসীকে খুসী করবেন। উচ্চ শিক্ষা, বিপুল প্রতিষ্ঠা, পদগৌরব আপনার মর্য্যাদা যে ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে, একটা বিশ্রী ব্যাধির সংস্পর্শে সেটা ম্লান হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। সেই ব্যাধি থেকেই আমরা আপনাকে মুক্ত করতে এসেছি রায় বাহাদুর!

রায় বাহাদুর বোধ হয় অবাক হইয়া ভাবিতেছিলেন. তাঁহার মত অল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতি মানুষ নিজের ঘরে বসিয়া কেমন করিয়া তিনটি অপরিচিতা প্রগল্‌ভা তরুণীর অবান্তর কথাগুলি শুনিবার ধৈর্য্যকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রশ্রয় দিলেন? তাঁহার আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে সুশ্রী ব্র্যাকেটটি অবলম্বন করিয়া শঙ্কর মাছের পুচ্ছে প্রস্তুত চর্মভেদী কৃষ্ণবর্ণের চাবুকটি সর্পপুচ্ছের মতই ঝুলিতেছিল। তাহার উপর চক্ষু পড়িতেই রায় বাহাদুরের স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল—পরিজন বা ভৃত্যগণের মধ্যে কেহ কোন দিন তাঁহার সম্মুখে মুখের কথার মাত্রাটি অতিক্রম করিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত সাংঘাতিক প্রহরণটির সাহায্যে তাহাকে কি ভাবে 'স্যায়েস্তা' করিয়াছেন। কিন্তু সে তুলনায় ইহারা সহস্রগুণ অধিক মাত্রা লঙ্ঘন করিয়াও মুখ তুলিয়া বসিয়া আছে এবং এক তরফা তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিঁধিতেছে, অথচ তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার হাতখানি ত ব্র্যাকেটের দিকে

উঠিতেছে না! শুধু ইহাই নহে—তাঁহার মুখের বাণী পর্য্যন্ত যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীমতী গোদাবরী থামিবা মাত্রই রায়বাহাদুর ক্ষিপ্রভাবে গলায় জোর দিয়া কহিলেন—আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, একটা সংসদ খাড়া করে দল পাকিয়ে তোমরা গুণ্ডামী শুরু করেছ। আমাদের সমাজে যে সব বিধি ব্যবস্থা রীতি নীতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে—তোমরা সেগুলো ভাঙবার জন্যে—

—বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়েছি।

কথাটা বক্তাকে শেষ করিবার সুযোগটুকু না দিয়াই শ্রীমতী সত্যভামা তাড়াতাড়ি এইভাবে পাদপূরণ করিয়া দাঁড়ি টানিয়া দিল। পরক্ষণেই শ্রীমতী তিলোত্তমা কহিল—কেন আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি শুনবেন? আপনাদের মত সুবিধাবাদীদের জন্যেই। ঐ যে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা রীতি নীতির কথা বললেন, তার কতকগুলোয় প্রচুর সুবিধা আছে জেনেই আপনারা বরাবর সমীহ করে এসেছেন। আমরা কিন্তু বর্ত্তমানকে উপলব্ধি করে ওগুলোকে খাতির করতে রাজি নই। তাই আমাদের সংসদ—এ সম্বন্ধে মানুষের যে ভুল ধারণা বা সশ্রদ্ধ সংস্কার আছে—তাতে আঘাত দেবার জন্যে ঝাণ্ডা তুলে দাণ্ডা নিয়েছে হাতে। আমাদের সংসদ সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়—যুক্তি-হীন আদর্শ-বাদের অন্তরালে রয়েছে আত্মপ্রতারণার নীচ প্রবৃত্তি।

শ্রীমতী তিলোত্তমার কথায় দাঁড়ি পড়িবামাত্রই শ্রীমতী গোদাবরী খপ করিয়া পরবর্ত্তী কথাটি বলিতে শুরু করিল—এই দুর্ব্বোধ্য বিষয়টি আপনার আদর্শটুকু নিয়েই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছি রায় বাহাদুর! পুরুষ মানুষ যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহ করতে পারেন, তাতে কোন নিন্দা নেই, বাধাও ওঠে না। তাই অবাধে আপনি একষট্টি বছর বয়সে এক ষোড়শী

কিশোরীকে বিয়ে করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। সমাজ এ ব্যবস্থাকে মেনে নিলেও আমাদের সংসদ একে মানতে পারে না এই জন্যে যে এটা রীতিমত একটা ভুলের ব্যাপার—এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা অন্ধ সংস্কার। সংসদ জানাতে চায়—এটা অন্যায, এতে সমাজের বাধা দেওয়া উচিত। পুরুষ জাতের সুবিধার দিক দিয়ে এই যে আদর্শবাদ, এটা আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীমতী সত্যভামা যেন প্রস্তুত হইয়াই নিজের পালাটির প্রতীক্ষা করিতেছিল। গোদাবরীর কথা শেষ হইতেই মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল—অতএব এ সম্বন্ধে আপনার বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া উচিত রায় বাহাদুর! এই জন্যই কুমারী-সংসদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি—আপনি যেন এই অত্যন্ত অশোভন এবং একান্ত অপ্রীতিকর বিবাহ-ব্যাপারে আর কোন রকম অংশ গ্রহণ না করেন।

অগ্নিগর্ভ সুবৃহৎ বোমার ভিতরটা বুঝি এতক্ষণ স্বনিতেছিল, এবার বাহিরটাও তাতিয়া উঠিয়া সশব্দে ফাটিয়া পড়িল। স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ স্বরে ড্রয়িং রুমটি কাঁপাইয়া রায় বাহাদুর চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ফাজলামির জায়গা পাওনি বটে, ইচোড়ে পাকা ডেঁপো মেয়ে কোথাকার! জানো, আমি তোমাদের সংসদকে জাহান্নমে পাঠিয়ে সব কটা মেয়েকে জেলে পুরতে পারি।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্রীমতী তিলোত্তমা কহিল—আপনি ত এককালে জজিয়তী করেছেন, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে বলুন ত—সত্যি সত্যি কার জেলে ঢোকা উচিত?

পরক্ষণেই শ্রীমতী সত্যভামা কহিল—আপনিই বলুন রায় বাহাদুর, একষট্টি বছর বয়সে যে-লোক গাঁটছড়া বাঁধবার লোভে নাতনীর বয়সী মেয়ের সঙ্গে ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তাকে সেখান থেকে

চ্যাংদোলা ক'রে তুলে কোথায় চালান দেওয়া উচিত—জেলখানায়, না পাগলা গারদে ?

অতঃপর আর রায় বাহাদুরের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা সম্ভবপর হইল না। অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে এই স্থূলাঙ্গী মেয়েটির পানে চাহিয়া তিনি কর্কশ কণ্ঠে তর্জ্জন করিলেন—কে আছিস্ বাইরে, আমার হাণ্টারটা আন্ ত—

এত বড় সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিটিকে এভাবে ধৈর্য্য হারাইতে দেখিয়া তিনটি মেয়েই এক সঙ্গে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। হাসির গমক থামিতেই তাহারা দেখিল, দরজার উপরে টাঙ্গানো ছিটের পরদাটির পাশ দিয়া পূর্ব্বপরিচিত ভৃত্যটি সভয়ে প্রবেশ করিতেছে।

ভৃত্যের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই রায় বাহাদুর অবস্থাটি উপলব্ধি করিয়া সহসা সংযত কণ্ঠে তাহাকে আদেশ করিলেন—এরা বাইরে যাবে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যা।

ভৃত্য পরদার প্রান্তদেশটি ধরিয়া সোফায় উপবিষ্টা ত্রিমূর্ত্তির গাত্রোত্থানের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল।

শ্রীমতী গোদাবরী কহিল—হাণ্টার বেচারীর দুর্ভাগ্য বলতে হবে, হুজুরের তলব পেয়েও আমল পেল না।

শ্রীমতী সত্যভামা কহিল—তাতে কি হয়েছে, এক মাঘে শীত পালায় না। আবার যে দিন আসব, সেদিন অবিশ্যি আমল পাবে। তাহলে আর বসে কেন, ওঠা যাক্—

পরক্ষণেই ত্রিমূর্ত্তি এক সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমতী তিলোত্তমা এই সময় রায় বাহাদুরের গম্ভীর মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল—ব্যাপারটা যেখানে এসে থেমেছে, সেখানে আমাদের থাকাটা আর শোভন হয় না, তাই আজ আমরা বিদায় নিয়ে চললুম রায় বাহাদুর! কিন্তু অষ্টাহ পরে আমরা আবার আসছি। আশা করি, এরই মধ্যে

আপনি বিবেচনা ক'রে মতটা বদলে ফেলবেন। মনে রাখবেন, সংসারের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে আপনি সুবিধা করতে পারবেন না। আজ হ'ল মার্চ্চ মাসের পঁচিশ তারিখ, এপ্রিলের দু' তারিখে বেলা ঠিক আটটায় আমরা আবার হাজির হচ্ছি। আপাততঃ, নমস্কার।

এক সঙ্গে তিনটি মেয়েই যুক্ত করে স্তব্ধ গৃহস্বামীকে বিদায় অভিনন্দন জানাইয়া বেহারার পিছু পিছু বাহির হইয়া গেল।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রায় বাহাদুর দরজার পরদাটির উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। সে-দৃষ্টির যদি দাহিকা শক্তি থাকিত, তাহার শিখা পরদাখানি ভেদ করিয়া অতিমাত্রায় প্রগল্‌ভা মেয়ে তিনটিকে বোধ হয় জীবন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিত।

এগারো

শ্যামবাজার অঞ্চলে দেশবন্ধু পার্কের সান্নিধ্যে ছোট একখানি বাড়ীর বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া ক্যালকাটা পুলিসের ইন্‌সপেক্টর নির্ম্মলকান্তি ব্যানার্জ্জী আফিসের ফাইল দেখিতেছিলেন। সম্মুখেই একখানি সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, তাহার উপর লাল ফিতায় বাঁধা নানাবিধ নথী-পত্র, কেতাব ও কয়েকখানি সাময়িক পত্র। বাহিরের দিকে দরজার উপর নীল রঙের পুরু কাপড়ের পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। সেই পর্দ্দা ঠেলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল এক সুন্দরী তরুণী; তাহার আকৃতি, আসিবার ভঙ্গি ও সাদাসিধা একখানি দেশী শাড়ী পরিবার কায়দাটি তরুণীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিল।

নির্ম্মলকান্তি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিতেই সে অসঙ্কোচেই প্রথমে প্রশ্ন করিল—আপনার নাম নির্ম্মলকান্তি ব্যানার্জ্জী?

শ্রদ্ধার সহিত নির্ম্মলকান্তি উত্তর দিলেন—আজ্ঞে হাঁ। বসুন আপনি।

তরুণী বেশ সপ্রতিভ ভাবেই টেবিলের অপর পার্শ্বে রক্ষিত চেয়ারখানি একটু টানিয়াই তাহাতে বসিয়া পড়িল।

নির্ম্মলকান্তি বদ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—কোথা থেকে আসছেন বলুন ত—কি আপনার বিজনেস?

তরুণী সহজস্বরেই উত্তর দিল—আমার নাম কুমারী শক্তি বোস; কুমারী-সংসদের আমি সেক্রেটারী।

সহর্ষে নির্ম্মলকান্তি বলিয়া উঠিলেন—আপনি? নমস্কার। আমি আপনাকে খুবই জানি, অবশ্য থ্রু-ইয়োর ডিস্‌টিংগুইষ্ট্‌ নেম্‌—আপনার সংসদে সম্প্রতি আমি একখানা পত্র—

শক্তি।—সে পত্র আমরা পেয়েছি, আর সেই সূত্রেই আমার এখানে আসা। আপনি লিখেছেন—সকল রকমেই সংসদকে সাহায্য করবেন। সেটা ভেরিফাই করতেই—

নির্ম্মল।—চিঠিতে আমি যা লিখেছি, আপনার সামনেও তাই বলছি; যে আদর্শ নিয়ে আপনাদের সংসদ, সে সম্বন্ধে যে কোন ভার নিতে আমি সানন্দে প্রস্তুত।

শ।—একটা ভার আমি নিয়েই এসেছিলুম। কিন্তু—

নি।—দ্বিধা কেন, অসঙ্কোচেই বলুন।

শ।—সে ভারটা এখন চাপাতে ভরসা হচ্ছে না।

নি।—কেন বলুন ত?

নির্ম্মলকান্তির মুখের দিকে চাহিয়া শক্তি একটু হাসিয়া কহিল—আপনার চাপরাশ দেখে। এই ঘরে ঢোকবার আগে দরজার ধারে আঁটা ট্যাবলেটখানা পড়েছি, আর সেই সূত্রে ভরসাটুকুও হারিয়ে ফেলেছি।

নির্ম্মলকান্তি মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিলেন—বুঝেছি। যেই জানলেন, আমি ক্যালকাটা পুলিসের ইন্‌সপেক্টর, অমনি সামনে একটা ব্যবধান খাড়া ক'রে ফেললেন! কিন্তু চিঠিখানাতেই ত জানিয়েছিলুম, আমি সরকারী কর্ম্মচারী।

শক্তি কহিল—তা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি, আপনার পেশা দারোগাগিরি! রাগ করবেন না, পরিচয় পেয়ে যদি কিঞ্চিত ভীত হই, সেটা কি অস্বাভাবিক?

নির্ম্মলকান্তি নিজের কথার উপর এবার জোর দিয়াই কহিলেন—আমি যদি এ কথার উত্তরে বলি—সত্যের দরজায় আগড় থাকে না; যেখানে পাপ নেই, ভয়ও সেখানে ঘেঁসতে পারে না। আপনারা ত

মেয়েগুলোর দুঃখমোচনের ছলে তাদের আউটসাইড অফ্ বেঙ্গলে চালান দেবার ব্যবসা ফাঁদেন নি, তবে ভীত হবেন কেন শুনি?

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শক্তি সহসা উত্তর দিল—তা হ'লে কথা আমার প্রত্যাহার করছি, নির্ম্মলবাবু!

নির্ম্মলকান্তি আবেগের সুরে কহিলেন—দেখুন, ইয়ুনিভারসিটীর শেষ ডিগ্রী নিয়ে কম্পিটিটিভ একজামিনেশানগুলোর গণ্ডী পার হয়ে কেন আমি বেছে বেছে পুলিস ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছি শুনবেন? আমাদের দেশের মেয়েগুলোকে বাঁচাতে আর পণপ্রথাটা ভেঙ্গে দিতে। যে ব্রত আমি নিয়েছি, আমার এই পোষ্ট তাতে লোহার পোষ্টের মত কাজ করবে। পলিটিক্যাল য়্যাফেয়ারে যে য়্যাটিটিউডই পুলিসের থাকুক, কিন্তু এমন একটা সোস্যাল ডিষ্টারব্যান্সে পুলিস আর কিছু না পারুক, সিচুয়েশানটাকে পজ্‌ল্ করতেও ত পারে!

কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া শক্তি কহিল—আমাকে মাপ করুন, নির্ম্মলবাবু। মনে যে সংশয়টুকু উঠেছিল, আপনার কথায় তা মুছে গেল একেবারে। এখন বুঝছি, ঈশ্বরের নির্দ্দেশেই আমরা আপনাকে পেয়েছি। যে ভারটি আমি সংসদের পক্ষ থেকে এনেছি, সেটি বহন করবার উপযুক্ত পাত্রই এখন আপনি।

নির্ম্মলকান্তি কৌতূহলী হইয়া কহিলেন—কি ব্যাপার বলুন ত?

শক্তি তৎক্ষণাৎ একখানি চিঠি বাহির করিয়া নির্ম্মলকান্তির হাতে দিয়া কহিল—এ'খানা পড়ুন, তা হলেই সব বুঝতে পারবেন।

হাতের ফাইলটি পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া নির্ম্মলকান্তি চিঠিখানির দিকে অখণ্ড মনোযোগ দিলেন। শক্তি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—বিধাতার কি সৃষ্টিবৈষম্য দেখুন! কোনও বাপ মেয়ে পার করতে

সর্ব্বস্ব ঘুচায়, আবার কোনও কোনও বাপ সর্ব্বস্ব রাখতে মেয়ের গলায় ফাঁসী পরায়!—পড়া হ'ল আপনার?

চিঠি হইতে চোখ দুইটি তুলিয়া নির্ম্মলকান্তি কহিলেন,—হ্যাঁ। কিন্তু আমি এঁদের দুপক্ষকেই চিনি। বুড়ো জজ, আর—

বিস্ময়োল্লাসে শক্তি কহিল—চেনেন আপনি! তা হ'লে ত ভালই হ'ল। আমরাও দু'পক্ষের সঙ্গে দেখা করেছি। মেয়ের বাপ কপাল দেখিয়ে বলেন—নিরুপায়, আর জজ সাহেবের কাছে কথাটা পাড়তেই তিনি রেগে উঠে হাণ্টার হাঁকরাতে চান—

আগ্রহের সুরে নির্ম্মলকান্তি জিজ্ঞাসা করিলেন—জজ সাহেব তাহলে এখন কলকাতার বাড়ীতেই আছেন?

শক্তি কহিল—হ্যাঁ, আজ সকালে এসেছেন।

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন—জজ সাহেবের মেজাজ আজকাল ঐ রকমই হয়েছে, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা—শেষ-বয়সে গৃহিণীর শোকে মাথার গোটাকতক স্ক্রু ঢিলে ক'রে ফেলেছেন! তাঁর কাছে আগে যাওয়াটাই আপনাদের মস্ত ভুল হয়েছে!

শক্তি কহিল—কিন্তু মেয়েটির পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি পরিস্কারভাবে জেনেই আমরা পণ করেছি নির্ম্মলবাবু, উদ্ধার তাকে করবই। সেই জন্যেই এসেছি আপনার কাছে।

নির্ম্মলকান্তি হাসিমুখে কহিলেন—আমাদের শাস্ত্রকাররা শক্তিমান বেকুবদের দাবাতে যে নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন, সেটির নাম—শঠে শাঠ্যং। জজ সাহেবকে জব্দ করতে হ'লে এই নীতিই এখন অবলম্বন করতে হবে।

নির্ম্মলকান্তির কথায় সায় দিয়া শক্তি জানাইল—আমাদেরও এই ইচ্ছা। জজ বুড়োকে এমন ভাবে নাস্তানাবুদ করতে হবে, যা দেখে দেশের এই জাতীয় বিয়ে-পাগলা বুড়োদের রীতিমত আক্কেল হয়।

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন—সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমাদের ভাবতে হবে, বিয়ের রাতেই মেয়েটিও যাতে কোন সৎপাত্রের হাতে পড়ে।

একটু থামিয়া ও মনে মনে কি ভাবিয়া শক্তি কহিল—আমরা এ কথাটাও যে ভাবিনি তা নয়। আমাদের প্রেসিডেণ্ট সব বিষয়েই ভারি হুঁসিয়ার। খুব ভাল একটি ছেলের সন্ধানও তিনি পেয়েছেন। তারও নাকি ধনুর্ভঙ্গ পণ—বিয়ে যদি করতেই হয়, এমন মেয়েকে সঙ্গিনী করা চাই, যার পিছনে টাকার কোন আকর্ষণ নেই। ঠিক এই রকমই একটি ছেলে হাতে এসেছে। সংসদের আর একটা কেসের ব্যাপারে এই ছেলেটি খুব সাহায্যও করছে।

বিস্ময়ের সুরে নির্ম্মলকান্তি জিজ্ঞাসা করিলেন—আর একটা কেস চলছে নাকি?

শক্তি উত্তর করিল—হ্যাঁ। তবে সেটি এত জটিল আর ব্যাপক নয়। তবে এই কেস্‌টার ব্যাপারে আমরা জানতে পেরেছি, ছেলেগুলোকে আমরা যতটা দোষী আর নিষ্ঠুর ভাবি, আসলে কিন্তু তা নয়। ওদের কানে ঠিক মত মন্তর যদি দেওয়া যায়, ওদের হাতগুলো তখন পণ-প্রথার ঐ শিকড় ছেঁড়বার জন্য নিস্‌পিস্‌ করতে থাকবে, ওরাই তুলবে তখন বিদ্রোহ।

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন—মায়ের জাত আপনারা—এ পাপ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে যখন নেমেছেন, এর পর দেখবেন—দেশের ছেলেরাও আপনাদের সংসদে নাম লেখাবার জন্যে মেতে উঠেছে। তখন পণ-প্রথা-নিবারণের নিশান তুলে ওরাই আপনাদের ফলো করবে। আচ্ছা, জজ সাহেবের সম্বন্ধে আমি ভাববো; কাল আবার এই সময় আমাদের কথা হবে।

শ্রদ্ধার সহিত নির্ম্মলকান্তিকে ধন্যবাদ দিয়া শক্তি বিদায় লইল।

বারো

সকালের অপ্রীতিকর ব্যাপারটির পর সমস্ত দিনটুকু অস্বচ্ছন্দভাবে কাটাইয়া বিকালের দিকে রায় বাহাদুর অবসন্ন চিত্তটিকে কিঞ্চিৎ উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে অধুনা-লব্ধ মৌতাতটির শরণাপন্ন হইলেন।

সকালের দিকে যেভাবে তিনি সোফাখানির মধ্যে বিরাট বপুটি ন্যস্ত করিয়া ভাবী প্রণয়িণীর শ্রীহস্তে লিখিত প্রণয়-পত্রখানির মাধুর্য্যে মশগুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবেলাও সেই পন্থা অবলম্বন করিলেন। পাঠ শুরু করিতেই মনের জমাট-অন্ধকার ধীরে ধীরে যেন হাল্কা ও পাতলা হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে আশার আলোর ঈষৎ আভাও পড়িল। অমনি বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত মানস-পটে যেন একখানি মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়া ইঙ্গিতে জানাইয়া দিল—কিসের ভাবনা, আমি যখন তোমাকে ভালবেসেছি!

উৎসাহে রায় বাহাদুরের মুখখানি পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিজের মনেই কি একটা কথা কুমারী-সংসদের উদ্দেশে বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু পার্শ্বের আধারে রক্ষিত টেলিফোন যন্ত্রটি ঝঙ্কার তুলিয়া তাহাতে বাধা দিল। বিরক্তির সহিত রায় বাহাদুর রিসিভারটি কানের উপর ধরিতেই আহ্বায়কের যে নাম শুনিলেন, তাহাতে বিরক্তির চিহ্ন পলকে মুখেই মিলাইয়া গিয়া ঔৎসুক্যের স্নিগ্ধ আভা ফুটিয়া উঠিল। সাগ্রহে কহিলেন—অবনীবাবু? বলুন···আফিস থেকে বলছেন?···হ্যাঁ · আজ সকালে পাঞ্জাব মেলে এসেছি···আপনাকে আর খবর দেওয়া হয়নি···তবে খবর আজই পেতেন অবশ্য···কি বললেন?···কুমারী-সংসদের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন?··· বলেন কি·· আজও আপনার আফিসে ধাওয়া করেছিল? হ্যাঁ···এখানে এসেছিল···তিন তিনটে ডেঁপো মেয়ে···কিন্তু আমি অল্পে ছাড়ছিনে রীতিমত শিক্ষা দেব···চেপে যাব?·· আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি?··· সত্যি?···চুপি চুপি কাজ সারতে চান?···তা মন্দ যুক্তি নয়···বুঝতে

পেরেছি—আপনাতে আমাতে সম্প্রদানের আগে দেখা-সাক্ষাৎ না হয়… জলধর কে ?…আপনার আত্মীয়…আপনার হয়ে সে আসবে এখানে… কথাবার্ত্তা পাকা করবে সব…বেশ বেশ…বুঝিছি…খুব ভাল আইডিয়া… হ্যাঁ—ভারি মজা হবে…দু' তারিখে শুনবে আগের রাতেই শুভ কাজ হয়ে গেছে·· হ্যাঁ—হ্যাঁ অত করে বলতে হবে না—চুপি চুপিই হবে…আচ্ছা আপনি জলধরকে কালই এখানে পাঠাবেন…হ্যাঁ—আটটার সময় এলেই হবে…আচ্ছা—নমস্কার।

রিসিভার যথাস্থানে রাখিয়া অতিরিক্ত আনন্দে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রায় বাহাদুর আলস্য-ভাঙ্গিয়া দেহটাকে জুত সই করিয়া লইলেন। কিন্তু পরক্ষণে টিপয়টির উপর রক্ষিত চিঠিখানার উপর নজর পড়িতেই ঝাঁ করিয়া একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। চিঠির মধ্যে অনুরোধ রয়েছে আর্জ্জীর আকারে—তাঁর কলকাতায় আসার খবরটা আর কেউনা জানতে পারে, এমন কি অবনীবাবু পর্য্যন্ত নয়। কিন্তু জানাজানি ত হয়ে গেল, এখন উপায় ? পুনরায় সোফার ভিতরে চাপিয়া বসিয়া রায় বাহাদুর উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইলেন। পাকা মাথার অল্প সাধনাতেই উপায় একটা উদ্গত হইল। তিনি ত আর নিজে ইচ্ছা করিয়া কলিকাতায় তাঁহার আসার খবরটি রাষ্ট্র করেন নাই, কুমারী-সংসদ যে আগেই ইহা জানিয়াছে। কিন্তু কেমন করিয়া জানিতে পারিল, সেইটিই একটা সমস্যা ! চুলায় যাউক কুমারী-সংসদ, অবনীবাবু মাথা খেলাইয়া যে মতলব বাহির করিয়াছেন, তাহাতে সংসদের হুমকীই সার হইবে। ইতিমধ্যে বিয়ের পাট যদি চুকিয়া যায়—এপ্রিলের দুই তারিখে বোঝাপড়া করিতে আসিয়া তাহারা দেখিবে—The birds have wings—পাখী উড়িয়া গিয়াছে—আর, কলিকাতায় আসিবার খবরটি অবনীবাবু জানিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া ভাবনারই বা কি কারণ থাকিতে পারে ? অবনীবাবু ত অতঃপর

ঐ হতভাগা সংসদের ভয়ে গা ঢাকা দিবেন, কথাবার্ত্তা চালাইবে তাঁহার আত্মীয় জলধর। ভাবিয়া চিন্তিয়া ভদ্রলোক মতলবটি বাহির করিযাছেন ভাল। জলধর একবার আসিলে হয়, কোন্‌খানে তার অভাব আর ফাঁক, সেটি জানিয়া লইয়া বিবরটি বন্ধ করিয়া দিলেই সে তৎক্ষণাৎ কৃতার্থ হইয়া তাঁহার অনুকূলেই জল চালিবে। আর সবিতা—সে ত চিঠির ভিতর দিয়াই তাহার অন্তরটি দেখাইয়া দিয়াছে, আজ রাত সাতটার সময়ে মোটরে আমার পাশটিতে বসিয়া সে…

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং-শব্দে টেলিফোন-যন্ত্রটি পুনরায ঝঙ্কার তুলিল। রায় বাহাদুরের চিন্তাস্রোতও ভাঙ্গিয়া গেল! রিসিভারটি কানে লাগাইয়া গুরুগম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—হ্যালো! রায বাহাদুরের কানে নারী-কণ্ঠের স্বরতরঙ্গ প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিবামাত্র পরক্ষণে মুখখানা তাঁহার কঠিন হইয়া উঠিল, নারীকণ্ঠের সঙ্গে সকালের তিনটি সাংঘাতিক নারী-মূর্ত্তির ভীতিপ্রদ স্মৃতি তাঁহাকে বুঝি ত্রস্ত করিযা তুলিল। টেলিফোন গাইডের নম্বর দেখিয়া তাহারাই ফোন করিতেছে না ত? কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতার শেষ পরদায় তুলিয়া প্রশ্নের উত্তরে রায় বাহাদুর কহিলেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ—জজ-ভিলা এটা, তুমি কে—কি দরকার তোমার এখানে?

কিন্তু পরক্ষণে পিয়ানোর আলাপের মতন অতি মধুর সুরে যে নামটি তাঁহার কানে সুধা বর্ষণ করিল, তাহাতে রায় বাহাদুরের হাত হইতে রিসিভারটি পড়িয়া যাইবার মত হইল। কি সর্ব্বনাশ, যাহার চিন্তায় তাঁহার সমস্ত বুকখানি ভরিয়া রহিযাছে, তাহাকে তিনি চিনিতে না পারিয়া অভদ্রের মতন এমন কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিয়া বসিলেন! ছি—ছি! কি মনে করিল সবিতা? কিন্তু চিন্তার অবসর কোথায়, ওদিকে কানের ভিতরে টেলিফোনের তার দিয়া-যে সুধার লহর ছুটিয়াছে! কণ্ঠকে মার্জ্জিত ও মিষ্ট করিয়া উত্তর দিতে হইল—হ্যাঁ, সত্যিই আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলুম,

তার কারণ, এটা ভাবতেই পারিনি যে···কি ভেবেছিলুম?···ঠিক, ঠিক, মনের কথাটাই টেনে বললে তুমি···কুমারী-সংসদের তাড়কারাক্ষসীরাই বুঝি ফোনেও তাড়া করেছে···হ্যাঁ, সেই ভেবেই অমন চড়া গলায় ধমক দিয়েছিলুম···ভুলে যাবার জো কি, তোমার চিঠিখানা খুলেই ব'সে ব'সে ভাবছি কতক্ষণে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসে···অনেক কথা আছে? বেশত, গাড়ীতে বসেই শোনা যাবে··হ্যাঁ, ঘুরেই যাবো—কেউ যাতে 'ফলো' না করে, বুঝতে পেরেছি···মনে আছে, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাতটায়···হ্যাঁ, তুমি তৈরি হয়ে থাকবে···তিনটে স্বর্গ দেব?···বেশ তাই হবে···তাতে কি··· আজ আমি তোমার কাছে দাতাকর্ণ হব··কি বললে, ওটা পুরোণো হয়ে গেছে? আচ্ছা তবে পালটে বলছি—কল্পতরু হওয়া যাবে···মনে ধরেছে তাহলে কথাটা···তোমার খুসিতে আমিও খুসি···আচ্ছা···আচ্ছা।

টেলিফোনের আলাপের পর রায় বাহাদুরকে এরূপ উল্লসিত দেখা গেল যে, হাতের রিসিভারটি কোথায় রাখিবেন তাহা যেন ভাবিয়া পাইতে-ছিলেন না। বিধাতা যদি তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য অশরীরী করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় উদ্দাম বায়ুর সহিত মিশিয়া কক্ষের প্রত্যেক জিনিসটির কানে কানে তাঁহার এই বিপুল উল্লাসের কথা শুনাইয়া স্বস্তি পাইতেন।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া রায় বাহাদুর দেখিলেন বড় কাঁটাটি যেন আজ মন্থরগতিতে চলিয়াছে, এখনও সাড়ে পাঁচটার কক্ষ অতিক্রম করে নাই। কিন্তু আর বসিয়া বসিয়া এভাবে সময়টি বৃথা নষ্ট করিতেও তাঁহার অন্তর সাড়া দিতেছিল না, অঙ্গ-প্রসাধন পর্ব্বটি আজ একটু ভাল করিয়াই সারিতে হইবে; হাজার হউক প্রবীণ বয়সের রূপ-সজ্জার ব্যাপারটি ত নিতান্ত সোজা নয়, কতখানি সময়ের প্রয়োজন হইবে কে জানে!

সুতরাং রায় বাহাদুরকে এবার সবেগে উঠিতে হইল।

তেরো

এদিকে, পর পর আরও তিনটি দিন নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে একুশ নম্বরের বাড়ীর বাহিরের গোল-টেবিল ঘরে শিবদাসকে হাজির করাইয়াও সংসদের সভ্যাদের কেহই বাহির হইলেন না।

শিবদাস প্রত্যহই আসিয়া দেখে, নিভা তাহার আগেই আসিয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু কাহার উদ্দেশে নিভার এই আকুল প্রতীক্ষা, তাহা সে স্থির করিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু কথোপকথনে কাটিয়া যায়, কত আলোচনাই দুই তরুণ-তরুণীকে অবলম্বন করিয়া এই নিভৃত কক্ষটি গুঞ্জরিয়া উঠে।

শিবদাস মনে মনে ভাবে, চুলোয় যাক কুমারী-সংসদ, তাহার হাতের লেখা চিঠি লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহারা করুক, কিন্তু তাহাদেরই অনুগ্রহে তাহার তরুণ মনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন-যে অদৃশ্য হস্তে তাহার কাজ এখানে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহা সে বুঝিয়াছে—খুব তীব্রভাবেই বুঝিতে পারিয়াছে। কয়দিনের আলাপেই এই মেয়েটির নিকট তাহার তরুণ-মনটি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়াছে, ইহা সে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে না। এত আবেশ, এমন মুগ্ধতা, তাহার জীবনে বুঝি এই প্রথম। সংসদের কুমারীদের কঠিন হস্তের সমস্ত আঘাত অবাধে গ্রহণ করিয়াও এখানকার কয়টি দিনের মধুর স্মৃতিটুকুকেই সে চিরসাথী করিয়া জীবন সার্থক করিবে।

শিবদাস এখানে নিজের কথা একেবারে কমাইয়া দিয়াছে, নিভার কথাগুলি সে যেন গিলিতে থাকে। যে-সব কথায় রীতিমত

ঝাঁজ কিম্বা খোঁচা থাকে, সেগুলি তাহার আরও অধিক উপভোগ্য, গায়ে না মাখিয়া ভাবে—যেন রণবাদ্য! নিভা শিবদাসের ভাবপ্রবণতায় মনে মনে হাসে, কিন্তু ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না, ইয়ুনিভারসিটির দুর্গম দরজাগুলি যে মানুষটি অবাধে পার হইয়া আসিয়াছে, আজ তাহার মত একটি সাধারণ মেয়ের কাছে সে হার মানিয়া আত্মতৃপ্তি পায় কেন?

সে দিন মুখখানি রীতিমত গম্ভীর করিয়া শিবদাস এ বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল। নিভা বোধ হয় তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, বাড়ীর ভিতর তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি হারমনিয়মে সুর দিল, সঙ্গে সঙ্গে বাউলের সুরে গান ধরিল:—

বাঙ্গলাদেশের ছেলের মেজাজ বোঝাই বড় শক্ত,
শুনতে হলে বাপের কথা, (তাদের) চক্ষু হয় গো রক্ত।
ডাইনে যেতে বলেন যদি বাপ,
ছেলে বলে—এ কি দারুণ পাপ!
অমনি ফেরেন বাঁ-দিক-পানে, এমনি পিতৃভক্ত।
কিন্তু আবার আসেন যখন বিয়ের কথা নিয়ে
কণের বাবা দুয়ারে তার গলায় কাপড় দিয়ে,
অমনি, তাহার মেজাজ ঘোরে ভাই,
বেজায় নম্র, মুখে কথা নাই,
পণের দাবী দিতে যদি দেখে তাঁরে অশক্ত,
বঙ্গ-দুলাল অমনি পিতার হবেন অনুরক্ত।

বাহিরে দাঁড়াইয়া শিবদাস গানখানি আগাগোড়া শুনিল, তাহার পর আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর অতিশয় গম্ভীর হইয়া প্রবেশ করিল।

নিভা হাসিমুখে কহিল—এই যে এসেছেন!

শিবদাস কহিল—আপনার এ সবও আসে, দেখছি।

নিভা কহিল—আজ এসেই দেখি, হারমনিয়মের ওপর গানের এই কাগজখানা খোলা প’ড়ে রয়েছে। গানটা পড়েই একটু কৌতুক অনুভব করলুম, গাইবার লোভটুকুও সংবরণ করতে পারলুম না। গানখানি বেশ নয়?

শিবদাস কহিল—মন্দ কি! গান প’ড়ে এবং গেয়ে কৌতুক ত অনুভব করলেন, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ওটি হারমনিয়মের ওপরেই ফেলে গেছেন, সেটুকু অনুভব করতে পেরেছেন কি?

নিভা বিস্ময়ের ভঙ্গিতে কহিল—না ত! কিন্তু আপনার মনেও যে আজ সংশয়ের আশঙ্কা?

শিবদাস একটু বিচলিতভাবেই উত্তর দিল—তার রীতিমত কারণ উপস্থিত হয়েছে। আপনি হয় ত শুনে আশ্চর্য্য হবেন, আমাকে লক্ষ্য করেই গানখানি বাঁধা হয়েছে—

তাই না কি?

আর, আমাদের সারা বিকেলটা এখানে আটকে রেখে ওঁরা কি করছেন জানেন? পুকুর গুলিয়ে বেড়াচ্ছেন।

বলেন কি! শেষকালে সংসদ ফেলে ভোঁদড়ের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন?

ঘৃণায় মুখখানি বিকৃত করিয়া শিবদাস কহিল—ভোঁদড়ের বেহদ্দ ওঁরা—যত সব নোংরা কাজ ক’রে ক্রমশঃ দেশের বিভীসিকা হয়ে উঠেছেন।

নিভা কৌতূহলী হইয়া কহিল—এমন! কিন্তু আপনি ওঁদের সম্বন্ধে এত খবর সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে?

শিবদাস এবার একটু উত্তেজিতভাবেই উত্তর দিল—শুনবেন ওদের ইতরমীর কথা—যে চিঠির জন্যে আমি এখানে ক’দিন ধ’রে ধর্ণা দিচ্ছি,

সে চিঠি দেখিয়েছে আমার বাবাকে এবং তা উপলক্ষ ক'রে তাঁকে রীতিমত শাসিয়েছে!

নিভা যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে—দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বিবর্ণমুখে কহিল—বলেন কি! কিন্তু এই গর্হিত কাজটি ক'রে ওঁরা কি লাভ করলেন?

কথাটার উপর বিশেষ একটু জোর দিয়াই শিবদাস কহিল—বাবাকে জানিয়ে দিলেন—ওঁরা বুদ্ধি খেলিয়ে কি রকম হাতিয়ার সংগ্রহ করেছেন, এর পরও বাবা যদি মত পরিবর্ত্তন না করেন—

কথাটার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এরূপ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসু-ভাবে নিভা প্রশ্ন করিল—অর্থাৎ?

শিবদাসকে তৎক্ষণাৎ অন্যমনস্ক হইতে দেখা গেল। বাবার যে দুর্ব্বলতাটুকু সে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রাখিতে উৎসুক ছিল, উত্তেজনাবশে সেই প্রসঙ্গের আবরণটুকু এমনভাবে নিজের অজ্ঞাতে খুলিয়া দিয়াছে, যাহা ঢাকিবার আর উপায় ছিল না, সুতরাং অগত্যা তাহাকে স্বীকার করিতেই হইল—পণপ্রথা সম্বন্ধে আমার বাবা একটু উৎসাহী ছিলেন।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া নিভা এবার মন্তব্য প্রকাশ করিল—বুঝেছি, ম্যারেজ-মার্কেটে আপনাকে সেল করতে একটা মোটা রকমের দরই বেঁধে দিয়েছিলেন!

কথাটা শুনিয়া মনে মনে অপ্রতিভ হইয়াই শিবদাস কহিল—বাবা যে ছেলের বিবাহ-ব্যাপারে খুব উদার নন, এ খবর এঁরা কোনো রকমে সংগ্রহ করেছিলেন, আর ইদানীং এইটিই এঁদের বিজনেসের প্রধান য়্যাজেণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সুতরাং বুঝতেই পারছেন, বাবাকে ভয় দেখাতে ঐ চিঠিখানার সার্থকতা কত বেশী।

কেন বলুন ত?

বুঝতে পারছেন না—যেখানেই সম্বন্ধ হবে, ওঁরা তার খবর সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন, আর ঐ চিঠি দেখিয়ে জানিয়ে দেবেন—ছেলে পাস করা হলে কি হবে, স্বভাব-চরিত্র দেখুন না কেমন চমৎকার! বাবা একবারে ভেঙ্গে পড়েছেন, আজ সকালেই আমার মেসে এসে হাজির, আমি ত লজ্জায় এতটুকু; শেষে সব কথা খুলেই বললুম।

কি সর্ব্বনাশ! তার পর? তিনি কি বললেন?

আশ্চর্য্য! একেবারে মুসড়ে পড়েছেন। তাঁর মুখ দেখলে কষ্ট হয়; বোধ হয় একটা রফা করতে চান, কিন্তু আমাকে আর কোনও কথাই বলেন নি।

দুই চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া নিভা কহিল—তাই বুঝি এখানে এসেই ঐ গানখানা শুনে আপনিও একেবারে মুসড়ে গিয়েছিলেন! গানখানা ত তা হ'লে প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর এফেক্টও কিঞ্চিৎ হয়েছে, নয় কি?

শিবদাস মনে মনে লজ্জা অনুভব করিলেও বাহিরে একটু উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিল—বুঝতে পারছেন না, আগে থাকতেই এঁরা সঙ্কল্প স্থির করেই কাজে নেমেছিলেন। আপনার সম্বন্ধেও হয়ত এমনই একটা উদ্দেশ্য এঁদের মনে···

নিভা সহসা চমকিত হইয়া হাত তুলিয়া কহিল—দাঁড়ান! আপনার কথা শুনে আমিও একটা ব্যাপার এখন ফীল্ করছি; আমার মা'র আকস্মিক কঠোরতার কারণটুকুও আমি এবার স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি।

অর্থপূর্ণ-দৃষ্টিতে শিবদাস নিভার মুখের দিকে চাহিল।

নিভা তাহার দৃষ্টি নত করিয়া গাঢ়স্বরে কহিল—আপনাকে বলি-বলি করেও কথাটা বলা হয়নি। আপনি ত জেনেছেন, আমার মা খুবই গরীব;

কিন্তু তা হলেও, আমার বিয়ে দেবার দুর্ব্বলতাটুকু তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। তবে বিনা পয়সায় আজকাল ত মেয়ের বিয়ে হবার উপায় নেই, কাজেই আমার আইবুড়ো নামটুকু খণ্ডাবার জন্য মা এক দোজবরে বর ঠিক করেছেন, বর্ত্তমানে তিনি পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে গিয়েছেন।

অতি বিস্ময়ে নিভার মুখের দিকে চাহিয়া শিবদাস আর্ত্তস্বরে কহিল—বলছেন কি আপনি! আপনার মা—আপনাকে—উঃ! কিন্তু আপনি কি তাঁর কথায় মত দিয়েছেন?

শিবদাসের মুখের দিকে একটিবার চাহিয়া পরক্ষণে সে-দৃষ্টি নত করিয়া নিভা কহিল—মত না দিয়ে উপায় কি বলুন—মার মনে কি কষ্ট দেওয়া উচিত?

শিবদাসের মুখখানি মুহূর্ত্তে ছায়ের মত ফ্যাকাসে হইয়া গেল! দুই চক্ষুর নিষ্প্রভ দৃষ্টি নিভার বেদনাহত মুখখানির উপর স্থাপন করিয়া হতাশের সুরে কহিল—কিন্তু আপনার এই ব্যাপারের সঙ্গে কুমারী-সংসদের ঐ চিঠির কি সম্বন্ধ, তা ত বুঝতে পারছি না!

পশ্চাৎ হইতে অনীতা দেবীর সুস্পষ্ট স্বর উভয়কেই চমকিত করিয়া দিল—সেইটিই এবার বুঝিয়ে দিচ্ছি।

শিবদাসের নিষ্প্রভ দুই চক্ষু উজ্জল হইয়া উঠিল; দেখিল, দিনের পর দিন আকুল আগ্রহে যাঁহাদের প্রতীক্ষা করিয়াছে, যাঁহাদের ইতরতা তাহারা পিতাকে পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ করিয়া কলিকাতায় টানিয়া আনিয়াছে, সংসদের সেই পূর্ব্বদৃষ্টা তরুণীগুলি আজ যেন দয়াময়ী দেবীর মত সদয় হইয়া সহসা আবির্ভূ্তা হইয়াছেন। অভিভূতের মত নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি সে যুক্তকরে অভিবাদনের অভিনয় করিল।

অনীতা দেবী কহিলেন—আমার কথাটুকু শেষ ক'রে আপনার

সংশয়টুকুও সহজ ক'রে দিই, শিবদাসবাবু!—দেখুন, শুধু ভাঙ্গাটাই যে আমাদের কাজ, তা ভাববেন না যেন, যোড়া দিতেও আমরা জানি, আর সেই দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশী। এখন যদি বলি, যে-চিঠি যোগাড় ক'রে আপনার বাবার মত ফিরিয়ে দিয়েছি, সেই জাতীয় চিঠির সাহায্যে নিভা দেবীর মায়ের নির্ব্বাচিত অর্দ্ধশত বৎসরের বৃদ্ধটিকে সরিয়ে দিয়ে, বাইশ বছরের এক তরুণকে তার যায়গায় এনে দাঁড় করাতে পেরেছি, তাতে কি কুমারী-সংসদের আসল উদ্দেশ্যটুকু আপনার কাছে এখনো দুর্ব্বোধ্য থাকবে শিবদাসবাবু?

সন্দিগ্ধভাবে অনীতা দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া ভাব-গদ্‌গদস্বরে শিবদাস কহিল—দেখুন, আমি এখনও অন্ধকারে প'ড়ে রয়েছি, কি যে বলব, ভেবে পাচ্ছি না।

অনীতা দেবী সহাস্যে কহিলেন—যা বলবার আমরাই বলছি, আপনি শুধু উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকুন—আপনার বাবা একবারে বদলে গেছেন, দশ হাজারের মোহ কাটিয়ে কুমারী-সংসদের পেট্রণ হয়েছেন।

বিস্ময়ানন্দে অনীতা দেবীর দিকে চাহিয়া শিবদাস কহিল—সত্য বলছেন?

অনীতা দেবী হাসিমুখে কহিলেন, আজ্ঞে হাঁ, এখন যে শিব ও সুন্দরের সংযোগ হবার সুযোগ এসেছে, কাজেই সত্যের আবির্ভাবও অবশ্যম্ভাবী। হ্যাঁ, আরও কিঞ্চিৎ কথা আছে, সেইটুকু বলেই প্রসঙ্গটার উপসংহার করছি;—এই দুটি তরুণ হৃদয়কে একসঙ্গে যোজনা করবার জন্য শ্রদ্ধেয় হরিদাস গাঙ্গুলীমহাশয় প্রসন্নচিত্তেই আজ এখানে আশীর্ব্বাদ করতে আসছেন। নিভা দেবীর মা আগেই এসেছেন। অতএব উভয়েই প্রস্তুত হন।

অস্তসূর্য্যের আভাটুকু ঠিক এই সময় জানালার খড়খড়ির ভিতর

দিয়া নিভার সুন্দর মুখখানির উপর পড়িয়া তাহার নিটোল সৌন্দর্য্য আরও অপরূপ করিয়া তুলিল।

অপ্রত্যাশিত উল্লাসে অভিভূত শিবদাসের মুখ দিয়া উচ্ছ্বাস-কম্পিত স্বর বাহির হইল—আমাকে ক্ষমা করুন, আপনাদের সম্বন্ধে আমি ভুল ধারণা করেছিলুম।

মায়া সকৌতুকে হাসিয়া কহিল—আমাদের সম্বন্ধে আপনার বাবার ধারণাটিও ভাল ছিল না শিবদাসবাবু, কিন্তু এখন তিনি নিজের মুখেই কি বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, সেটাও শুনে রাখুন—"আমি যেমন বুনো ওল, তোমরা তেমনি বাঘা তেঁতুল।"

চৌদ্দ

যে দুইটি তরুণীর উদ্ধার-ব্যাপারে কুমারী-সংসদ পরিপূর্ণ উদ্যমে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, মুকুল রায় ওরফে বিপুল বিশ্বাস, জলধর চট্টোপাধ্যায় এবং নির্ম্মলকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় পয়লা এপ্রিলের স্মরণীয় নিশায় তাহাতে যবনিকাপাতের উপক্রম দেখা দিল।

কিন্তু এই ব্যাপারটির পূর্ব্বে মার্চ্চ মাসের পঁচিশ তারিখের সকাল হইতে পয়লা এপ্রিলের নিশা পর্য্যন্ত সংসদকে সহৃদয় সহযোগিত্রয়ের আনুকূল্যে 'শঠে শাঠ্যং' নীতিটি বক্রপথে চালনা করিয়া যে বিচিত্র পরিস্থিতি পাকাইয়া তুলিতে হয় তাহা সত্যই বিস্ময়াবহ।

পঁচিশ তারিখে সন্ধ্যা সাতটায় বিপুল তাহার ভগিনী সবিতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া হাসি মুখে রায় বাহাদুরের পাশে বসিয়া শুধু তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াই নিরস্ত হয় নাই; টেলিফোনে রায় বাহাদুর 'কল্পতরু' হইবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কড়ায়-গণ্ডায় তাহা আদায় করিয়া তবে রেহাই দিয়াছিল। বসন ভূষণগুলি হস্তগত করিয়া সে যখন বেচারী মুকুলের জন্য সুপারিস করে, তাহার ভ্রাতৃস্থানীয় দুর্ভাগ্য কিশোরটিকে মার্জ্জনা করিবার আবেদন জানায়, রায় বাহাদুর তৎক্ষণাৎ তাহার নির্দ্দোষিতার স্বপক্ষে পত্র লিখিয়া প্রিয়তমার হাতে দিয়া বলেন যে, পত্রখানি বেনারসের পুলিস সুপারের নিকট দাখিল করিলেই মুকুল রেহাই পাইবে। ইহা ত গেল দাতাকর্ণের স্বহস্তে প্রস্তুত বন্ধন-রজ্জুর গ্রন্থি-উন্মোচন-পর্ব্ব। প্রায় তিনটি হাজার টাকার বসন-ভূষণের উপর আর যে ব্যাপারটির জন্য তাঁহাকে সে-রাত্রিতে আক্কেল-সেলামী দিতে হয়, তাহা

হইতেছে—শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের বসত-বাড়ী—অবনী রায়ের দেনার দায়ে যাহা পরহস্তগত হইয়াছিল। সে-রাত্রিতে রায় বাহাদুর কল্পতরুতে পরিণত হইয়া ঐ বাড়ীর সম্বন্ধে পার্শ্ববর্ত্তিনী ভাবী প্রিয়াটির সহাস্য মুখনিসৃত সুমধুর স্বরের আবদার শুনিলেন—আমার ভারি সাধ, শ্যামপুকুরের ঐ বাড়ীখানিতেই আমাদের দুটি প্রাণে মিলন-গ্রন্থি পড়ে। তাহলে কুমারী-সংসদ টেরও পাবে না, আর বাড়ীখানাও আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে।—প্রিয়াকণ্ঠের প্রস্তাবটি রায় বাহাদুরের কান দুটিতে যেন সুধাবর্ষণ করে, পুলকে তাঁহার সমস্ত অন্তরটি বুঝি নাচিয়া উঠে, তৎক্ষণাৎ তাহাতে সায় দিয়া কহিয়াছিলেন—দুদিনের মধ্যেই বাড়ীখান তিনি সবিতাদেবীর নামে কিনিয়া ফেলিবেন।

পরদিন হইতে পরবর্ত্তী কাজগুলি সমাধা করিতে বক্রপথে জলধরকে শাঠ্যের চাকা ঘুরাইতে হয়। পাঁচশ তারিখের অপরাহ্নে অবনীবাবুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই রায় বাহাদুরকে ফোন করিয়া জজ-ভিলায় জলধরের প্রবেশ-পথ সুগম করা হইয়াছিল। ফলে, পয়লা তারিখের পূর্ব্বেই সবিতার নামে বাড়ী খরিদ, সংস্কার, আসবাব পত্রাদির দ্বারা সাজানো—একে একে সমস্তই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহ-ব্যাপারের যাবতীয় খরচ-পত্র রায় বাহাদুর বহন করিবেন—ইহা স্থির থাকায়, জলধরের নামে মোটা অঙ্কের একখানা চেকও তিনি লিখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। এইভাবে লুণ্ঠিত অর্থ ও গহনাপত্রাদি জয়লব্ধ সম্পদরূপে হস্তগত করিয়া কুমারী-সংসদের পক্ষ হইতে শ্যামপুকুরের নবক্রীত সুসজ্জিত বাটীতে পয়লা এপ্রিল তারিখে যুগপৎ দুইটি শুভ বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। জলধরকে রায় বাহাদুর এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দেন—বিবাহের কথাটি যেন কাক-চিলেও জানবার কোন সুযোগ না পায়; যে ভাবে নিত্য বৈকালে আমি ময়দানে বেড়াতে বেরুই, সেই ভাবেই সাদাসিধা কাপড়-জামা প'রেই

একলাটি ওখানে যাব ; আজকাল ত সভ্য-সমাজে বরের চেলীর জোড় প'রে সঙ্ সাজবার পাঠ উঠেই গেছে, আমিও না হয় সেই দলেই ভিড়লুম, তাতে আর কি এমন আটকাবে ?

জলধর বিস্ময়ের ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তা যেন হ'ল কিন্তু পুরুত-নাপিতও কি সঙ্গে নেবেন না ?

রায় বাহাদুর হাসিয়া উত্তর দেন—কি দরকার ? এমন কোনও কথা নেই যে বরপক্ষের পুরুত-নাপিত না হ'লে বিয়ে সিদ্ধ হবে না। তোমাদের পুরুত-নাপিত ত আছে, তারাই করবে কাজ ; নাই বা হ'ল দু'পক্ষের পুরুত-নাপিতের গুলতানি। সংক্ষেপেই সব সারবার ব্যবস্থা কর।

সুতরাং বিবাহরাত্রিতে সেই ব্যবস্থাই হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে এ-দিন বিবাহের দুইটি লগ্ন ছিল ; একটি ঠিক সাড়ে দশটায়, অপরটি রাত্রি পৌনে বারোটায়। রায় বাহাদুর এই অপ্রত্যাশিত লগ্ন নির্ণয়ের জন্য মনে মনে বোধ হয় পঞ্জিকাকারদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। কাক-চিলের অজ্ঞাতে সন্তর্পণে বিবাহের পক্ষে শেষের লগ্নটিই প্রশস্ত।

রাত্রি দশটার সময় নবক্রীত সবিতা-সদনের সম্মুখে একখানি ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতর হইতে অতি সন্তর্পণে রায় বাহাদুর নামিয়া আসিলেন। পরিচ্ছন্ন সাদা-সিধা পরিচ্ছদ, নরুণপাড় কোঁচানো ধুতি, সাদা গরদের পিরাণ, হাতে ও গলায় যুঁইফুলের গোড়ে মালা। জলধর প্রস্তুত হইয়াই বাহিরে রায় বাহাদুরের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া চলিল। বাহিরে কোনওরূপ আড়ম্বরের পরিচয় না পাইয়া রায় বাহাদুর মনে মনে খুসী হইলেন। কিন্তু তিনি যদি একটু অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে জানিতে পারিতেন যে বাড়ীটির সংলগ্ন আর একখানি বাড়ী যাহা খালি পড়িয়াছিল, তাহা

বিবাহ-রাত্রির জন্য এই বাড়ীর সহিত মিলিত হইয়াছে ও দুই অংশে নীরবে দুইটি শুভ-বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিয়াছে।

দ্বিতলে যে ঘর খানির ভিতরে রায় বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া বসান হইল, সেখানি অপেক্ষাকৃত বড় ও সুন্দরভাবে সাজানো। ঘরজোড়া সতরঞ্চির উপর ধবধবে জাজিম পাতা, কয়েকটা বড় বড় তাকিয়া, এক পার্শ্বে একটা হারমনিয়ম; বরের বসিবার যোগ্য স্বতন্ত্র আসন, দুই পার্শ্বে পিতলের দুইটি ফুলদানির উপর ফুলের তোড়া; অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটিই নাই।

রায় বাহাদুর বরাসনে বসিতেই শাঁক বাজিয়া উঠিল উলুধ্বনিও শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুসজ্জিতা তরুণীর দল কলহাস্যের ঝঙ্কার তুলিয়া কক্ষমধ্যে রঙ্গভূমির সখির ঝাঁকের মত নৃত্যভঙ্গিতে প্রবেশ করিল। রায় বাহাদুর অবাক, আগন্তুকাদের রূপের প্রখর উত্তাপে তাঁহার দুই চক্ষু যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। বলা আবশ্যক, পঁচিশ তারিখের সকালে যে তিনটি স্থূলাঙ্গী মেয়ের সহিত রায় বাহাদুরের আলাপ হইয়াছিল, তাহাদের কেহই এ ঘরে এ সময় আসে নাই।

তরুণীদলের এক জন কহিল—লগ্ন বেশী রাতে কি না, তাই বিয়ের আগেই বাসরের ব্যবস্থা হয়েছে।

আর এক তরুণী স্মিতহাস্যে কহিল—যদিও ব্যবস্থাটি ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার মত, কিন্তু বিয়ের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে নজীর যথেষ্ট আছে। এখন হাকিম হুজুর যদি কোন কসুর না নিয়ে হুকুম দেন!

রায় বাহাদুর তরুণীদের রসালাপে প্রচুর আনন্দের আস্বাদ পাইয়া প্রসন্নভাবে কহিলেন—ভালই ত, এই ত চাই; যেমন দেখছি তোমাদের রূপ, বুদ্ধি-বিবেচনারও তেমনি পরিচয় পাচ্ছি। তবে একটা কথা—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা শ্রীমতী শক্তি

বোস সুসজ্জিতা অবগুণ্ঠনবতী কন্যার হাতখানি ধরিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে পরিহাসের সুরে কহিল—হবু বধূটিকেও ধ'রে এনেছি হুজুরের এজলাসে—

রায় বাহাদুর বোধ হয় এই কথাটিই বলিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন। অবগুণ্ঠনবতী ভাবী বধূটিকে দেখিয়াই মুখখানি তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কেননা, গুণ্ঠনের ফাঁক দিয়াই ক'নের মুখের সলজ্জ হাসি ও সপ্রেম দৃষ্টি রায় বাহাদুরের মুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তরুণীরা সমস্বরে কহিল—হুজুরের পাশে—একবার গা ঘেঁসে বসিয়ে দে!

শক্তি অবগুণ্ঠনবতীর হাতখানির উপর একটু ঝাঁকুনি দিয়া কহিল—ব'স্ লো ছুঁড়ী ব'স্—অত লজ্জা কিসের? কত বড় ভাগ্যধরী তুই, জজ সাহেবের মেমসাহেব হতে চলেছিস্—ব'স্ এখানে।

অতিমাত্রায় লজ্জিতা অবগুণ্ঠিতাকে এক প্রকার জোর করিয়াই শক্তি রায় বাহাদুরের বামপার্শ্বে বসাইয়া দিল, তাহার পর অপাঙ্গে রায় বাহাদুরের দিকে চাহিয়া কহিল—হুজুর কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে ক'নের ঘোমটাখানি এখন খুলবেন না যেন! শুভদৃষ্টির আগে বিয়ের রাতে মুখ দেখতে মানা কি না, তাই!

মনে মনে হাসিয়া রায় বাহাদুর কহিলেন—সে ভয় তোমাদের নেই গো নেই। বিয়ের আগেই যখন বাসর বসিয়েছে, আর ওঁকেও যে এখানকার আমোদে যোগ দিতে এনেছ, এতেই আমি খুব খুসী হয়েছি।

শক্তি অবগুণ্ঠনবতীর গণ্ডে একটি ঠোনা দিয়া কহিল—ওলো ক'নে, শুনছিস্ তোর বরের সোহাগের কথা?

খিল খিল করিয়া তরুণীরা হাসিয়া উঠিল। হাসির উচ্ছ্বাস থামিতেই মায়া কহিল—তা হ'লে উৎসব আরম্ভ হোক!

শক্তি উত্তর দিল—নিশ্চয়ই ; বর এইবার তাঁর চির-তরুণ কণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার তুলে এখানে স্বর্গ রচনা করুন।

রায় বাহাদুর কহিলেন—স্বর্গ রচনা ভারটুকু তোমাদের ওপরেই দিচ্ছি।

একাধিক কণ্ঠে আপত্তি উঠিল—তা কি হয়, হুজুর ?

অবশেষে এক তরুণী মীমাংসা করিয়া দিল—কোর্টের হুজুর যদিও আজ আমাদের কোর্টে, তথাপি তাঁর হুকুম মানা চাই ; ওলো ভাই শক্তি, তুই-ই তা হ'লে এ বাসরে বোধন বসা, তোরই কণ্ঠের সুধাধারায়—

শক্তি তখন হার্ম্মনিয়মটি টানিয়া সুরের ঝঙ্কার তুলিল :—

চির-তরুণ, রূপে অরুণ, এসেছে গো আজি এ শুভ মিলনে,
বয়েস তাঁহার হয়েছে গো পার, ষাঠের কোঠাটী গত ফাগুনে।
মাথায়ে কলপ সাদা অলকে
কেটেছে সীঁথি কত পুলকে
বাঁধানো দশন শোভিছে কিবা অপরূপ লোল-আননে।
গৃহেতে তাঁহার আছে কত পরিজন
ছেলে মেয়ে বধূ নাতি পুতি অগণন
ষোড়শীর পাণি লাগিয়া তবু কত সাধ আজ জাগে গো মনে।

গানের শেষ চরণটি সুরের তালে ঝঙ্কার দিতেই রায় বাহাদুর সক্রোধে সহসা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—বটে, ডেঁপোমী ! ঠাট্টা করা হ'ল আমাকে ! আমি বুঝিনি কিছু বটে, জ্যাঠা মেয়ে কোথাকার—

রায় বাহাদুরের ঝঙ্কারে সঙ্গে সঙ্গে তরুণীগণ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—পুলিস, পুলিস, পুলিস !

রায় বাহাদুর অপ্রতিভ ভঙ্গিতে কহিলেন—আমি কি তোমাদের গায়ে হাত তুলেছি যে পুলিস ডাকছ ?

তরুণী-সঙ্ঘের একজন কহিল—আমরা ডাকছি, না তাদের এখানে আসতে দেখে ভয়ে চেঁচাচ্ছি! ঐ দেখুন না, কোট-প্যাণ্ট পরা, মাথায় হ্যাট, ওরে বাবা—

ভয়ে তরুণীরা জড়াজড়ি অবস্থায় কক্ষের এক প্রান্তে আশ্রয় লইল। পরক্ষণেই পুলিস-ইন্‌সপেক্টরের পরিচ্ছদে কক্ষে নির্ম্মলকান্তির প্রবেশ।

কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি কহিলেন—মাপ করবেন, এক ফেরারী পলিটিক্যাল আসামীর তল্লাসে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে, আমি সার্চ্চ করব আপনাদের—এ কি! রায় বাহাদুর! আপনি এখানে! কি আশ্চর্য্য!

রায় বাহাদুর এতক্ষণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন, নির্ম্মল-কান্তির কণ্ঠস্বর ও পরিচিত মুখখানি যেন তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন আরে কে ও, নির্ম্মলবাবু, তুমি? ব্যাপার কি?

—আর বলেন কেন, চিটাগঙ্গ কনস্‌পিরেসি কেসের ফেরারী আসামী হাবুল হাজরা হায়রাণ ক'রে মারলে আমাদের। আজ সন্ধ্যের সময় কমিশনার সাহেব কি রকম ক'রে খবর পেয়েছেন, এতদিন এ ছোকরা বেনারসে ছিল নাম ভাঁড়িয়ে, সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে কলকাতায়, আর এই বাড়ীতে মেয়ে সেজে লুকিয়ে আছে। তাই না তার সন্ধানে এখানে এসেছি। কিন্তু আপনাকে এ ভাবে দেখে আমি যে একবারে আকাশ থেকে পড়ছি, রায় বাহাদুর? কৈ, কিছু শুনিনি ত!

—শুনবে কি ক'রে? ধ'রে বেঁধে ভগবানকে ভূত সাজিয়েছে দেখছ না! অবনীবাবু আর কোনও উপায় না দেখে, তাঁর মেয়েটিকে চাপিয়েছেন

আমারই ঘাড়ে। কি করি, ভদ্রলোকের কুলরক্ষার ব্যাপার, ঠেলতে পারলুম না ; এই বয়সেই—

—সে যাই হোক, আপনাকে কিন্তু এ সময় এখানে পেয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আপনি একজন রিটায়ার্ড অফিসার, সরকারী কাজে আপনার সহায়তা আমি নিশ্চয়ই পাব, এ আশা করতে পারি। এখন আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে, এদের মধ্যে মেয়ে সেজে সে ছোক্‌রা আছে কি না সে সম্বন্ধে সার্চ্চ করা!

নির্ম্মলকান্তির কথায় রায় বাহাদুরের দুই চক্ষু সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, সেদিনের সেই ডেঁপো তিনটি মেয়ের একটি যেন দরজার কাছটিতে দাঁড়াইয়া আছে। অমনি সংশয়ের সুরে কহিলেন—রোসো ইন্‌সপেক্টর, রোসো, এখন আমার মনে হচ্ছে, কমিশনার সাহেবের সন্দেহ হয় ত সত্যিই হবে ; দরোজার কাছে ঐ যে গুণ্ডা-প্যাটার্ণের মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওকেই আমার সন্দেহ হয়—

সত্যই শ্রীমতী গোদাবরী গুপ্তা এই সময় দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রায় বাহাদুর দুই চক্ষুর জ্বলন্ত দৃষ্টির সহিত হাতের তর্জ্জনী যুগপৎ তাহার দিকেই নির্দ্দেশ করিলেন।

কিন্তু গোদাবরী কিছুমাত্র দমিল না ; রাজহংসীর মত গ্রীবা তুলিয়া সদর্প ভঙ্গিতে রায় বাহাদুরের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দৃপ্তস্বরে প্রশ্ন করিল—আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন ? কি ভেবেছেন আমাকে, স্যর ?

রায় বাহাদুরের সর্ব্বাঙ্গ এবার ক্রোধে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কয়েক দিন পূর্ব্বের ব্যাপারটা যেন চোখের উপর সহসা ভাসিয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন—তুমিই ত সে দিন আমার বাড়ীতে গিয়েছিলে আমাকে শাসাতে! যাওনি তুমি ?

অকুতোভয়ে গোদাবরী উত্তর দিল—গিয়েছিলুম ত। কি হয়েছে

তাতে ? জানতে চেয়েছিলুম, বুড়ো বয়সে নাতনীর বয়সী একটা মেয়ের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে হাত বাড়াচ্ছেন কেন ?

তর্জ্জন করিয়া রায় বাহাদুর কহিলেন—শুনছ ইন্‌সপেক্টর, এর কথা ? এ কখনো মেয়ে নয়, কথাগুলো যেন বন্দুকের বুলেট ; একে তুমি গ্রেপ্তার কর, এ নিশ্চয়ই তোমার চাটগাঁর ফেরারী আসামী হাবুল হাজরা।

গোদাবরী দৃঢ়স্বরে কহিল—নেভার, আমার নাম গোদাবরী গুপ্তা ; মিশন কলেজের থার্ড ইয়ারের নাম-রেজেষ্টারী-খাতায় আমার নাম জ্বল্‌-জ্বল্‌ করছে—লাইক দি ড্যাজলিং সাইন অফ দি সান্‌।

রায় বাহাদুর পুনরায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন—অ্যারেষ্ট কর ওকে ইন্‌সপেক্টর, অ্যারেষ্ট কর ; আমি বলছি, কখনই ও গোদাবরী নয়, দেখছো না চেহারাখানাই ওর outlaw-ry-মার্কা ? নিশ্চয়ই এ মেয়ে নয়, ছোক্‌রা—তোমার ফেরারী হাবুল হাজরা।

গোদাবরী মুখখানি বিপন্নের মত করিয়া কহিল বা-রে, একটু মুটিয়ে গেছি বলেই মানুষ থেকে লরী হয়ে গেলুম !

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন—আপনি যদি বলেন, রায় বাহাদুর—

গোদাবরী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিল—ওঁর বলবার আগে আমিই হাটের মাঝে হাঁড়ী ভেঙ্গে দিচ্ছি, স্যর ! পুলিসের চোখে ধূলো দেবেন ব'লে রায় বাহাদুর নিজেই বহুরূপী হাবুল হাজরাকে ডানা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন—

রোষে রুদ্ধকণ্ঠে রায় বাহাদুর কহিলেন—কি ? কি ?

কিন্তু রায় বাহাদুরের উষ্মা উপেক্ষা করিয়া এই বলিষ্ঠা মেয়েটি তৎক্ষণাৎ সবেগে রায় বাহাদুরের পার্শ্ববর্ত্তিনী অবগুণ্ঠনবতীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিল। সর্ব্বসমক্ষে ভাবী পত্নীর মুখখানিকে এভাবে অবগুণ্ঠনমুক্ত

করিতে দেখিয়া রায় বাহাদুর দারুণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবার মত হইলেও, পরক্ষণে তাঁহার চোখের উপর গোদাবরী গুপ্তা অবগুণ্ঠিতার মাথার এলো খোঁপাটি খপ করিয়া দুই হাতে তাহার মাথা হইতে তুলিয়া লইয়া যে বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধাইয়া বসিল, তাহাতে তাঁহার দেহের সমস্ত ফুটন্ত রক্তও বুঝি পলকে হিম হইয়া গেল।

এ দৃশ্য দেখিয়াই নির্ম্মলকান্তি উল্লাসে চীৎকার তুলিয়া কহিলেন—হুরবে, এই ত আমার আসামী হাবুল হাজরা।

বিপুলের হাতে হাতকড়ি পরাইতে বিলম্ব হইল না।—বিদ্রূপের সুরে বিজয়োল্লাসে নির্ম্মলকান্তি বন্দীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—বিয়ের কনে সেজে দিব্যিটি ব'সে ছিলে ত! এখন তোমাকে কি বলে ডাকব—বেনারসের মুকুল রায়, না···চিটাগঙের হাবুল হাজরা?

রায় বাহাদুর এতক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে এই ছদ্মবেশীর দিকে চাহিয়াছিলেন। কি সর্ব্বনাশ! এই রাজদ্রোহের আসামী এতক্ষণ ক'নে সাজিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিল! তাহলে আগাগোড়াই ধাপ্পাবাজি নাকি? কিন্তু পঁচিশ তারিখের রাতে একেই ত তিনি সবিতা জেনে—

গুপ্ত কথা মনের মধ্যে চাপিয়া রায় বাহাদুর এবার হাকিমী মেজাজে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি রাস্কেল কি ক'রে এখানে এলে—কে তোমাকে এ রকম ক'রে সাজালে?

আসামী উত্তর দিল—সেটা এখনো বুঝতে পারেন নি, স্যর? বলির হাড়কাঠ থেকে সবিতা দেবীকে সরিয়ে দিয়ে আমি নিজেই মাথাটি বাড়িয়েছিলুম! এখন আমার অবস্থা—বিটুইন দি ডেভিল য়্যাণ্ড দি ডীপ্‌ সী!

রায় বাহাদুর দুই চক্ষু পাকাইয়া কহিলেন—আমি তোমাকে জেলে পুরবো, পাজী বদমাস্—

আসামী নির্ভয়ে উত্তর করিল—জেলে ত পা বাড়িয়েই দাঁড়িয়েছি স্যর; কিন্তু এই নিয়ে যদি আপনি বেশী কেলেঙ্কারী করেন, আপনাকেও আমি এমন জড়ান জড়াব, আপনার রায় বাহাদুরী খেতাব আর তার সাথে মোটা পেনশান দুটোই খ'সে পড়বে। বিয়ের লোভে আমার সঙ্গে প্যাক্ট করে ছাড়পত্র লিখে দিয়েছেন মনে নেই? সে কাগজ আমি যত্ন করে রেখেছি।

মুহূর্ত্তে রায় বাহাদুরের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল, অসহায়ের মত নির্ম্মলকান্তির দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন—শুনছ নির্ম্মলবাবু, রাস্কেল ইতরটার কথা? এরা সব পারে।

নির্ম্মলকান্তি গম্ভীরভাবে কহিলেন—শুনলুম ত, কিন্তু বুঝতে ত কিছু পারলুম না রায় বাহাদুর! এখন কি করি বলুন ত?

রায় বাহাদুর নিষ্ফল ক্রোধে পুনরায় তর্জ্জন করিয়া কহিলেন—এ সব চক্রান্ত, রীতিমত চক্রান্ত! আমি ডাকছি অবনীবাবুকে এখুনি; —অবনীবাবু—অবনীবাবু—

আসামী কহিল—তাঁকে ডাকাডাকি বৃথা, তিনি এ তল্লাটে নেই; আর, ঘুণাক্ষরেও এ ব্যাপারের কিছুই জানেন না। এমন কি, পঁচিশে তারিখের বিকেলে ফোনটাও করেছিল তাঁর নামে—এই শর্ম্মা। আর জলধর আমারই জুড়িদার। আপনার কি তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল স্যর—যে খোঁজ খবর নেবেন?

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন—ব্যাপার যে ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে রায় বাহাদুর! এ ছোকরা ত দেখছি পুকুর গুলুতে চায়। প্যাক্ট—পঁচিশে তারিখ—ফোন্—জলধর—এ সবের মানে?

মানে এবং সেই সঙ্গে অবস্থাটা মনে মনে উপলব্ধি করিলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ বিরক্তির ভঙ্গিতে রায় বাহাদুর কহিলেন—

চুলোয় যাক ও সব, আমি এ রকম নোংরা ব্যাপারে থাকতে চাই না নির্ম্মলবাবু, আমি এখন উঠি।

নির্ম্মলকান্তি মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিলেন—কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আপনাকেও যে অনুগ্রহ ক'রে কমিশনার সাহেবের কাছে যেতে হয়, রায় বাহাদুর!

খপ করিয়া নির্ম্মলকান্তির হাতখানা ধরিয়া তাঁহাকে ঘরের শেষপ্রান্তে জানালার দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে রায় বাহাদুর কহিলেন—তুমি বুঝছ না নির্ম্মলবাবু, যেতে আমার বাধা কি? কিন্তু ব্যাপারটা এমনি নোংরা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এর সঙ্গে আমার নামটা যদি ওঠে, অমনি চারিদিকে হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে, আর কাগজওয়ালারা এই নিয়ে যাচ্ছে-তাই শুরু ক'রে দেবে।

নির্ম্মলকান্তি হাসিয়া কহিলেন—তা মিছে নয়; বাড়ীর কাছেই 'পত্রিকা', তার ওপরে 'শনিবারের চিঠি' ত শনির দৃষ্টিতে সব সন্ধান রাখে, টিপ্পনীর সঙ্গে হয় ত একটা কারটুনই এই নিয়ে ছেপে দেবে। কিন্তু কি ক'রে আপনাকে বাদ দিই বলুন ত?

রায় বাহাদুর কতকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন—তুমি ইচ্ছা করলেই পার; আসল ব্যাপারটা আমি তোমাকে খুলে বলছি...

নির্ম্মলকান্তির মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল; কহিলেন—আমি সব বুঝেছি, ঐ বিপ্লবী ছোঁড়াটাকে অবনীবাবুর মেয়ে সাজিয়ে মেয়েদের এই নোটোরিয়স সংসদটা...বেশ কিছু টাকা আপনার খসিয়েছে, তার পর আপনাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। আজকাল এ রকম প্রায়ই হচ্ছে রায় বাহাদুর! এখন আক্কেল সেলামী ভেবে চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আচ্ছা, এরিস্ক্ আমি নিজের ওপরেই নিচ্ছি; তা হ'লে আপনি এক কাজ করুন, এখনি সোজা বাড়ী চ'লে যান্, একটি মুহূর্ত্ত এখানে আর থাকবেন না।

রায় বাহাদুরের ইহাই এখন একান্ত কামনা; এই বিশ্রী ব্যাপারটি হইতে বে-কসুর ও বে-দাগ অব্যাহতির জন্য তিনি ধূলিমুষ্টির মত এখনও অর্থ ছড়াইতে প্রস্তুত। এই অবস্থার মধ্যেই আজ বুঝি তিনি এই সর্ব্বপ্রথম হাতে-কলমে চক্রান্ত জিনিসটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন—বুঝিলেন যে, চক্রান্তচালিত কল্পিত অপরাধকে বুদ্ধির দোষে সত্য ভাবিয়া যে-সব হতভাগ্যকে তিনি দণ্ডিত করিয়াছিলেন—তাহাদের অভিশাপ আজ বুঝি বন্ধন-রজ্জুর মত তাঁহাকেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়াছে! গলার মালা-ছড়াটি সজোরে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তিনি ক্ষিপ্রভাবে সোজা দরজার দিকে পদচালনা করিলেন। এই সময় পিছন হইতে শ্রীমতী গোদাবরী তাহাতে বাধা দিয়া পরিহাসের সুরে কহিল—চললেন দাদামশাই! কিন্তু বাড়ীতে গিয়েই সেই হাণ্টারটা নিয়ে নিজের ভাঙ্গা বরাতটার ওপর ঘা-কতক কসিয়ে দিতে ভুলবেন না যেন!

দুই চক্ষু পাকাইয়া রায় বাহাদুর ফিরিয়া তাকাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠের স্বরটিও শোনা গেল—ডেঁপো মেয়ে, এক দম বয়ে গেছে।

গোদাবরীও ছাড়িবার মেয়ে নয়, দরজার উপর দাঁড়াইয়া মুখটি বাড়াইয়া শুনাইয়া দিল—কাল ভোরেই এই ডেঁপোরা দল বেঁধে হাজির হচ্ছে আপনার বাড়ীতে। জলখাবার সাজিয়ে রাখবেন না—বুঝলেন?

রায় বাহাদুর তখন রোষে ক্ষোভে কম্পিত-কণ্ঠে—কি বলিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় আলোর বড় বড় অক্ষরে তাঁহার চোখের উপরে ফুটিয়া উঠিল—এপ্রিল—ফুল!

কে যেন পিছন হইতে তাঁহার কণ্ঠটি চাপিয়া ধরিল, কোনও উত্তর তাঁহার মুখ হইতে আর বাহির হইল না।

শক্তি সহাস্যে কহিল—চমৎকার অভিনয় করলেন আপনি নির্ম্মলবাবু!

নির্ম্মলবাবু তখন বন্দীর হাতকড়ি খুলিতে ব্যস্ত—আসামীকে মুক্তি দিয়া কহিলেন—আমার চেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন আপনাদের এই ভাইটি! রায় বাহাদুরের পাকা মাথাটি পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

তরুণীদের মধ্য হইতে এক জন কহিল—কেমন বোনের ভাই!

শক্তি বোস কহিল—এখন আমি লজ্জা অনুভব করছি নির্ম্মলবাবু, আপনাকে অকারণ সন্দেহ করেছিলুম ভেবে।

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন—এখন বুঝলেন ত, পুলিসের কাজ করলেও আমরা দেশের সত্যকার কাজে অবহেলা করি না।

এই সময় সংসদের সভানেত্রী অনীতা দেবী সেই কক্ষে দেখা দিলেন, দুই হাত যুক্ত করিয়া নির্ম্মলবাবুকে নমস্কার জানাইয়া কহিলেন—এই ত ঠিক কাজের মত কাজ, নির্ম্মলবাবু! কুমারী-সংসদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন—ধন্যবাদ দিন সবিতার দাদাকে, ভবিতব্যের চাকাটা এভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে ঝুনো রায় বাহাদুরকে ও যে 'এপ্রিল ফুল' করেছে।

অনীতা দেবী কহিলেন—ধন্যবাদে ওর কি হবে নির্ম্মলবাবু, অতিবাদ পেছনে জমা হচ্ছে। কাণ্ডটা যা করেছে—

নির্ম্মলকান্তি গম্ভীরমুখে কহিলেন—এরই নাম হচ্ছে—শঠে শাঠ্যং—

মুকুল কহিল—এবং যেন তেন প্রকারণে বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ম্।

নির্ম্মলকান্তি কহিলেন—ঠিক, কথাটা ভারি খাপ খেয়েছে।

অনীতা দেবী মুকুলের দিকে চাহিয়া কহিলেন—এখন কাপড়চোপড় পালটে এসো, আজ থেকে তুমি সত্যিই মুকুল হলে। বিয়ের পরে সবার সামনে তোমার পরিচয়-পর্ব্বটা শোনাতে হবে।

শক্তি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—ওদিককার খবর কি, অনীতাদি?

অনীতা দেবী গাঢ় স্বরে কহিলেন—জোড়া-বিয়ের উদ্যোগ হচ্ছে। এক ঘরে সবিতা আর মায়া, আর এক ঘরে জলধর আর শিবদাস চেলি-নন্দন পরছে। ওদিক বর-পক্ষ আর কনে-পক্ষ-গুলিকে আনতে গাড়ী গেছে, এসেই সংসদের কাণ্ড দেখে তাঁদের মুখগুলো কিরকম হয়—তার ফটো নেবারও ব্যবস্থা হয়েছে। নির্ম্মলবাবুর জয়জয়কার হোক।

তরুণীদল সমস্বরে নির্ম্মলকান্তির জয়ধ্বনি তুলিতেই, তিনি অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে কহিলেন—থামুন, থামুন, আমি কি আপনাদের সংসদ ছাড়া যে, একতরফা আমারই জয়ধ্বনি করছেন? আসুন সকলে মিলে বলি—কুমারী-সংসদের জয়।

সেই গভীর নিশীথে সুপ্ত পল্লী মুখরিত করিয়া জয়ধ্বনি উঠিল—কুমারী-সংসদের জয়!

শেষ

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বিভিন্ন পুস্তক পরিচয়

কথা-সাহিত্য :

স্বয়ংসিদ্ধা
গোটা মানুষ
জাগ্রতা ভগবতী
দুঃখের পাঁচালী
অদৃষ্টের ইতিহাস
ভুলের মাশুল
মরু মাঝে বারি ধারা
বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী
আলো ছায়ার খেলা

ইন্টেলিজেন্ট
দরিদ্রের দাবী
অজানা অতিথি
দুর্গে দুর্গতি নাশিনী
নারীর রূপ
অপরিচিতা
নূতন বৌ

নাট্য-সাহিত্য :

বাজীরাও
অহল্যাবাঈ
বারাণসী
জাহাঙ্গীর
মহামানব
অন্নপূর্ণা
বাসুদেব

শিল্প-সাহিত্য :

স্বাধীন জীবিকা
রুস-জাপান-যুদ্ধ
বঙ্গে অরাজকতা

শিশু-সাহিত্য :

গল্প দাদুর বৈঠক
রামানুজ
রূপকুমারের রূপকথা
মন্দ থেকে ভাল
ছোট থেকে বড়